মল্লিক সেতো গানের পাখি

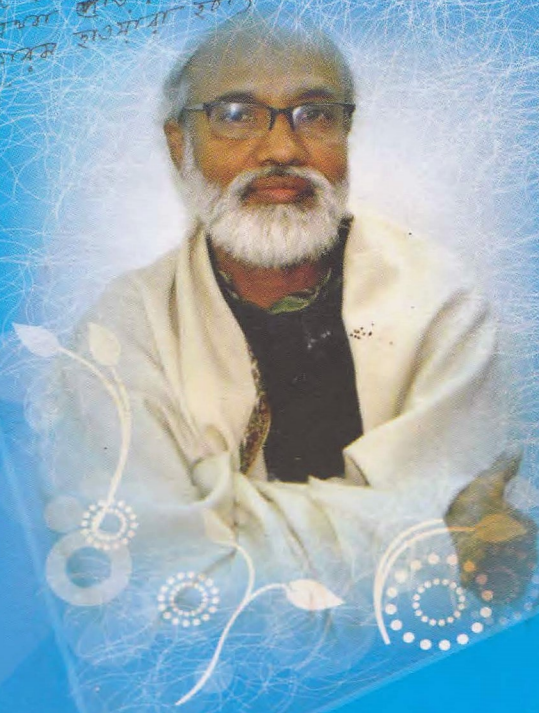

বাগেরহাট ফোরাম, ঢাকা

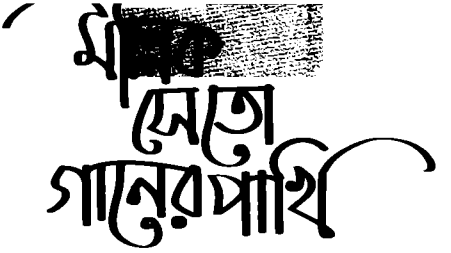

কথা ও সুর : জাফর ফিরোজ
মল্লিক সেতো গানের পাঁখি
গান গেয়ে গেয়ে যিনি যেতেন ডাকি
আজ কেন সে পাখির ডাক শুনি না
পথ যে এখনো রয়েছে বাকি
মল্লিক.. মল্লিক.. মল্লিক.. মল্লিক..
মোমের মত যিনি য়ে য়ে
আলো জ্বালিয়েছেন দু:খ সয়ে
আজ তিনি গোরে আছেন শুয়ে
না বলা কথা গুলো বুকে নিয়ে
মল্লিক আজ বড়ই প্রয়োজন
এখনো বাকী শত আলোর আয়োজন
মল্লিক হবো মোরা নিয়েছি এই পন
হে প্রভু মা কর তাকে
কাঁদছে দেখ কত শত মন

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতির
রূপকার
বাগেরহাটের কৃতি
সন্তান কবি মতিউর
রহমান মল্লিক

মল্লিক সেতো গানের পাখি

প্রকাশকাল ২৭ জুলাই, ২০১২
১২ শ্রাবন, ১৪১৯
৭ রমজান, ১৪৩৩

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
ডা: মো: আতিয়ার রহমান

সম্পাদক
সুলতান আহমদ

সম্পাদনা সহযোগী
আসাদুল্লাহিল গালিব
শাকিল মাহমুদ

সম্পাদনা পরিষদ
এ্যাড: মো: শামছুজ্জামান
মো: শফিউল্লাহ
শেখ আরাফাত হোসেন
সরদার আব্বাসউদ্দিন
মো: ইলিয়াছ হোসেন কাজী
আব্দুল্লাহ আল মামুন

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
এম এ তাওহিদ

মুদ্রণ: চৌকস প্রিন্টার্স

www.pathagar.com

সভাপতির কথা

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে, যেমন প্রাণ, যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্ত্র অবলম্বন ক'রে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তেমনি প্রত্যেক দেশের চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে। ঢাকায় বাগেরহাটবাসী তেমন এক মর্মস্থানে পরিণত হয়েছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

এ মর্মস্থানের একটি চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। একটি মস্তোবড়ো গাছ। এটা কী শুধু একটি গাছ! আট-দশ জনের মানবন্ধনের বৃত্তাকারে বেড় পাওয়া দু:সাধ্য। তার ডাল-পালা একেকটি বড় বড় গাছ। মাতৃস্নেহের মতো পুরো একটি বাজারকে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে। এই গাছে সংস্পর্শে যে মানুষটি বেড়ে উঠেছিলেন তিনিতো গাছের মহত্ত্বের মতোই। তাঁর কথায়ও তেমনটি শোনা যেতো। তিনি বলতেন, যে মাটি বড় বড় গাছ সৃষ্টি করেছে, সে মাটি বড় বড় মানুষও তৈরি করবে। কবি'র গ্রাম বারুইপাড়া বাজার জুড়ে এ গাছে পরিব্যাপ্তি। এটা একটা মেগনিস গাছ। আর সেই মাটির সম্পদ মল্লিক বিশাল এক মানবগোষ্ঠীকে আপন ছাতার নিচে ঠাঁই দিয়েছেন। সে ছাতার ব্যাপ্তি যে কত দূর তা নির্ণয় অসাধ্য। যেখানে সুযোগ পেয়েছেন তিনি আপনাকে মেলে ধরেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে "বাগেরহাট ফোরাম" আমাদের প্রিয় ব্যক্তি মল্লিক ভাইয়ের স্মরণে 'মল্লিক সেতো গানের পাখি' প্রকাশ করতে পারছি। মল্লিক ভাই বাগেরহাট ফোরাম এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি ফোরামের দায়িত্ব পালন করছেন। অসুস্থ থাকাকালীন আমাকে অনেক বার বলতেন যে ভাই বাগেরহাট ফোরামকে আপনারা ভালভাবে পরিচালিত করেন। আমি অসুস্থ ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারি না। মল্লিক সে শুধু বাগেরহাটের মানুষ ছিলেন এমন নয় তিনি সারা দেশ এবং বাংলাদেশের যারা বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছেন তাদের হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, তার কবিতা, গান, প্রবন্ধ আমাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছেন। তার কবিতা, গান ও প্রবন্ধ নয় ..... মানুষকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমাদের প্রকাশ আশা করছি আরো বেশী মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিবে। ইসলামী আন্দোলনে সহায়ক হবে।

আল্লাহ আমাদের প্রকাশনা কবুল করুন। আমীন

ডা: মো: আতিয়ার রহমান

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে/ কেন বেঁচে নিলে এই পথ
কেন ডেকে নিলে এ বিপদ/ জবাবে তখন বলি/ মৃদু হেসে যায় চলি
বুকে মোর আছে হিম্মত -কবি মল্লিক

এভাবে যিনি মানুষের অনুভূতিগুলো গানের স্বরলিপিতে তুলে এনেছেন, এদেশের ইসলামী সংস্কৃতির স্বপ্নদ্রষ্টা, আমাদের প্রাণপুরষ কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বাগেরহাটের বারুইপাড়ায় জন্ম নেয়া এ ক্ষণজন্মা মানুষটির সৃষ্টিশীলতা আর গানের সুধা শুধু দেশে নয়, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বহি:র্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মল্লিক স্ব-শরীরে আমাদের মাঝে না থাকলেও তিনি বেঁচে আছেন, প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের হৃদয় অন্দরে। ২০১০ সালের ১১ই আগস্ট পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়ার প্রায় ২ বছর পরে, এ মহানায়কের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম তুলে ধরারই কিছুটা প্রয়াস বাগেরহাট ফোরামের এ স্মরণিকা। মল্লিকের বিশাল সৃষ্টিশীল জীবন চরিত এ কয়েকশ পৃষ্ঠার মাঝে মলাটবদ্ধ করলেও আরও অনেক ইতিহাস অব্যক্ত থেকে যায়। কী নেই মল্লিকে? গান, কবিতা, প্রবন্ধ আর মানুষ তৈরির প্রানান্ত চেষ্টায় রত ছিল এ মানুষটি। মল্লিককে নিয়ে সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ অনেক আগের হলেও কিছু দেরিতে এটা প্রকাশ করছি। মল্লিক ভাইকে নিয়ে আমরা পরিমাণ লেখা পেয়েছি সব লেখা এখানে সংকুলান করা সম্ভব হয়নি। মল্লিক ভাই সম্পর্কে লেখা সংগ্রহের জন্য ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে লেখা আহবান করা হয়েছে। অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা মল্লিক ভাইয়ের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাদের অনেকেরে সাথে যোগাযোগ করি। তাঁরা অনেকে লেখা দিয়েছেন, আবার কেউ ত্রৈমাসিক 'পেক্ষণ'-এ প্রকাশিত লেখা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। প্রেক্ষণ সম্পাদক খোন্দকার আব্দুল মোমেন সূত্র উল্লেখ করে লেখা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল-ফালাহর প্রেস ম্যানেজার জনাব শফিকুল ইসলাম এবং কম্পোজ বিভাগের ইনচার্জ জনাব এনায়েত তাদের সফটওয়্যারে রক্ষিত অনেকগুলি লেখা প্রদান করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাি'ছ। সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থান করছি। মল্লিক ভাই ছিলেন আসহাবে সুফফার মতো। তার হাত ধরেই যাত্রা হয়েছিলো বাগেরহাট ফোরামের। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি। বাগেরহাট ইসলামী আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলনেক সহায়তা করাই এ ফোরামের মূল উদ্দেশ্যে। তার অবর্তমানে তার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে বাগেরহাট ফোরাম তার দেখানো পথেই চলছে। অশেষ ধন্যবাদ কবি মল্লিকের পরিবার, আপনজন, দেশে বিদেশে মল্লিকের অসংখ্য ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষিদের যারা লেখা দিয়ে এ সংকলন প্রকাশে সহায়তা করেছেন। একই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে করছি মল্লিকের জীবনের বিশাল অংশজুড়ে জড়িয়ে থাকা এ দেশের বিশ্বাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধেয় আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের ও মীর কাশেম আলী ভাইকে। যারা মল্লিককে বাগেরহাট থেকে তুলেন এনেছিলেন রাজধানীর বুকে, মল্লিককে বহি:বির্শ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মল্লিকের এক জীবন হয়ে উঠেছে সবার কাছে অনুকরণীয়। বাগেরহাট ফোরামের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাি'ছ যারা 'মল্লিক সে তো গানের পাখি' নামে এ সংকলন প্রকাশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময়ও শ্রম দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এ মহতি কাজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমাদের এ উদ্যোগ যদি কবি মল্লিকের সৃষ্টিকর্ম প্রচারে কিছুটা সহায়ক হয় তবেই হয়ত আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ

সুলতান আহমদ

www.pathagar.com

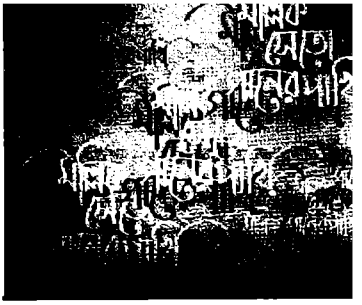

প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণ

মতিউর রহমান মল্লিক : সৌন্দর্য্যবাদী সাধক কবি- আল মাহমুদ ১০
সাহিত্য আড্ডায় আলাপচারিতা
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন ১৩
মানবতাবাদী মতিউর রহমান মল্লিক- শাহ্ আবদুল হান্নান ১৬
কবি মতিউর রহমান মল্লিক : কবির কঠিন দায়বদ্ধতা- জুবাইদা গুলশান আরা ১৯
অবিস্মরণীয় কণ্ঠশিল্পী মতিউর রহমান মল্লিক- মীর কাসেম আলী ২৭
মতিউর রহমান মল্লিক : অমর শিল্পী- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ২৯
মতিউর রহমান মল্লিক: এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবসান- ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ৩৩
মৃত্যু তাকে আড়াল করেছে কেড়ে নেয়নি- মাসুদ মজুমদার ৪০
মল্লিক আছেন, এদেশের গ্রাম বাংলার কৃষক কৃষানীদের ঐশ্বরিক চেতনায়, প্রার্থনায়- আবদুল হাই শিকদার ৪২
কবি মতিউর রহমান মল্লিক জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের নিপুণ রূপকার- আবদুল হালীম খাঁ ৪৪
কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবনা- খোন্দকার আয়েশা খাতুন ৬২
নিভে গেল নতুন আলোর বাতিঘর (প্রিয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই স্মরণে)- মিয়া গোলাম পরওয়ার ৬৬
ব্যাতিক্রম অনুভূতি- অধ্যক্ষ মশিউর রহমান খাঁন ৬৮
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন- শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ৬৯
আশির দশক ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক- আসাদ বিন হাফিজ ৭৮
আমাদের কবিতা.... ও কবি মল্লিক- হাসান আলীম ৮১
ইসলামী জাগরণের কবি মতিউর রহমান মল্লিক- ইকবাল কবীর মোহন ৮৮
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান বাণী, সুর ও বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র- অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ৯১
শিল্পী-কবি মতিউর রহমান মল্লিক- শরীফ আবদুল গোফরান ৯৭
অনবদ্য গানের সুরেলা পাখি- ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১০০
"কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে প্রথম ও শেষ দেখা"- এডভোকেট আনসার উদ্দিন হেলাল ১০৪
স্মৃতিতে অম্লান আমার প্রিয় ভাই- নাসির হেলাল ১০৭
খানজাহানের দেশে কবি মতিউর রহমান মল্লিক গড়ে গেলেন অবিনস্বর এক স্মৃতির মিনার- শেখ মিজানুর রহমান ১১২
আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব- মু: আমিনুল ইসলাম ১১৬
কবি মতিউর রহমান মল্লিক--- কিছু টুকরো স্মৃতি- আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ ১১৮
না ফেরার দেশেই চলে গেলেন তিনি- শাহ আলম বাদশা ১২১
তিনি গেছেন অপারের সুন্দর জীবনে- হারুন ইবনে শাহাদাত ১২৩
আমার সাংস্কৃতিক পিতা মতিউর রহমান মল্লিক- আমিরুল মোমেনীন মানিক ১২৫

www.pathagar.com

মল্লিক ভাই ঃ অজস্র স্মৃতির নীরব মিছিল- মুহাম্মাদ হায়দার আলী ১২৮
আল্লাহর সৈনিকদের চেতনার দিশারী কবি মতিউর রহমান মল্লিক- শেখ আবু সাঈদ ১৩৩
'মলিম্লক' আমার জীবনে ত্যাগের উৎস- মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন ১৩৬
স্মৃতির মনিকোঠায় মতিউর রহমান মল্লিক- মাওলানা আব্দুল লতিফ ১৩৭
বাগেরহাটের সম্পদ কবি মতিউর রহমান মল্লিক- এ্যাড: মো: শামছুজ্জামান ১৩৯
বোনের এই মোনাজাত কবুল করুন প্রভু- মাসুদা সুলতানা রুমী ১৪১
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে- তৌহিদুর রহমান ১৪৪
কবির ভাবনায় ঋতুর পালাবদল- মাফরুহা ফেরদৌস ১৫৬
নিষণ্ন নীড়ে বিষণ্ন পাখি- মনসুর আজিজ ১৫৯
নিজের জন্য মল্লিক ভাই করলো না তো কিছু- আবু আফরা ১৬১
সবার বন্ধু কবি মতিউর রহমান মল্লিক - উম্মে আরজুম ১৬৩
কবি মতিউর রহমান মল্লিক চারিত্রিক মাধুর্যের এক অপূর্ব কাব্য- খান শরীফুজ্জামান সোহেল ১৬৫
প্রেরণার বাতিঘর- এস.এম. শাহজাহান তারিক ১৬৭
ধ্রুব চিন্তার বয়ান- আফসার নিজাম ১৬৯
স্মৃতিময় মল্লিক- খালিদ সাইফ ১৭২
মতিউর রহমান মল্লিক: জীবনের মতো মৃত্যু বাঁচিয়ে রাখলো যাকে- এ কে আজাদ ১৭৮
মল্লিকের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা ভিন্ন- আসাদুল্লাহিল গালিব ১৮০
মল্লিক ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়ের একটি দিন- মারুফ আল্লাম ১৮৪
আমার মল্লিক চাচা- গাজী মোনাওয়ার হোসাইন তামিম ১৮৬
নান্দনিক কবিতার গতিপথ এবং কবি মল্লিক- শাকিল মাহমুদ ১৮৯
রাসুল (স.) প্রেমিক ছিলেন যিনি- সরদার আব্বাস উদ্দীন ১৯৪
অপাত্রে স্নেহ- মাসুমা বেগম ১৯৬
আমার কিশোর বেলা ও মল্লিক ভাই- সুলতান আহমদ ১৯৯

নিবেদিত কবিতা ২০১-২১৭

মানবিক সৌহার্দিক দিব্য ছায়া
আল মুজাহিদী

মল্লিক
আবুল আসাদ

মতিউর রহমান মল্লিক
আবদুল হাই শিকদার

আমাদের কবি
জয়নুল আবেদীন আজাদ

মতিউর রহমান মল্লিক
সোলায়মান আহসান

মতিউর রহমান মল্লিক : একটি ভোরের খসড়া
নয়ন আহমেদ

ভালোবাসার ভরা পুকুর
জাকির আবু জাফর

দিগ্বিজয়ী অশ্বখুরের মতো
আমিন আল আসাদ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
মো: মোয়াজ্জেম হোসাইন খান

দু'টি কবিতা
আহমদ বাসির

ধ্রুব নক্ষত্রের মতো
রহমাতুল্লাহ খন্দকার

আশার কোহল
আশিক রাববানী

তিনি আজ সুখবানে ভাসছেন
সোহরাব আসাদ

মল্লিক ভাই
আতিক হেলাল

www.pathagar.com

মানুষের কবি
শহীদ সিরাজী

সৃষ্টি সুখের ঝংকারে
আহমদ সাইফ

হে কাব্যের অধরা বীর
আ র মাহবুব

স্বয়ংক্রিয় আন্দোলন
নাসিম নেওয়াজ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ

ঠিকানা (প্রতি: কবি মতিউর রহমান মল্লিক)
ওমর বিশ্বাস

হারানো পাখি
মোল্লা তৌহিদুল ইসলাম

স্বজনদের দৃষ্টিতে মলিম্নক

স্মৃতিতো হারায় না
মল্লিক আহ্মদ আলী ২২৪
দেয়াল
নাজমী নাতিয়া ২২৬
তোমারে লেগেছে এত যে ভালো
সাবিনা মল্লিক ২২৭
আঁধার আমার আলো দিয়ে
কানায় কানায় দাও ভরিয়ে
জুম্মি নাহ্দিয়া ২৩২
এগার জুলাই দুই হাজার দশ
নাজমী নাতিয়া ২৩৭
স্মৃতিতে অম্লান কবি মতিউর রহমান মলিম্নক
মো: আবদুল্লাহিল হাদী ২৪০
মল্লিক ভাই : আমার মল্লিক ভাই
সায়মা ইয়াসমিন সোমা ২৪৫

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা ২৪৭-২৬০

ইসলামী আন্দোলনের কবি মতিউর রহমান মল্লিক- অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম ২৬১

বাগেরহাট ফোরাম ২৬৭

বাগেরহাট ছাত্র ফোরাম ২৬৯

স্মৃতি এ্যালবাম ২৭৩

নিবেদিত গান ২১৯-২২১

কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্বরণে
মোঃ শরিফুল ইসলাম মোড়ল

মতি মল্লিকের গানে
ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে গান
মতিউর রহমান খালেদ

www.pathagar.com

বাগেরহাট ফোরাম, ঢাকা

লিগ্যাল আইকন, আল-রাজী কমপ্লেক্স স্যুট- ৮০১
লেভেল-৮, ১৬৬ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী,
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫১১৯৯৫, মোবাইল: ০১৯৬৫১৯৯৮০৮
bagerhatforumdhaka@gmail com

www.pathagar.com

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক : সৌন্দর্য্যবাদী সাধক কবি

আল মাহমুদ

ভালোবাসার চবির মতো তোমার ছবি
ইচ্ছে জাগে দেয়ালজুড়ে সাজিয়ে রাখি
ছবির ছায়া মায়ার টানে ছড়ায় আলো
তোমার কথা ভাবলে ভাবি-আগুন জ্বালো!

যাক পুড়ে যাক চায়ার খেলা মায়ার টানে
কোনদিকে যে পথ আছে তা পথিক জানে?
পথের শেষে যেতেই হবে পথ বিপথে
পৌছতে হবে দিগন্তের ওই সান্নিধানে।

কবিতাটি যখন লিখেছিলাম মল্লিক তখন আমাদের মাঝে ছিল, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়েছিল- আর আজ আমাদের মাঝে নেই; এক বছর হয়ে গেল। হায়রে! কবি মতিউর রহমান মল্লিক। একটি নাম। একটি জীবন্ত ইতিহাস। একটি স্বতন্ত্র দুনিয়া। অন্য এক পৃথিবী। মল্লিক তুমি এভাবে যেতে পারলে? আল্লাহ গাফুরুর রাহিম তোমাকে জান্নাতবাসী করুন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিচয়ের পর থেকেই তার স্বভাবসুলভ নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে আমার ভীষণ আপন হয়ে যায়। মল্লিকের হাজারো পরিচয়ের মধ্যে সংগঠক পরিচয়টি বারবার তার চরিত্রের মধ্যে ধরা দিত। আমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমার এই অনুজ কবি আমার জন্য কী না করেছে? মল্লিকের কাছে আমার ঋণের আসলে কোনো শেষ নেই। শুধু আমি নই, মল্লিকের কাছে ঋণী বাংলাদেশের এ রকম লক্ষ কোটি মানুষ, কেন এমন কী করে গেছে মল্লিক? তার সাথে যারা মিশেছে, তাকে জানে তাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। নানা বিবেচনার পর মল্লিকের সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে স্থির হয়, যা সারা জীবন অটুট ছিল। মল্লিকের মৃত্যুটা আমাকে ভীষণভাবে ব্যাথিত করেছে।

ব্যক্তি হিসেবে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন এক হীরকখন্ডের মতোই তিনি দ্যুতি ছড়িয়ে গেছেন সর্বত্রই। গোটা বাংলাদেশ এমনকি বহির্বিশ্বে ঘুরে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির বীজ রোপণ করেছেন। অনেক গুণে গুণান্বিত মল্লিক পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার সাধনায় দিনযাপনে ছিলেন সদা তৎপর, তার কর্মযজ্ঞের লক্ষ্যবস্তু ছিল ঐশী জীবনাদর্শের রূপায়ণ। কি কবিতায়, কি গানে এমনকি তার জীবনযাপনে আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার এক অপরূপ শিল্পিত বিকাশ লক্ষ করা যায়। তার কবিতার ভাব-ভাষা ছন্দ আধুনিক মনীষার পরিচয় বহন করে। ধর্ম ও নীতিনৈতিকতা সম্পর্কিত ভাববস্তুকে তিনি বাংলার প্রকৃতির সাথে দ্রবীভূত করে প্রকাশ করেছেন। মল্লিকের অন্যান্য বিষয়ের মতো কবিতা ও গানও আমাকে অভিভূত করত। রেডিও টিভিতে ওর গান বাজলে আমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতাম। মল্লিক বেঁচে না থাকলেও তার সৃষ্টিসম্ভার এবং গড়ে যাওয়া অসংখ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি সঙ্গীতমনস্ক

www.pathagar.com

মানুষ অবশিষ্ট রয়েছে। একটা কথা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতা ও গানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং জাগরণের কবি ফররুখ আহমদের ধারায় যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনিই হচ্ছেন কবি, গীতিকার, সুরকার, সাহিত্যিক, গবেষক, সংগঠক, সম্পাদক এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রসেনানী মতিউর রহমান মল্লিক। হয়তো মল্লিকের মতো প্রতিভাবান মানুষ সময়ে একটাই জন্মে, অনেকগুলো নয়। এ কথা স্বীকার করতে আমার কি দ্বিধা থাকা উচিত যে আশির দশকের এই উজ্জ্বল কবি বাংলা কাব্যে নতুন এক বাঁক নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। মল্লিকের কবিতা এক কথায় ছিল স্বমহীমায় উজ্জ্বল। মল্লিক যে তার বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত, তা তার কাব্য ভাষাতেও উচ্চকিত এবং বহমান। বিষয়বিন্যাস ও শব্দ ব্যবহারের চলমান টেকনিক সময়কে সংস্পর্শ করলেও বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতা মল্লিককে ভিন্ন উপত্যকায় হাজির করেছে। ভাষার সারল্য, বিষয়ের গভীরতা আর শব্দ বুননের আধুনিক কৌশল তার কবিতাকে ঐশ্বর্যের চৌকাঠ অবধি পৌঁছে দিয়েছে ইতোমধ্যে। মল্লিক যেন কাব্যবৃক্ষের এক মুখর পাখি। মল্লিকের কবিতা চরম আধুনিক হওয়ার পরও ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং শেকড়ের দিকে ধাবিত। মল্লিক আধুনিক অথচ জটিল ও যান্ত্রিক নয়। প্রকৃতি ও প্রবাহমানতায় তার চেতনা প্রতিনিয়ত শব্দ করে ওঠে। বিশ্বাসকে তিনি শুধু বিষয়বস্তুই করেনি বরং যেন বিশ্বাসই তার অবলম্বন। উত্তর আধুনিক স্লোগানের ঘোরবিরোধী তিনি। অথচ শেকড়ের দিকে তার যাত্রা এবং বরবারই তিনি উৎস, মূলে আলো ফেলেছেন। সঙ্গীত মল্লিকের আনন্দ, সুর তার কণ্ঠস্বর, সরল ও স্বাভাবিক বাণী অথচ খোলাখুলি নয় গভীর। তাকে উন্মোচিত করতে হয় কেননা অনেক ভেতরে গিয়ে তিনি যা উন্মোচন করেন তা সোনালি সম্ভার। একজন স্বপ্নচারী কবির সামাজিক সঙ্কট ও চাহিদার সুগভীর উপলব্ধি কতটা হৃদয়পূর্ণ মল্লিকের কবিতা পড়লে তার প্রমাণ মেলে। আমার এই বয়সে এর চেয়ে বেশি কবিতার তাৎপর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে মল্লিকের সাথে আমার হৃদ্যতার স্মৃতি কম নয়, দেশে-বিদেশে আমরা একসাথে বহুবার একসাথে বহুবার ঘুরেছি।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সাহিত্য পরিসরে যে ক'জন অন্তরালোপরায়ণ কবি আছেন তাদের মধ্যে আসলে মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা আমাকে স্পর্শ করে বেশি। কোলাহলবিমুখ এসব কবির কাব্য প্রতিভাই আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি। আমাদের কাব্যাঙ্গনে আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি। আমাদের কাব্যাঙ্গনে আস্থা ও আস্থাপূর্ণ সাহিত্যের বিজয়। মল্লিক তার অসাধারণ জ্ঞান ও পন্ডিত্য নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু আমার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা এবং প্রেমমূলক আচরণ আমাকে বশীভূত করেছে বরাবরই। যেকোনো বিষয়ে ধর্মের দীপ্তিতে তিনি এমনভাবে আলোকপাত করেন যে, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, হা করে গিলতাম। মল্লিকের মেধা মনন এবং কর্মক্ষমতায় সে দলীয় গন্ডি অতিক্রম করে জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন অবদান রাখতে পেরেছিলেন। মল্লিককে মনে মনে আমি পীর বলে জ্ঞান করতাম। আমি একথা বলি না যে, মতিউর রহমান মল্লিকের মতো লোকদের কোন মূল্যায়ন হলো না; বরং সব সময় ভাবি, মূল্যায়ন করতে যে দাঁড়ি পাল্লা লাগে সেটা টান কিংবা উঁচু করে ধরার মতো বান্দা কোথায় পাওয়া যাবে? জ্ঞান হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের বিষয়। মল্লিকের চেহারা ছিল নিস্পৃহ, অহঙ্কারহীন ও বিনয়ীর প্রতিকৃতি। পৃথিবীতে জ্ঞানীরা কখন কি বেশ ধারণ করে বাঁচেন, তা

www.pathagar.com

আমার মতো সামান্য কবি বলতে পারবে না। মল্লিক ছিল সত্যিকারের জ্ঞানের বটবৃক্ষ, যা তার জীবদ্দশায় অনেকেই বুঝতে পারেনি।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ফাউন্ডেশনের মল্লিক উৎসবে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে কথা বলতে হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের প্রাজ্ঞ জ্ঞানী-গুনী অনেক পন্ডিত ছিলেন, মরহুম মল্লিকের জ্ঞান এবং গুণের কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে। এ-ও বলেছে মল্লিক ছিল এক উচু মাপের দার্শনিক। তরুণ এক কবি আহমদ বাসির মল্লিককে নিয়ে গবেষণা করে সে তো বলেই ফেলল, কেউ কেউ মল্লিককে এ সময়ের লালন বলে আখ্যায়িত করে। তবে মল্লিকের মধ্যে কোন সংশয়বাদিতা ছিল না। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ বিশ্বাসী মানুষ। অনুষ্ঠানে আরেক কবি আবদুল হাই শিকদারের একটি কথা মনে পড়ে, তিনি বলেছেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ, নজরুলের চেতনা, ইকবাল ও ফররুখের আদর্শ ও জীবননান্দ দাশের প্রকৃতির এক অনুপম নির্যাস বিদ্যমান ছিল। মল্লিককে নিয়ে অনুষ্ঠানাদি এবং লেখালেখি কিছুটা হচ্ছে-তবে আমি মনে করি তা ব্যাপক হারে হওয়া দরকার। এই তো আমার হাতে এখন খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণের কবি মতিউর রহমান মল্লিক সংখ্যা। এটি হাতে নিয়ে আমি যতটা না মুগ্ধ তার চেয়ে বেশি অভিভূত। মল্লিককে নিয়ে ৪০০ পৃষ্ঠার একটি সঙ্কলন, যাতে তাকে নিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশের অনেক গুণী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং মল্লিক শুভাকাঙ্ক্ষীরা। এটা একটা ব্যাপার। খন্দকার মোমেন সাহেব দেখা যাচ্ছে প্রতিভাবান মল্লিককে নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে চাই এরকম অনেক কাজ হওয়া উচিত মল্লিককে নিয়ে। মোট কথা মল্লিকের চর্চা করা উচিত। অধ্যায়ন করা উচিত।

মল্লিক ছিলেন ক্ষণজন্মা এক দেশপ্রেমিক আধ্যাত্মিক দরবেশ। একটি জীবন সে তার আদর্শ দেশ মা মাটি এবং মানুষের জন্য উৎসর্গ করে গেছে কিন্তু তার বিনিময় আশা করেননি। মহান আল্লাহপাক যার সহায় তার আর মানুষের জন্য উৎসর্গ করে গেছে কিন্তু তার বিনিময় আশা করেনি। মহান আল্লাহপাক যার সহায় তার আর মানুষের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। মল্লিক আমাদের জন্য একটি আদর্শ, একটি অনুপ্রেরণা, একটি বাতিঘর। মল্লিককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আদর্শবান সৎ মানুষদের মহত্ত্ব এবং অস্তিত্বের স্বার্থে। মল্লিক কী আল্লামা ইকবালের সেকেন্ড এডিশন নয়? না মল্লিক শুধু মল্লিকই। এমন একজন প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে আমাদের দেশ-কাল, সময় এবং ইতিহাস কী দাঁড়াবে না!

www.pathagar.com

সাহিত্য আড্ডায় আলাপচারিতা

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন

"কবিতা এমন একটা জিনিস যেটা ভিতরে না থাকলে হয় না। যত চেষ্টাই কর না কেন, যত প্রতাপ থাকুক, যত মিডিয়া প্রভাব থাকুক কিছু হবে না কবিতার বেসিক জিনিসটা–সারাৎসারটা যদি ভিতর থেকে না আসে। মল্লিকের ভিতর একটা প্রকৃত কবির বিষয় ছিল। ওর প্রথম বই 'আবর্তিত তৃণলতা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।"

[কবি মতিউর রহমান মল্লিক (১৯৫৬-২০১০) ছিলেন একজন আধুনিক কবি, গীতিকার। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর জটিল কিডনী রোগে ভুগছিলেন। তিনি গত ১১ আগস্ট ২০১০-এ ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) এর অত্যন্ত প্রিয় একজন কবি ও স্নেহধন্য ছাত্র। মল্লিকের অসুস্থতা প্রসঙ্গে কবি ওমর বিশ্বাস ও তাঁর বন্ধুদের কথা হয় আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে। গত ২৪ জুলাই ২০০৯-এ তাঁর বাসভবনে। একটি টিভি চ্যানেলের জন্য কিছু কথাও তিনি বলেন, তাদের সাথে। আলাপচারিতায় কবি মান্নান সৈয়দ যা বলেন পাঠক সমীপে তা হুবহু উপস্থাপন করা হলো। আজ সেই প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দও আমাদের মাঝে নেই। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ ইন্তেকাল করেন। আমরা এই দুই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। কবি ওমর বিশ্বাসের সাথে সে আলাপচারিতার হুবুহু তুলে ধরা হলো।

মল্লিক আমার শুধু ছাত্রই নয়, প্রিয় ছাত্রদের একজন। ওর সঙ্গে সম্পর্ক, সম্পর্কের গভীরতা দীর্ঘদিনের। আমি আমার শিক্ষকদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করি, ছাত্রদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করি। আমি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছি– প্রায় সাড়ে তিন দশক। সংস্কৃতিতে একটা প্রবাদ আছে যে, সব জায়গায় বিজয় আকাঙ্ক্ষা করলেও তুমি দুজনের কাছে পরাজয় বরণ করো। একজন হচ্ছে পুত্র বা সন্তান আরেকজন হচ্ছে ছাত্র। শিষ্য যদি আমার থেকে বড় হয়, সন্তান যদি বাপের চেয়ে বড় হয় সেটা কিন্তু বাপের গৌরব, শিক্ষকের গৌরব। আজকের দিনে এই জিনিসটা কিন্তু ঐভাবে থাকেনি, আমরা যেভাবে দেখেছি।

যাই হোক, মল্লিক আমার প্রিয় ছাত্রদের একজন। আমার যেসব কৃতি ছাত্র আছে কবি ও গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিক তাদের একজন বলে মনে করি। আশির দশকের একজন শক্তিশালী কবি। যথার্থ কবি। ওর প্রথম বই 'আবর্তিত তৃণলতা' পড়েই আমি অবাক হয়েছি। আমি দেখতাম ও নানারকম কাজ করে বেড়াচ্ছে। আমি ওকে বলতাম তুমি কবিতা লেখ। আমাদের আরেকজন প্রিয় কবি গোলাম মোহাম্মদ, একজন বড় কবি, মারা যাওয়ার

www.pathagar.com

আগেও একটা কবিতা লিখেছিল– সেটা অসম্ভব সুন্দর কবিতা। এই যার ধার, আর কি বলব– মল্লিক নিজের প্রতি বড় সুবিচার করেনি। সমুদ্র গুপ্ত গত বছর এইভাবে মারা যায়। তখন কোনো একটি চ্যানেল আমাকে কথা বলতে বলেছিল। কথা বলে লাভ কি? যদি না আমরা ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, যদি আবার আমরা জীবনের ঢেউয়ে ফিরিয়ে আনতে পারি, আবার মতিউর রহমান মল্লিককে কবিতায়, শিল্পে, সাহিত্যে তার কাজে মনোনিবেশ করাতে পারি। তার মতো নিষ্ঠাবান মানুষ আমি কম দেখেছি। প্রকৃতার্থে মানুষ বলতে যা বোঝায়।

আমি এলিফ্যান্ট রোডে একটি অফিসে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন ছিলাম। সে অফিসে যখন প্রথম দিন ঢুকছি দেখি একটি ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। চিনলাম। পড়ে যোগাযোগ হলো। প্রায় বছর পঁচিশেক আমার সাথে পরিচয়। আমি কিন্তু এমনিতেই আমার শিক্ষকদের কাছ থেকে, আমার ছাত্রদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখি। দূরত্ব বজায় রাখি এই জন্য যে, যাতে আমার কাজ অবিঘ্নিত থাকে। আমার স্বভাব এমন, আমি মানুষের সাথে খুব একটা ক্লোজ হতে পারি না বা হইও না। মল্লিক কিন্তু আমার বেড়া ভেঙে দিয়েছে। আমার ক্লোজ হয়েছে। ও যখন অসুস্থ হয়েছে, মাসখানেক আগে জানলাম তখনই বারবার তাকে সাবধান করেছি। শরীরের যত্ন নিতে বলেছি।

যাইহোক, ওর প্রথম কবিতার বই 'আবর্তিত তৃণলতা' পড়েই আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের এখানে কবিতা অনেকেই লিখছে। কবিতা এমন একটা জিনিস যেটা ভিতরে না থাকলে হয় না। যত চেষ্টাই করো না কেন, যত প্রতাপ থাকুক, যত মিডিয়া প্রভাব থাকুক কিচ্ছু হবে না কবিতার বেসিক জিনিসটা, সারৎসারটা যদি ভিতর থেকে না আসে। মল্লিকের ভিতর একটা প্রকৃত কবির বিষয় ছিল। ওর প্রথম বই 'আবর্তিত তৃণলতা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর পরে পঞ্চম বইটি আমার হাতে 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে'। এই বইটা সম্পর্কে ভাবতে আমার আরো খারাপ লাগছে যে, এই বইটা ও আমাকে ভালেবেসে আমাকে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করেছে।

মতিউর রহমান মল্লিক তো বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট, বোধ হয় পঞ্চাশের এদিক ওদিক হবে। কিন্তু দেখেছি স্বভাব কবি যেমন, স্বভাব গীতিকার যেমন ওর গানের গলাও ভালো। এর মধ্যে স্বভাব কবিত্বের ব্যাপার বলে একটা জিনিস আছে। তার কবিতা পরিশীলিত। এই দিকটিতে আমি পরে আসছি। কিন্তু আমি তো ওর শিক্ষক। কিন্তু আমার প্রতি ওর যে সেই প্রথম দৃষ্টি তা আমার মনে আছে। একটা কোথাও সে জড়িয়ে পড়ছিল। সবাইকে আশ্রয় দিয়ে, মানে সবাইকে আপন করে তার যে হৃদয়বেদনা তা লক্ষ্য করা যায়। এই বইতে শাহাবুদ্দীন আহমদ, আমাদের একজন সেরা প্রাবন্ধিক, সেরা নজরুল গবেষক তার উপর একটা কবিতা আছে সেটাও আমার ভালো লেগেছে। আমরা কিন্তু জাতি হিসেবে কিছুটা কৃতঘ্ন। তার ভিতর কৃতজ্ঞতাবোধ দেখি। যাইহোক, এখন সেই মতিউর রহমান মল্লিক অসুস্থ। এই বইমেলায় এই বই 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' বের হয়েছে। এই বইয়ে আমি আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। বহু ব্যস্ততার মধ্যে ওর যে ক্রমোত্তর, এই বইয়ে মল্লিক শব্দ ব্যবহারে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে সেটা আমাদের বইয়ে দেখিনি। এই শব্দ ব্যবহারের যে কৌশল তা তার কবিতাকে অন্যরকম লেখা করে তুলেছে। যেহেতু স্বভাব কবি যেহেতু ওর ছন্দের উপর হাত ভালো, কবিতাও সুন্দর লেখে, সব মিলে একজন নতুন মল্লিককে আমরা এখানে দেখি। কবিতা যদি প্রকৃত কবিতা হয় এবং ভিতরে যদি একটা চর্চা

www.pathagar.com

থাকে, ওর সেটা ছিল এবং আছে - তা না হলে এরকম কবিতা হঠাৎ লেখা সম্ভব ছিল না।

আমি আর কি বলব, আল্লাহর কাছে একটাই দোয়া চাইব - ওর জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে সুস্থ করে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুক এবং ও আবার আমাদের সঙ্গে কাজ করুক। আমাদের এই জীবন তরঙ্গে আবার সে যুক্ত হোক এবং আমাদের সাহিত্যের জন্য, আমাদের সমাজের জন্য, দেশের জন্য কিছু কাজ করা তার দরকার।

আপনাদের আসার কথা শুনে আমার ত্রিদিব দস্তিদারের কথা মনে পড়ছিল। সে কষ্ট পেয়ে মরে গেছে। কবিদের মধ্যে চিরকাল কোথাও একটা লাগাম ছাড়া ব্যাপার থাকে। কোথাও একটা বেপরোয়া ব্যাপার থাকে। এটা ছিল ত্রিদিব দস্তিদারের। ছিল সমুদ্র গুপ্তের। আছে মল্লিকের মধ্যেও। আমাদেরই দায়িত্ব হচ্ছে মল্লিককে সুস্থ করে তোলা। ওকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আজকে অনেক আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা আশা করব, আল্লাহতায়ালার কাছে কাঁদব যে, মল্লিক ফিরে আসুক আমাদের জীবনে। আমি সর্বান্তকরণে কবি, গীতিকার– মতিউর রহমান মল্লিকের সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করছি।

বেঁচে থাকতে মূল্যায়ন নেই কেন?

আমাদের দেশের একটা অসম্ভব বদ অভ্যাস হচ্ছে আমরা বেঁচে থাকতে মূল্য দিই না। মরণের পর কিছুদিন খুব উৎসাহ থাকে। তারপর আবার বিস্মৃত হই। আরো একটা বিষয় এর সঙ্গে আসে। পুরো বিষয়টার সাথে কিছুটা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। শামসুর রাহমান আমাদের সেরাদের একজন। শামসুর রাহমানকে নিয়ে তার মৃত্যুর পরে যে ঝোঁক ছিল এবছর দেখলাম সেটা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত। কেন এটা হবে? কিন্তু তার কবিতা তখন এখন তো একই। এই জিনিসগুলো আমি চাইব তরুণ প্রজন্মের কাছে– একজন কবি, একজন লেখক বেঁচে থাকতে যথাসাধ্য তার আলোচনা, তার সমালোচনা, তাকে তুলে ধরা সমালোচক ও মিডিয়ার কাজ। ব্যক্তিগত ভাবে যেসব সংগঠন আছে তাদের কাজ এটা। একটা জাতি কিন্তু এমনিতেই অগ্রসর হয় না, এই সব মিলিয়েই হয়। সব রাজনীতি, অর্থনীতির উপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা লেখকরা খুব নিরাপদ দূরত্বে থাকব - এই বিষয়টা ঠিক নয়। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আপনার যদি দায়িত্ব থাকে তাহলে আপনাকে এ কাজ করতে হবে। আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে একটা আত্মগোপন মানুষ, কিন্তু আমি কাকে নিয়ে লিখিনি। এই মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়েও লিখেছি। আশির দশকের কবিতা নিয়ে আমি যে ভূমিকা লিখেছি সে বইয়ের ভূমিকায় আছে, ওতে ওই সময়ের ট্রেন্ডগুলো দেখিয়েছি।

আরেকটি জিনিস আছে, যে শিক্ষাটা আমাদের আজকের সমাজে নেই সেটা হচ্ছে আমরা যেন শ্রদ্ধা করতে শিখি– ভালোবাসতে শিখি। যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদের প্রতি, যারা চলে গেছেন তাদের প্রতি। মূলত লেখকের ক্ষেত্রেই বলছি, কিন্তু এটা অন্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– যারা চলে গেছেন, আমাদের সমগ্র জাতির জন্য কাজ করেছেন তাদের আমরা যেন শ্রদ্ধা করতে শিখি। এবং পরবর্তীতে যারা আসছে তাদের প্রতি যেন আমাদের মমত্ববোধ থাকে– ভালোবাসা থাকে। এই হৃদয়টা আমি আমাদের সমাজে দেখতে চাই।

www.pathagar.com

মানবতাবাদী মতিউর রহমান মল্লিক

শাহ্ আবদুল হান্নান

আমার মনে হয় বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, এদেশে সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিক একটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাকে কোনোভাবেই কেউ বাদ দিতে পারবে না। ইতিহাসে সে তার স্থান দখল করে নিয়েছে।

তার কাজ সম্পর্কে কয়েকটি দিক নিয়ে আমি কিছু বলব। ব্যক্তি সম্পর্কে শেষে দুই একটি কথা বলব। তার বাড়ি ছিল বাগেরহাট জেলায়। মল্লিক বাল্যকাল, লেখাপড়া মনে হয় সব কিছুই তার সেখানে হয়েছে। কিন্তু ঢাকায় আসার পর থেকে বিভিন্ন দিকে সে অনেক কাজ করেছে। আমরা অনেকে মিলে প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ নামে যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি তার সাথে মল্লিক সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। সেখানে সে নানাভাবে কাজ করেছে। সাংস্কৃতিক কর্মী, নাট্যকার, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, কবি, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে তাদের সেখানে সে সংগঠিত করেছে। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, শিশুসহ সকল শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সব শ্রেণীর মানুষকে মল্লিক আলাদাভাবে ওই প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত করে। এর মাধ্যমে কয়েকশ লেখক সে তৈরি করে। তারা আবৃত্তিকার হয়েছে, না হয় নাট্যকার হয়েছে। অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। গানের সুরের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অর্থাৎ যত রকম দিক আছে সব দিক সে প্রশিক্ষণ দেয়, তাদেরকে শিক্ষা দেয়। এটা আমি এজন্য বলছি যে, সাংগঠনিক কাজ একটি বিরাট কাজ। সেটা সে করেছে। এতবড় সাংগঠনিক কাজ তার আগে কখনো হয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না। নিশ্চয় এটা ঠিক, কাজী নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে কিছু লোক ছিল। কিন্তু এরকম অসংখ্য লোককে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তৈরি করেছেন কিনা জানি না, হয়ত বা করেননি। তেমনি ফররুখ আহমদ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে কেন্দ্র করে একটা গ্রুপ ছিল। কিন্তু তাহলেও তিনি নিজে কোনো সাংগঠনিক উদ্যোগ নেননি এবং তিনি সাংগঠনিক ব্যক্তিও ছিলেন না। সেখানে মতিউর রহমান মল্লিক একজন সাংগঠনিক ব্যক্তি ছিল। সে সংগঠনের মাধ্যমে কবিদের সংগঠিত করে। সে গায়কদের সংগঠিত করে। যারা অভিনয় করবেন তাদের সংগঠিত করে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠিত করে। আবৃত্তিকারদের সংগঠিত করে। এই কাজ সে ঢাকায় করে। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলোতে করে। অনেকগুলো জেলা শহরেও একই কাজ করে। এই একটা বিরাট কাজ সে করেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, সে নিজে ব্যক্তি হিসেবে কবিতার পাশাপাশি অনেক অসাধারণ গান লিখেছে। তার সংখ্যা হয়তো কয়েক হাজার হতে পারে। সেটা একটা সংখ্যার ব্যাপার। আশা করি সেটা সংগ্রহ করে দেখা হবে। সেই গানের অনেকগুলো সে নিজে গেয়েছে। নিজে সুর দিয়েছে। আমি মনে করি, তার গানগুলো ইসলামিক গান বা ইসলামভিত্তিক গান, নৈতিকতা ভিত্তিক গান, আদর্শ ভিত্তিক গান- এভাবে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে শুধু এটা বলতে পারি তার গানগুলো কোনোভাবেই সেকুলারিজম ভিত্তিক নয়। সেই গান সংখ্যায় যেমন অনেক, আবার অনেক অনেক ভালো গান সে লিখেছে। তার মানও অনেক ভালো। এরকম ভালো মানের গান এবং অনেক গান যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রগণ্য। ফররুখ আহমদও অগ্রগণ্য। গোলাম মোস্তফাও অনেক গান লিখেছেন। আরো কিছু কবি লিখেছেন। মতিউর রহমান মল্লিক তাদেরই একজন। হয়তো কারো কারোর চেয়ে বেশি লিখেছেন বা কারো কারোর চেয়ে কম লিখেছে। অর্থাৎ যারা ইসলামিক গান অনেক লিখেছে মল্লিক তাদের একজন। এটা তার একটি ক্রেডিট। সে নিজের অসংখ্য গানের সুর নিজেই দিয়ে গেছে। নিজের গান নিজেই গেয়েছে। সেসব একটা বড় জিনিস। তার গান আমাদের বিরাট সম্পদ। সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে, গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে সে একটা অসাধারণ কাজ করে গেছে। যার কোনো বিকল্প এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নেই। কিন্তু এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার দরকার আছে। তবে এই শূন্যতা কে পূরণ করতে পারবে তা আমার জানা নেই। আমি মনে করি পূর্ণ মতিউর রহমান অনেকেই হতে পারবে না। কিন্তু অর্ধ মতিউর রহমান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু প্রযোজ্য। আমাদের সেসব দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, আমি এই কথা বলব, মল্লিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে এমন একটা সমাজে করেছে যেখানে কালচার সম্পর্কে ইসলামী মহলে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমাদের সমাজে একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। এক-দুই শত বছর পিছনে গেলে আমরা দেখতে পাই, ইসলামী সমাজে এমন একটা ধারণা ছিল যে ইসলামে কোনো গান নেই। এখানে কোনো ফিল্ম হতে পারে না। এখানে কোনো অভিনয় হতে পারে না। এখানে কোনো নাটক হতে পারে না। এখানে কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে না। এরকম একটা অবস্থান থেকে আমরা আজকের পর্যায়ে এসেছি। মল্লিক পনের বিশ বছর আগে থেকেই এটা বোধ করতে থাকে যে বাদ্যের ব্যবহার কিছুটা হওয়া উচিত। গানে বাদ্যের ব্যবহার থাকতে পারে। যদিও সে এই সাহসটা করেনি। শুধু দফ ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কোনোটিই মল্লিক পাবলিকলি করেনি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি করেছে সেটা অবশ্য আমার জানা নেই। ফিল্মের ক্ষেত্রে সে কাজ করার চেষ্টা করেছে। আমরা জানি ইরানে ফিল্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ইসলামী পরিবেশের মধ্যেই সেটা হয়েছে। ইরানের ফিল্ম বিশ্বব্যাপী খুব খ্যাত হয়েছে। তাদের ছবিগুলো নৈতিকতা ভিত্তিক, আদর্শ ভিত্তিক। ফিল্মের ক্ষেত্রে এটাকে শুধু ইসলামিক বলব কেন নৈতিকতা ভিত্তিক ফিল্ম তারা করতে পেরেছে। আসল কথা হচ্ছে তাদেরটা নৈতিকতা ভিত্তিক, কিন্তু যেহেতু মুসলিম নাম, মুসলিম পরিবেশ রয়েছে ইরানে সেজন্য ইসলামিক বা ইসলামভিত্তিক ফিল্মের কথা বলছি। আসলে এগুলো হচ্ছে নৈতিকতা ভিত্তিক, মানবতা ভিত্তিক ফিল্ম। সেই জিনিসটা তারা করেছে। মতিউর রহমান মল্লিক এটা বাংলাদেশে করার

www.pathagar.com

জন্য কি ধরনের কাজ করার দরকার, কি ধরনের স্টুডিও করার দরকার, কি ধরনের চিন্তা দরকার তার কিছু সহকর্মীকে নিয়ে সেটা চেষ্টা করেছে।

সুতরাং তার মনটা ছিল পরীক্ষাধর্মী। সে কিছু পরীক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা আমাদের এখানে অত সহজ ছিল না। এমন কি এখনো সহজ নয়। আমরা জানি, গানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে ফতোয় ড. ইউসুফ আল কারযাভী দিয়েছেন তা অনেক উদার। তিনি তাতে বলেছেন, সকল গানই বৈধ যদি তাতে কোনো ইসলাম বিরোধী, মানবতা বিরোধী, নৈতিকতা বিরোধী কিছু না থাকে। এমন কি সেই গানের সঙ্গে তিনি বাজনাকেও বৈধ বলেছেন, যদি নৈতিকতা ভিত্তিক গানের সাপোর্টে ভালো করে পরিবেশনার জন্য তাতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তিনি কোনোটাকেই অবৈধ বলেননি। তিনি বলেছেন এরকম গানে কাণ্ডজ্ঞান থাকতে হবে। অবৈধ বলেছেন কাণ্ডজ্ঞানহীন গান-বাজনাকে। আমরা গান করছি, নামাজ ভুলে যাচ্ছি, জীবনের দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছি। গান, নাচ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছি শুধু সেটা হতে পারে না। জীবনকে সামনে রেখে, বাস্তবতাকে সামনে রেখে, আল্লাহর প্রতি আমাদের নিজের যে কর্তব্য সেটাকে সামনে রেখে আমাদের এগুলো করতে হবে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সাপোর্টে বা সমর্থনে, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার কোনোটাই তিনি না করেননি। কিন্তু সেই জিনিসের দিকে তো আমরা যেতে পারিনি। আমাদের যে পরিবেশ সেই পরিবেশ এখনো তার জন্য অনুকূল হয়নি। ড. কারযাভীর ফতোয়াটা আসলে যতটা সম্ভব চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার দরকার ছিল। এটা হওয়া দরকার, না হলে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব পুরোপুরি অগ্রসর হতে পারবে না। এতে একজন শক্তিশালী আলেমের সমর্থনের দরকার ছিল, সেই সমর্থনটা পাওয়া গেছে ইউসুফ আল কারযাভীর ফতোয়ার মাধ্যমে।

মতিউর রহমান মল্লিক ইতিহাসে তার স্থান করে নিয়েছে। তার সমান মানের সেরকম ব্যক্তি বর্তমানে আমাদের দেশে নেই। এটা একটা বিরাট শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণ করতে একজনে পারবে না। অনেককে মিলে এই শূন্যতা পূরণ করতে হবে। যেটা এই দেশের দাবি। ইসলামেরও দাবি মানবতারও দাবি।

ব্যক্তি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পর্কে বলব, আমি খুব বেশি মিশিনি তার সঙ্গে। কিন্তু যেটুকু মিশেছি তাতে দেখেছি সে অত্যন্ত সহজ একজন মানুষ ছিল। সরল মানুষ ছিল। আমার মনে হয় ভালো অন্তরের মানুষ ছিল। সদ্ব্যবহার ছিল তার। আমি বলব, অতি সহজ সরল জীবন ছিল তার। আমার কাছে একটা জিনিস খুব ভালো লাগে, তার ফ্যামিলি তার প্রতি যেকরম অনুগত বা অনুরক্ত (devoted) তাতে প্রমাণ করে যে ফ্যামিলিতেও সে একজন অসাধারণ ভালো পিতা ছিল, স্বামী ছিল। না হলে এতো অনুগত কি করে তার বাচ্চারা হয়। সর্বোপরি সে মানবতাবাদী ছিল। আমাকেও সে মানবতাবাদীই বলত। সবখানেই একটা কথা বলত যে মানবতাবাদী শাহ আবদুল হান্নান। আমি বলব, সে এটা এইজন্যই বলতো যে সে নিজে মানবাতাবাদী ছিল।

লেখক : সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইসলামী চিন্তাবিদ

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক : কবির কঠিন দায়বদ্ধতা

জুবাইদা গুলশান আরা

একজন কবি কখন নিজের ভেতরের স্বপ্নসাধ এবং অন্তরস্থিত সত্যকে পাঠকের মনের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন? পৃথিবীর প্রবহমান জীবন স্রোত তাকে স্পর্শ করে, জীবনের উত্থান পতন তাকে ভাবায়, মানুষের পৃথিবীতে তাকে পৌঁছে দেয়। তার প্রতিবিম্ব এসে পড়ে তার মনের পৃথিবীতে। যার ফলে কবিত্বের শিশির ছোঁয়ায় তার লেখনী ক্রমশ ধারালো হয়ে ওঠে। কখনও বা ছুরির মতো, কখনও গড়ে ওঠে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষায় ঘেরা বিশাল প্রাসাদ। কখনও ভালোবাসায় ভেজা সবুজ ঘাসের মখমলে জড়িয়ে সে ডাক পাঠায় কবিকে, কখনও বা শ্রমজীবী মজদুরের হাতুড়ির মতো ধরা দেয় কবির হাতে। এত সব আয়োজনের নিরিখেই কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা দেখা এবং গীতিময় উপস্থাপনা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে অনেক আগেই কিন্তু সম্পূর্ণ করে বোঝার সুযোগ ঘটেনি। বলা যায় তাঁর অনেক ভক্ত অনুরাগীর অনুপ্রেরণায় তার কাব্য জগতের বিষয়ে আমার কৌতূহল জেগে ওঠে এবং দেখতে পাই কবিত্বের আড়ালে অনুসন্ধিৎসু, উপলব্ধির তৃষ্ণায় ব্যাকুল একটি হৃদয় কাজ করে যাচ্ছে দক্ষ কামারের মতো সে গড়ছে পিটছে কবিতার শরীর। শব্দের ভাঙচুর চলছে তার মনের নেহাইতে। বিষয়টি অনুভব করে বিস্মিত হই। কবিতার রাজ্যে একজন গদ্য লেখকের এই আনন্দ যাত্রাকে কে কীভাবে দেখবেন জানি না। শুধু এইটুকু জানি, কাব্য জগতে যাত্রা আমার চর্যাপদ, রবীন্দ্রনাথ, আব্দুল হাকিম, হেয়াত মাহমুদ এবং নজরুলকে বুঝতে বুঝতেই। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জসিম উদ্দিন, মহাকবি কায়কোবাদ, সুকুমার রায় চৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, ফকির লালন শাহ এবং আরও বহু কবির প্রতি মুগ্ধ হৃদয় নিয়ে জীবনকে জানতে চেষ্টা করেছি।

অত:পর মৃদুভাষী, প্রচার বিমুখ এই আত্মমগ্ন কবির সঙ্গে পরিচয়। তার লেখা কবিতাকে জানা ও বোঝার সুযোগ পাই অনেক পরে। কবিদের রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি দ্বিধা ছিল, সেটাও ঠিক। পড়তে শুরু করে দেখলাম এ কবি যথার্থই অন্য রকম সৃজনের আনন্দ তৈরি করেছেন পাঠকের জন্য। জীবনের বহমান স্রোতে এই কবির কাব্য জগতের সঙ্গে অন্বেষণে যাত্রা আমার।

মতিউর রহমান মল্লিকের বেশ কিছু প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ রয়েছে যার নামকরণ তার ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির প্রতীক বলা যায়। প্রত্যেকটিই এক একটি ভিন্ন অনুভব সৃষ্টি করে। এলোমেলো কবিতার সমাগম নয়, প্রত্যেকের ভিন্ন আবেগ ও বিশ্লেষণ। একটির নাম, "আবর্তিত তৃণলতা" এ গ্রন্থের কবিতাগুলো কবির শ্রদ্ধেয় কাব্য পথিকৃত মনীষীদের তথা কবি, নাট্যব্যক্তিত্ব, কৃতি মানুষেরা রয়েছেন এই আয়োজনে। ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী

www.pathagar.com

আহসান, আল মাহমুদ প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুভব নিয়ে লেখা। বলা যায় পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকারের ব্যাকুল প্রতিচ্ছবি, সেখানে তিনি এক গুরুজনের কাছে শিখেছিলেন–

তোমাকে দুটো আন্তর্জাতিক চোখ দেবো।
তারপর নাফ নদীর একবুক জলে নামিয়ে দিলে,
বাংলাদেশের শ্বেতপত্র পড়ে নিও।
(ফররুখের অনেকগুলো কবিতা)

কবির মধ্যে কবিত্বের সে নানা ছাঁদ ও কারুকাজের আকুলি বিকুলি, তা পথ খুঁজে পেয়েছে প্রকৃতির নানা চিত্রকল্পে, কিন্তু সীমাবদ্ধতায় তিনি তুষ্ট নন। তাই তিনি প্রবেশ করেন কাব্যের বিস্তৃত সৈকতে, যেখানে "সমুদ্রের কথোপকথন শুনতে শুনতে তুমিও তখন মুহূর্তের কবিতা অথবা ক্ষণস্থায়ী সঙ্গীত হতে পারো।" (অপার্থিব সবুজবাসীর কথা)।

কবির কাব্য পড়তে যতোই এগিয়ে যাচ্ছি, সেই "আবর্তিত তৃণলতা"র জগত আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এক দূর অথচ কুয়াশাচ্ছন্ন দীর্ঘ পথে, যার শুরুটা অমোঘ আকর্ষণে কবিকে টেনে নিয়েছে। অনবরত বৃক্ষের গান যেখানে প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে সেই পথে কবি চলেছেন। অদৃশ্য কোন অলৌকিক সত্য জানার নেশায় সবুজ স্বপ্নের আভায় প্রতিবিম্বিত বিশ্বজগত তাকে হাতছানি দেয়। সেখানে–

কাশবনেরা বকের পাখায় উড়াল দিল
এবং বকের ডানায় ডানায়
মিষ্টি রোদের মধ্য দিয়ে
হেমন্ত দিন।
.....
.....
কবির স্বপ্ন পিপাসু চোখ খুঁজে পায়, "ঠিক এভাবে রূপসী এক জন্মভূমি বাংলা আমার
(হেমন্ত দিন)

এই প্রকৃতিমুখী কবিতার মধুরতা তার কাব্যকে একটি আবেশের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, রোমান্টিক আবহই তার মূল কবিতার প্রধান সঙ্গী। দেশের শ্যামল প্রকৃতির পাশাপাশি নগর জীবনের চরম অসহিষ্ণু ভিড়, তিক্ত কঠোর জীবন যুদ্ধকে বাদ দিয়ে কবি কখনও পূর্ণ নন। সেখানে প্রতিদিনের বৈপরীত্য, চাটুকারদের ভন্ডামি, রাজনীতির উত্থান পতন তার সৃষ্টিশীল হৃদয়কে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে রেখেছে। কবিকে তাই বলতে হয়–

কোন বিড়লিনী হজ্ব করে এসে বলো
ইদুঁর ছোঁবেনা শপথ রেখেছে ঠিক,
কয়লার কাছে স্বচ্ছতা চাওয়া ভুল
কেননা যে তার ময়লা তো মৌলিক।
(দেখো)

www.pathagar.com

কবির কাব্যে একথা অবশ্যই স্পষ্ট যে তিনি একজন অভিযাত্রী কবির যাত্রা অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত মনজিলের জন্য। সে মনজিলের সন্ধানে তার নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধানী যাত্রা, কিন্তু সে যাত্রায় বিশ্রাম নেই। পদে পদে নতুন সঙ্কট, বৈরী পরিবেশ, বিচিত্র মানুষের জটিল স্বভাব কবিকে মনে করিয়ে দেয়-পথের কঠিন সম্ভাব্য কুটিলতা ও জটিলতায় গড়া আপাত মধুর সমাজকে–

গোখরো তোমার পেয়ালার হেমলক,
পালকে লুকানো হিংস্র ধারালো নখ।
(ক্রোধ)

তাই হয়তো কবির ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি দৃশ্যমান হয়ে ধরা দেয়-

ষড়যন্ত্রের আজদাহা চারপাশে
সর্বধ্বংসী প্রলয়ের হাসি হাসে
শত্রুমিত্র আজ চেনা হল দায়
মানবতা যেন পাড়ি দেয় অজানায়!
.....
এ কোন সময় পাড়ি দেয় জনতা,
কেউ কেউ জানে, অনেকে জানেনা তা!
অবিরত তবু রেখেছি আমার চলা,
উৎসাহ কথা নিজেকে নিজেই বলা,
(মনজিল কত দূরে।)

এ কবিতাটির মধ্যে কোথাও কোথাও যেন অদৃশ্য থেকে ফররুখ আহমদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কবি ফররুখ যেমন শুনতে পেতেন–

ওকি দরিয়ার গর্জন
ওকি রোনাজারি ক্ষুধিতের?
(সিন্দাবাদঃ সাত সাগরের মাঝি)

জীবনের ঘনায়মান কৃষ্ণচ্ছায়ার বেদনা মতিউর রহমানকেও সজাগ ও সতর্ক করে দিয়েছে এবং মানব সমাজকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি দায়বদ্ধ। কবিতার শত শত পংক্তিতে সারা বিশ্বের কবিরা যেমন প্রেম, যন্ত্রণা, ক্ষুধা দারিদ্র্য, হত্যা ও বিবেকের পরাজয়ে প্রকাশ করে গেছেন মানুষের যতো ভাবনা, এই কবিও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে কবির, সমাজ দর্পণে যে প্রতিবিম্ব গড়ে ওঠে, তার গূঢ় রহস্যকে স্পর্শ করেছেন। নিসর্গের সর্বাঙ্গে যে প্রেম, যে আবেগ, যে নিষ্ঠুরতা তা এই কবির হৃদয়কে সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছে। আর তা করেছে বলেই ধীরে ধীরে কবিতার অজানা দরজা খুলে গেছে কবির সামনে। ধরা দিয়েছে নানা অনুষঙ্গে। কবিতা সম্পর্কে এক সময় বলা হোতো, কবিতা কোমল বণিতা। ক্রমে ক্রমে কবিদের জগত বাস্তবের দখল নিয়ে হয়ে উঠলো যোদ্ধার হাতের হাতিয়ার। শ্রমিক আর মজুরের শ্রম ও ঘামের সাক্ষ্য। রোমান্সের কোমল পেলব স্পর্শ থেকে জীবনকে নিয়ে গেল ভিন্ন উচ্চতায়। সেই সঙ্গে পরিচয় ঘটলো বাস্তব নিষ্ঠুরতার। কবিও তেমন প্রেম ও কবিতার শরীরে বুনে গেছেন শব্দের নির্ঝর। বলেছেন-

www.pathagar.com

বৃক্ষের ওপর প্রেমের প্রথম কান্নারা
ঝরে ঝরে পড়ে
দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে যায়
আনন্দের প্রথম উচ্চারণের মত
ভালবাসার শব্দাবলী
(বৃষ্টিরা :চিত্রল প্রজাপতি)

মতিউর রহমান মল্লিক তার কবিতার মধ্য দিয়ে পরিচিত অনেক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন যা নতুন করে মানুষটিকে নিয়ে ভাবনা জাগায়। অনেক বরেণ্য কবি ও হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব ও কর্মী যারা ইতিহাসের চরিত্র ও বর্তমানের উন্নত জীবন চেতনার প্রতীক তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা কবির বহু কবিতায় ফুটে উঠেছে। এক ধরনের ইতিহাসের ছবি এঁকে যাওয়ার মতো। একটি মনোমুগ্ধকর কবিতা এখানে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। "অনবরত বৃক্ষের গান" গ্রন্থে "তুলনা" কবিতায় দেখি কবির মানস যাত্রার ভ্রমণ পথ চলেছে পাহাড়ে, আকাশে, নদীতে বনানী ছুঁয়ে। ফসলের মাঠে, মরু মালভূমি ও পুষ্প শোভিত গোলাপ বাগানে খোঁজেন এক দুর্লভ মানবের তুলনা, চলে যান বোঁস্তা গোলেস্তার পারস্যে হাফিজের সিরাজে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে উধাও বিশাল পথ রেখা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে কেউ বুঝি তাকে তিরস্কার করে বলে ওঠে–

রাসূলের সাথে তুলনা খুঁজছো,
সমতটী নাবালক?
উত্তরও দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে–
প্রিয় দোস্ত মোর নিজের তুলনা
নিজেই দিয়েছে শোন :
তোমাদের মত মানুষ আমি তো
নই যে অন্য কোন

এই পরম সুন্দর মানুষটিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবেই তিনি পরিচয় করিয়ে দেন পাঠকদের।

এবারে কবির ভিন্ন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। আমরা সাধারণভাবে কবির কথন ভঙ্গিতে ছন্দবদ্ধ প্রকাশ দেখতে পাই। কবি তার স্বভাবজাত স্বাধীনতায় বিষয় অনুযায়ী গদ্যভঙ্গী, ছন্দবদ্ধ কাঠামো ও শব্দের সবল প্রয়োগ করেছেন। তার লেখায় একই সঙ্গে সমস্ত জীবন ধারার মধ্যে থেকেই জ্বলে ওঠে বেদনার্ত হৃদয়ের দ্রোহ এবং ঘৃণা। "অভিশপ্ত অসুন্দরের প্রতি" তেমনই একটি কবিতা । তিনি অসুন্দরকে বলেন-

মনে হয় বাংলাদেশের সমস্ত নদীতে
তুমিই আগুন ধরিয়ে দেবে
তুমিই উৎপাটিত করবে সমস্ত বৃক্ষ সমস্ত সুন্দরবন
.....
তাই কবির আর্তি–
তোমার সমস্ত ভয়ঙ্কর থেকে
আমার হৃদয়কে, আমার ঘরকে,

www.pathagar.com

আমার স্বদেশকে
রেহাই দাও।
(গ্রন্থ: নিষন্ন পাখির নীড়ে)

কবি কঠিন সত্যকে ভাল করেই চেনেন, যা শত শত বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে চলেছে জীবনের সঙ্গী হয়ে-

উঠ্ছে গেয়ে ভূতেরা তেত্রিশ কোটি,
জমছে অন্য ক্লাইভের মদের কুঠি।
(ঋতুর স্বভাব)

সমকালীন পৃথিবীর সভ্যতার মুখোশের আড়ালে দেশে দেশে যে সন্ত্রাসের আগ্রাসন, সেই কষ্টের তীব্রতা তার কবিতাকে ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন-

ফিলিস্তিনীরা অনবরত যতোই নিহত হচ্ছে
ঠিক ততই
নক্ষত্রের মতো বেঁচে উঠছে দেখ,
.....
ফিলিস্তিনীদের দুই হাতে এখন
হামাসের মতো সাহসী পাথর।
.....
চৌদ্দ বছর বয়সী শহীদ হাস্নী আল নাজী
এক অফুরন্ত আন্তর্জাতিক সন্তান
(অশেষ ফিলিস্তিনীরা)

কবি জানেন, ঘৃণার চরম যন্ত্রণায় সব কথা বলা সম্ভব নয়। তাই তিনি কেবল জানিয়ে দেন অগোছালো আবেগ নয়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভাষা–

কী চমৎকার দেখা গেলোর মতো পেন্টাগনের
ভূগোল খেকো জঠর থেকে
বেরিয়ে আসে ইরাকের কঙ্কাল
ফিলিস্তিনীদের খুলি এবং হাড়গোড়
(পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভেতরে : গ্রন্থ: চিত্রল প্রজাপতি)

আমরা জানি কবি মাত্রেই মনের মধ্যে ছবি আঁকেন, কাহিনী লেখেন। তাই কবিতার স্বল্প পরিসরে জীবনের সকল চিত্র উন্মোচিত হয়। কেউ কাব্যে খোঁজে ভালোবাসা, যুদ্ধ, জলোময় অগ্নিদগ্ধ জীবন যন্ত্রণা, কেউ বা খুঁজে পায় দোয়েল টুনটুনির কাকলি মুখর স্মৃতি কাতর নীড়ের আবাস। কবির সঙ্গী হয়ে কঠোর অভিজ্ঞতায় ভারী হয়ে ওঠার পর এক পশলা বৃষ্টির মতো আনন্দ মুখর সকাল বিকেল, যে কথা কবি নিশ্চিন্তে শৈশবের ঘাটে বসে বলতে পেরেছেন–

তোমার কিশোরকালের
মতো এত পুকুরও তুমি কোথাও পাবে না

www.pathagar.com

এবং তোমার প্রগাঢ় পল্লবের মতো এমন
যৌবনও তুমি কোথাও পাবেনা।
(বিলের দিকে:অনবরত বৃক্ষের গান)

কিন্তু কবির এ যাত্রা শান্তির পূর্ণতা পাবার সময় দেয় না। কারণ পাশ ফিরে জীবনের দিকে মোড় ঘুরেই দেখেন–

অথবা যেখানেই জনপদ, জনারণ্য যেখানে
দুর্নীতি এসেই দাঁড়ালো দাপটে গিয়ে সেখানে,
(কষ্ট:'৯৭')

অথবা গ্রামীন পথে–
সাত হাটুরের সাথে
তোতলাতে তোতলাতে
তালপাতার কিষাণ বেলাতালী
জোড়াতালি দেয়া সংসারের মতোই
কথা বলে বলে ঝরে ঝরে পড়ে যায়
আজো কি?

কবির বেশ কিছু নিবেদন মন্দ্রিত কবিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, যেমন 'তোমাকে পাবার আনন্দে', 'বিজয় সরণী দিয়ে', 'রাসূল' ইত্যাদি। আমার মনে হয়েছে এ সৃষ্টিগুলো আলাদা বিন্যাসে প্রকাশ করলে পাঠক আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। তার বেশ কিছু গীতি কবিতা ও গান শোনার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে 'ঝঙ্কার' ও 'যতো গান গেয়েছি' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রতীতি-১, প্রতীতি-২ তার সঙ্গীত মনস্ক সৃষ্টি যা তরুণদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

শিশু কিশোরদের প্রতি তার মমতার পরিচয় পাই তার রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ 'রঙীন মেঘের পালকি'র মধ্যে। প্রতিটি কবিতা শিশু মনের আনন্দ, ছন্দ ও প্রাণ শক্তিতে ভরপুর। বেশ কিছু কবিতা গান হয়েছে। শুধু একটি কবিতার কথা বলতে চাই-

খুব সকালে উঠলো না যে–
জাগলো না ঘুম থেকে,
কেউ দিও না তার কপোলে
একটিও চুম এঁকে।
(খুব সকালে)
পরিচ্ছন্ন, ঝরঝরে বইটি হতে পারে সবার আনন্দের উৎস।

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে অনুধাবন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এই কবির আরও অনেক লেখার কথা ছিল। তার মধ্যে অনেক বজ্র অনেক বিদ্যুৎ ছিল। ছিলো বৃষ্টির নির্ঝর ও বহু সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি। তার 'ইতিবৃত্ত' 'ট্রানজিট' ও 'রক্তাক্ত স্বপ্নের কথা' পড়ে আমার মনে হয়েছে বাস্তবিকই পাঠক বঞ্চিত হয়েছেন এই শক্তিশালী কবির চলে যাওয়ায়। কবির হৃদয়টি পূর্ণ ছিলো সম্ভাবনা ও সৃষ্টির প্রশান্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং বিশ্লেষকের চেতনায়। নিজেকে তিনি সতর্ক করেছেন এই বলে যে–

www.pathagar.com

খুব বেশী আকাশ হয়ে যাচ্ছো তুমি
মেঘ এবং বিদ্যুতের মতো সংঘর্ষ
তোমাকে ছাড়বেনা
খুব বেশী বটগাছ হয়ে যাচ্ছো তুমি
ঝড় এবং বজ্রপাত তোমাকে ছাড়বেনা।
(তোমাকে নিয়ে)

কবির স্বাধীন সত্তা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে 'বস্তুত একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য' এখন আমি এক সিরাজদ্দৌলা ছাড়া আর কাউকেই সহ্য করতে পারছি না। (একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্য)

কেন এই ক্রোধ? কবির মধ্যে কি এই ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণ কাম্য ছিলো?
কংকালসার গণস্বার্থের
কফিনে শেষ
পেরেক ঠোকার আয়োজকদের
দুলছে কেশ
বাবরি দোলানো সিংহের মত
সহিংস;
(ঈদ:পুষ্পিত বনের বৃত্তান্ত)

অথবা ব্যথিত বঞ্চিত প্রতারিত মানুষের বুকের মধ্যে ওঠা পংক্তিগুলো যেন কবির কণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছে-

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।
নাইবা দিলাম জল
নাইবা দিলাম
চালের মতন বাঁচবার সম্বল
রাখী বন্ধন ঘোড়াতো দিয়েছি
পাঁচ ছয়টার মতো!
.....
গেঁথেছি কত যে রাজনীতিবিদ
বুদ্ধিজীবী ও লেখক-
.....
কিনেছি বিবেক
মান সম্মান অহং আত্মবোধের।
প্রচার পত্র তাওতো কিনেছি-
মন্ত্রমুগ্ধ মিডিয়া কিনেছি কতো।
আমাদের গড়া নফররা দেখ্
কতো বেশী হা-হা-হা-কত বেশী সংহত।"
(ট্রানজিট: নিষণ্ন পাখির নীড়ে।)

এখানেই তিনি দায়িত্ববান এক কবি। ইতিহাস এভাবেই ধরে রাখে কবির কলম। উদ্বাস্তু, ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ, কুণ্ঠিত মানুষের বিবেকের পরাজয় পরাধীনতার পদলেহী-ছদ্মবেশ ভেদ করে

www.pathagar.com

প্রকাশিত নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে আমরা চমকে উঠি। লজ্জা ও বেদনায় মূর্ছিত হয় আমাদের অন্তরাত্মা।

এখানেই তার কমিটমেন্ট। শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে, যৌবনের সুহৃদদের গ্রামীণ হাতের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে এই কবি এসে দাঁড়িয়েছেন নগরায়ণের নিষ্ঠুর প্রতিকৃতির সামনে। ক্ষত বিক্ষত হলেও তার ভেতরটির সতেজ শ্যামলিমা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে আকাশের সুদূর বিস্তারে। আহ্বান জানাচ্ছে সজাগ সচেতন মানুষদের।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক কবিতার চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময়। প্রতিটি দেখা এবং জানার অভিজ্ঞতাকে তিনি সযত্ন চর্চায় সাজিয়ে দিয়েছেন। আমি অনুভব করি জীবনের কাছে তার আরও সময়ের অধিকার ছিলো। বৃহত্তর কিছু দেবার অনন্য ইচ্ছা ও প্রয়াসও ছিলো। তবুও যা তিনি দিয়ে গেছেন, তার মূল্যায়ন অবশ্যই হবে। কবিতার কঠিন রাজ্যে স্বপ্ন, বাস্তব ও পরাবাস্তবের স্পর্শকে সত্তার সঙ্গী করে নিয়ে যারা বাস করেন, নিজেদের ভেতরের ভেতরকে ক্ষয় করেই তা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন–

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
কবিরে দেখোনা বাহিরে
কবিরে যেথায় খুঁজিছ, সেথা সে নাহিরে!

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় যে জীবনের উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায় মানুষের সঙ্গে রয়েছে তার গভীর সংযোগ। সর্বক্ষেত্রে তিনি হয়তো পূর্ণ যত্ন বিধান করতে পারেননি, কিন্তু কবির সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তা রয়েছে দৃঢ়মূল বৃক্ষের মতো। আমরা পাঠকেরা কবির কাছে অনেক কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চাই। এই কবি পাঠকের সহযাত্রী হয়ে সেই রহস্যময় পৃথিবীর পথে পথে চলেছেন। তার অভাব আমাদের দু:খ দেয় সত্য। তবু মনে করি তিনি সবার মাঝখানেই রেখে গেছেন তার হৃদয়খানি। কবি নিজেই বলে গেছেন–

আজ সারাদিন
সমুদ্রের শুভ্র শুভ্র
অনিশেষ মৌমাছিরা
আমাকে কবি না-বানিয়ে
ছাড়লো না।

আকাঙ্ক্ষা করি, পাঠকের সঙ্গে তার বোধির বন্ধন অটুট ও দৃঢ়তর হোক।

লেখক : বহুগ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী।

www.pathagar.com

অবিস্মরণীয় কণ্ঠশিল্পী মতিউর রহমান মল্লিক

মীর কাসেম আলী

আমার সাথে মল্লিক ভাইয়ের সাক্ষাত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। যখন সফর উপলক্ষে খুলনা গিয়েছিলাম। আনসার উদ্দিন হেলাল ভাই তাঁর গ্রামের বাড়ি ফকিরহাটে দাওয়াত দিলেন। ফেরীতে রূপসা পার হয়ে ব্রিটিশ আমলের ট্রেন যোগে রূপসা-বাগেরহাট লাইনে রওয়ানা দিলাম। ট্রেনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক হেরিটেজের প্রতীক। গায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নাম অংকিত থাকলেও যাত্রী উঠা-নামায় কোন বাছ-বিচার ছিল না। যেকোন বগীতে উঠতে পারতো যে কেউ। টিকেটের বালাই ছিল না বললেই হয়। সারা পথেই লোকজন উঠা নামা করত। আমরা দুপুর নাগাদ ফকিরহাট গিয়ে ঠেকলাম। সুন্দর ছবির মতো সাজানো গোছানো বাড়ি। অনেক রকম গাছের সমাহার। খাওয়া দাওয়ার পর গোল পাতা দিয়ে ছাউনীর ঘরে খোলা বারান্দায় গল্প করছিলাম সবাইকে নিয়ে- এ সময় পায়জামা পাঞ্জাবী পড়া মালেক ভাইয়ের চেহারার এক তরুণ এসে দাঁড়াল। আনসার উদ্দিন ভাই বললেন, ওর নাম মতিউর রহমান মল্লিক। কবিতা লেখে, গান লেখে, গান গায়। আমি তখন ইসলামী সঙ্গীতের চর্চা বাংলাদেশে চালু করার জন্য একটি মাত্র ফিলিপস্ টেপ রেকর্ডার সাথে নিয়ে সারা দেশে ঘুরতাম। টেপ রেকর্ডারটি নাসের ভাই '৭৪ সালে হজ্জ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। রেকর্ড করা গান গুলো সারা দেশে টিসি, টিএস সহ অন্যান্য প্রোগ্রামে বাজিয়ে শুনাতাম এবং ইসলামী সঙ্গীত গাওয়াকে উৎসাহিত করতাম। রেকর্ডকৃত উল্লেখযোগ্য গানগুলো ছিল ডা. মোহসীন যিনি এখন প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ তার গাওয়া গান, গোলাম মোস্তফা রচিত হে খোদা দয়াময় রহমানো রহিম ..., আমাদের ছোট ভাই শেরপুরের গোলাপ, তার গাওয়া' আল্লাকে যদি পেতে চাও, মোহাম্মদকে ভালোবেসো .....।

আমার অনুরোধে মল্লিক ভাই দরাজ কণ্ঠে গাইল–
মুসলিম আমি, সংগ্রামী আমি, আমি চির রণবীর
আল্লাকে ছাড়া কাউকে মানি না, নারায়ে তাকবীর।

আধুনিক গানের সুরে গাওয়া ইসলামী গান আমাকে বিস্মিত করলো। বুঝতে পারলাম এ এক সোনার খনি। বললাম ঢাকা চলে আসুন, সব দায়িত্ব আমাদের। মল্লিক ভাই ঢাকায় চলে আসলেন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে শুরু হলো ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনের অফুরন্ত ঝরনাধারা। সাইমুম দিয়েই যাত্রা শুরু। হিমালয়ের শিখর থেকে ঝরনাধারা গড়িয়ে পড়তে পড়তে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহু নদ-নদী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে দিল আবে-হায়াতের ফলগুধারা।

www.pathagar.com

মল্লিকের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলামী সংস্কৃতির এক প্লাবন সৃষ্টি করার তৌফিক দিলেন। ইসলামী সংস্কৃতির ঢেউ আজকে সারা বাংলাকে প্লাবিত করে, পশ্চিম বাংলা থেকে শুরু করে ইসলামী আন্দোলনের অস্তিত্ব যেখানে যেখানে আছে সেখানে সভা-সমাবেশে, পিকনিকে, পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিনোদনে ইসলামী সংস্কৃতি আজ কমবেশি অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি নিজে কবি নই, শিল্পী নই, গায়ক নই। তবে ফকিরহাটের এক নিভৃত পল্লী থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সিপাহসালার এই রত্নকে কুড়িয়ে আনার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহর কালামকে দিগ্‌বিজয়ী করার এই সংগ্রামে এই খেদমতটুকু যদি আল্লাহ পাক কবুল করেন, আমি বিশ্বাস করি পরকালে আমার নাজাতের বিরাট উসিলা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

একদিনের স্মৃতি-

ইসলামী ব্যাংক পরিচালক বোর্ডের এক সভায় বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের সাক্ষাতকার নেয়া হচ্ছিল। প্রথমে আমি মল্লিক ভাইকে বললাম কবিতা আবৃত্তি করতে। মল্লিক হৃদয় মন্থন করে শুরু করলো, সাত সাগরের মাঝি ..... পুরো বোর্ড তন্ময় হয়ে শুনছিল। মনে হচ্ছিল কখনো যেন শেষ না হয় এই আবৃত্তি। আর সাক্ষাতকার নেয়ার দরকার ছিল না । আজীবন পরিচালক নিযুক্ত হলো মল্লিক।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের মৌলিক ত্রুটির মধ্যে অহংবোধ এবং নিজেকে বড় মনে করার কারণে অনেকেই সরল পথ থেকে ছিটকে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে মল্লিক ভাইয়ের আপ্রাণ আপোষহীন ভুমিকায় বাংলাদেশ আজ ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতদূর এগিয়ে গেছে। এটি তার বড় উপহার ইসলামী আন্দোলনের জন্য। মল্লিকের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি আছে, তা কোনদিন সময় হলে বলব, ইনশাআল্লাহ। তবে সুন্দরবনের এক সন্ধ্যার কথা না বলে পারছি না। ইবনে সিনা, রাবেতা এবং ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এক বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সুন্দরবনের হিরন পয়েন্টে। সন্ধ্যার পর মাগরিবের নামাজ পড়া হলো, চাঁদনী রাতের নিঝুম পরিবেশ। আমি অনুরোধ করলাম প্রতিটা গানের ভূমিকাসহ (Background) গান শোনানোর । সে এক বিশাল অভিজ্ঞতা। মল্লিকের সেরা গানগুলো আন্দোলনের কোন অবস্থায় রচিত তা বলার পর সেটা গাইতে লাগল। রাত ১০টা বেজে গেলে জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সে অনুষ্ঠান আর চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ইতি টানতে হলো। তা না হলে সম্ভবত সারা রাত আমরা এ অনুষ্ঠান চালাতাম।

মল্লিক ভাইয়ের সাথে জান্নাতের গুল বাগিচায় আমরা আবারো মিলিত হয়ে যেন তার গান শুনতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সে তৌফিক দান করুন। আমীন।

লেখক : সংগঠক বহুমুখী সামাজিক কর্মকাণ্ডের পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক : অমর শিল্পী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

মতিউর রহমান মল্লিককে আমি দীর্ঘ অতীত ও দূর ভবিষ্যতের ক্যানভাসে বিবেচনা করতে চাই।

আমরা যে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহন করছি তার জন্য যুগে যুগে অনেক মনীষী কাজ করেছেন। তাদের সাধনার ধারাবাহিক সঞ্চয়রূপে আমরা বর্তমান সাংস্কৃতিক পাটাতন পেয়েছি। এ পাটাতন কখনো দুর্বল হলে জাতীয় জীবনে দুর্যোগ আসে। বাংলায় পাল শাসন ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিলোপ কিংবা পলাশীতে মুসলিম সভ্যতার দুর্যোগ এমনি সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ফল। সাংস্কৃতিক পাটাতন মজবুত হলে জাতি সে শক্ত ভিত্তির ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। দাবি করতে পারে আমরাই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা নির্মাণ করি এবং আমরাই সে ধারাকে এগিয়ে নেই।

পলাশীর পর ফোর্ট ইউলিয়াম কেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক ভূগোল মুক্ত করতে কত প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে! আল মাহমুদ সে পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ঢাকাকে বাংলা সাহিত্যের রাজধানী বলেন। কিংবা হুমায়ুন আহমেদ সে জমিনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমরাই বাংলা সাহিত্যে ডমিনেট করি'। সেই 'ঢাকা' আর সেই 'আমরা'র প্রত্যয় নির্মাণের কথা আমি বলছি।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল অবধি নিরবচ্ছিন্ন আপোসহীন সংগ্রাম! বাঁচার লড়াই। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব-পরবর্তী নওয়াব আবদুল লতীফের নবযুগের হাতছানি। জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান-ইসলাম বা উম্মাহ চেতনা। সে ধারায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ, শেখ আবদুর রহীম, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নজীবর রহমান সাহিত্যরত্নদের কলমযুদ্ধ...।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী। সিরাজী থেকে নজরুল। জাগরণকামী সে সাংস্কৃতিক ধারার কারিগর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, মওলানা আকরম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, নাসিরউদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ...। আরো কত সাংস্কৃতিক নির্মাণের কারিগর। ... চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান আর আহসান হাবিবদের মিলিত আবাহনে নারাঙ্গী বনে সবুজ পাতা দোল খায়। পঞ্চাশের দশকে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন আর শহীদ কাদরীরা সে তরীতে নতুন পাল ওড়ান। পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলনের প্রাণরসে সিক্ত হয়ে ষাট ও সত্তর দশক নাগাদ পূর্ব বাংলার ধান-পাট-সরিষার মাঠ থেকে উঠে আসা হাজারো কৃষক সন্তানের অংশগ্রহণে

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলায় সংস্কৃতির এক নতুন বদ্বীপ জেগে ওঠে। আর অচিরেই আশির দশকে আমরা ঢাকাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী ঘোষণার হিম্মত পাই।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পালাবদলের এ এক দীর্ঘ পরিক্রমা। 'কত যে আঁধার পর্দা পেরিয়ে' ঢাকা এখন বাংলা সাহিত্যের রাজধানী। আর সে রাজধানীতে আশির দশকে যারা তাদের জ্ঞানের পরাক্রম, ভাব-সম্পদের বৈভব আর শিল্পের সুষমা নিয়ে উপস্থিত হন, মতিউর রহমান মল্লিক তাদের একজন।

মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের অল্প ক'বছর পর ১৯৫৬ সালের মার্চে। সে বছর এবং সে মাসেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তখনো ঢাকার সদরঘাটে কিংবা চাঁদপুর ও বরিশালের লঞ্চঘাটে কিংবা ঢাকার বাংলাবাজারে কলকাতার লেখকদের গল্প-উপন্যাসের একাধিপত্য। সে বছর ঢাকায় নিউ মার্কেটের ভিত্তি স্থাপিত হলেও বইয়ের বাজার হবার কোন অবস্থা ছিল না। আজীজ সুপার মার্কেট কিংবা এমনি সব বই বিতানের কথা তখন কল্পনা করেনি কেউ। এই তখনকার পূর্ব বাংলার সাহিত্য আর সংস্কৃতির চেহারা।

মল্লিকের জন্মের দু'বছর পর ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে 'বুনিয়াদি গণতন্ত্রে'র অধীনে ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ। ৬৭-৬৯-এ উত্তাল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ঊনসত্তরে গোল টেবিল বৈঠক। সত্তুরে নজীরবিহীন জলোচ্ছ্বাস আর সে বছরই দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনোত্তর টানাপোড়েন বেয়ে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ। রক্তের মূল্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

এ সব ঘাত-প্রতিঘাত এবং নির্মাণ ও ক্ষরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জারক-সিক্ত সময় বেয়ে কিশলয়ের মতো বেড়ে ওঠেন, মতিউর রহমান মল্লিক।

মল্লিক স্বাধীন বাংলাদেশের কবি-কর্মী। মল্লিক গীতিকার। মল্লিক গায়ক। মল্লিকের গান হঠাৎ যেন এক ভিন্নমাত্রা নিয়ে হাজির হয়, সকলের সামনে। মল্লিক একেকটা গানে টান দিলে শ্রোতারা চমকে ওঠেন। আর...মল্লিক একা গাইছেন না। মল্লিক যেখানে দাঁড়াচ্ছেন তার পেছনে তরুণেরা গলা খাড়া করে তার গানের পেছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

১৯৭৮ সালে মল্লিকের নেতৃত্বে ঢাকায় গড়ে ওঠে, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী। সে বছরই তার প্রথম গীতি কবিতার সংকলন 'ঝংকার' প্রকাশিত হয়ে মানুষের প্রাণের বীণায় নতুন টংকার তোলে। এরপর আশির দশকে তার কথা ও সুরে স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের ক্যাসেট 'প্রতীতী' শ্রোতাদের কানে নতুন প্রত্যয়ের বাণী তুলে ধরে। ... এভাবে মতিউর রহমান মল্লিক সহসাই একটি নতুন ধারার স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। সারা দেশে মল্লিকের কণ্ঠের ধ্বনি অনুরণিত হয়ে, বহু হৃদয় আন্দোলিত হয়। মল্লিকের ধারায় তখন থেকে সারাদেশে নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

এদেশে অনেক বড় বড় শিল্পীর মাঝে দেখি আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে মানুষের আত্মার বাণী কিভাবে লাফিয়ে উঠেছে। তেমনি আব্বাসউদ্দীনের একজন গুণমুগ্ধ উত্তরসূরী মল্লিক ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলার বঞ্চিত ও অবহেলিত সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের বাণীকে কণ্ঠে ধারণ করেন।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক আশির দশকের একজন প্রধান কবি। তার কাব্যগ্রন্থ 'আবর্তিত তৃণলতা', 'অনবরত বৃক্ষের গান', 'তোমার ভাষার তীক্ষ্ণ ছোরা', 'চিত্রল প্রজাপতি', 'নিষন্ন পাখির নীড়ে' কিংবা ছোটদের ছড়ার বই 'রঙিন মেঘের পালকি' পাঠক নন্দিত। প্রবন্ধে মল্লিক স্বল্পপ্রজ। তার কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' নামে। মল্লিক অনুবাদ করেছেন দুই-দুইটি উপন্যাস 'পাহাড়ি এক লড়াকু' ও 'মহানায়ক'। এছাড়া তিনি হযরত আলী রা. ও আল্লামা ইকবালের কিছু কবিতা বাংলা ভাষার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

মল্লিক ইকবালকে পাঠ করেছেন। নজরুল ও ফররুখকে আত্মস্থ করেছেন। বাংলাভাষার প্রধান কবিদের তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছেন। কবিতার বিষয় ও কাব্যের ব্যাকরণে তার অধিকার ছিল। আর তিনি কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণীকে তার কবিতা ও গানে বিন্যস্ত করেছেন। কোরআন-হাদিস ভিত্তিক শিল্পচর্চার ঐতিহ্য আমরা এ দেশে এক সময় শেখ সাদী, হাফিজ ও রুমীদের কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিলাম। এখন সে ঐতিহ্যের ধারা দুর্বল ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। মল্লিক এ ধারাটির সন্ধান জানতেন। তিনি ফার্সী সাহিত্যের বড় বড় কবিদের অনর্গল উদ্ধৃত করতে পারতেন।

মল্লিক ছিলেন একজন বোদ্ধা লেখক, সরস আলোচক ও লক্ষ্যনিষ্ঠ সমালোচক। তার লেখায় ও আলোচনায় গভীর জীবন দৃষ্টি আমরা লক্ষ্য করি। মল্লিক তার কবিতা ও গানে মানুষকে 'ইনসানে কামিল' বা 'পূর্ণ মানব'রূপে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। পরিব্যাপ্ত এক উদার দিগন্তের শাহীন হতে তিনি তার কাব্যপ্রেমীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ইতিহাসে মল্লিকের বিশেষ মুগ্ধতা ও মগ্নতা ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি ইতিহাসের গভীরে ডুব দিতে পারতেন। তিনি ইতিহাস পাঠ করতে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলতেন। সারাদেশে তার যে বিরাট ভক্তদল গড়ে উঠেছে, তাদের মাঝে তিনি ইতিহাসের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তার কবিতায়, গানে কিংবা প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের নানা উপাদান হাজির করেছেন। ইতিহাসের বড় ক্যানভাসে জাতির বর্তমানকে ধারণ করা ও উপস্থাপন করার একটি অবিরাম চেষ্টা আমরা মল্লিকের মধ্যে লক্ষ্য করি।

মতিউর রহমান মল্লিক জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। সাংস্কৃতিক সীমানা অরক্ষিত হলে ভৌগোলিক সীমানা বিপন্ন হয়। এটা তিনি ইতিহাস থেকে জেনেছিলেন। এর বিপদ সম্পর্কে তিনি সকলকে সতর্ক হতে বলেছেন। আর সাংস্কৃতিক সুরক্ষার জন্য স্বকীয় শক্তিশালী শিল্পধারার বিকাশ ঘটাতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন।

মল্লিক সেখানে একা লড়েননি। মল্লিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে, ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠান। তার নেতৃত্বে 'বিপরীত উচ্চারণ' বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। মল্লিক প্রায় এক যুগ সাহিত্য মাসিক 'কলম'-এর সম্পাদক ছিলেন। তার 'কলম'কে ঘিরে অনেক কলমের সৃষ্টি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তার চিন্তা ও কর্মের শাখা-প্রশাখা। মল্লিককে অনুসরণ করে একটি ফুল শুধু নয়, অনেক ফুলের মালা সৃষ্টি হয়েছে। এটি মল্লিক-জীবনের একটি অসাধারণ ব্যাপার। অসামান্য সাফল্য।

মতিউর রহমান মল্লিক যত কাজ করেছেন, পত্র-পত্রিকায় তার উপস্থিতি সে তুলনায় কম ছিল। তবে তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার কাব্যধারার অনুরাগীদের মধ্যে। মল্লিক কাজ

www.pathagar.com

করেছেন সর্বজনের জন্য। সর্বজনের কাছে তার কাব্য ও গানের পরিচিতি এক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হালকা-পাতলা গড়নের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর একজন মানুষ ছিলেন, মতিউর রহমান মল্লিক। অবিচল বিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন মনন ও গভীর মনীষার অধিকারী সক্রিয় চেতনার একজন অসাধারণ মানুষ। জীবনের শেষ চুমুক অবধি সৃজনশীলতায় সক্রিয় একজন শিল্পী। তার সাহিত্য সাধনা, সঙ্গীত-মগ্নতা কিংবা সাংগঠনিক সক্রিয়তা। সব কিছুর কেন্দ্র-বিন্দুতে ছিল হেরার জ্যোতির বিচ্ছুরণ। সে পথের নিবিষ্ট পথিক-কবি-শিল্পী-সাধক মতিউর রহমান মল্লিক।

হেরার আলোয় পথচলা মিশনারী মল্লিকের শরীরটা যখন দায়িত্বের ভারে হেলে পড়েছে তখনো তার মনটা সৃষ্টির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। সক্রিয় চেতনায় কম্পমান কর্তব্য-কাতর মল্লিক তখনো তার জীবনকে দেখেন একটি ঘড়ির উপমায়। 'টিক টিক টিক টিক সেই ঘড়িটা বাজে! ঠিক ঠিক বাজে/ কেউ কি জানে এই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে!'

জীবনের শেষ দুই বছর রোগশয্যায় কেটেছে মল্লিকের। ... এই অসহায় দিন গুজরানোর সময়ও মল্লিক কর্তব্য-তাড়িত। 'সময় বয়ে যায়'! এই বোধ তাকে হাসপাতালের শয্যায় কষ্ট দেয়। মল্লিক কলম হাতে কালের পাতায় চোখ রাখেন। কথা বলেন 'বহতা সময়'-এর সাথে : 'ঘড়ির কাঁটার সাথে/সময়ের কাঁটা বাঁধা আছে বলে মনে হয়/ঘড়ির কাঁটা থামেও যদি/থামে না বহতা সময়/শুধু তার হাত ধরে ছুটে চলা– দিগন্তে বেলা ক্ষয়ে যায়।/নদীর স্রোতের মতো– সময় তো বয়ে যায়।/...'

মতিউর রহমান মল্লিকের শারীরিক উপস্থিতি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার গান। তার কবিতা। তার সুর। তার কথামালা। তার অনুসারী দল। তাদের কণ্ঠে কল্যাণ ও মুক্তির আযান। সেই আযান ইথারে ভাসবে। ছড়িয়ে যাবে সবখানে। ... আমাদের ভবিষ্যত সাহিত্যধারায় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষায় মতিউর রহমান মল্লিক অবিরাম অবদান রেখে চলবেন। মল্লিক মৃত্যুহীন। মল্লিক অমর।

*** মতিউর রহমান মল্লিক ***

মল্লিকের সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৭ সালে। তখন আমি 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ'-এর সভাপতি। এই সংসদের পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের একজন হয়ে পুরস্কার নিতে ঢাকায় আসেন, বাগেরহাটের মতিউর রহমান মল্লিক।

পরিচয়ের পর থেকে মল্লিককে আমি নতুন নতুন মাত্রায় জেনেছি। প্রতিটি নতুন পরিচয়ে মল্লিকের প্রতি আমি নতুন মাত্রায় আকৃষ্ট হয়েছি। ... মল্লিককে আমি 'শ্রদ্ধেয় ছোটভাই' বলে সম্বোধন করতাম। ফলভারে অবনত বৃক্ষের মতো বিনম্র মল্লিক লাজুক ভঙ্গীতে সম্বোধন করতেন 'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই' বলে। 'শ্রদ্ধেয় ছোট ভাই' মল্লিকের লাজুক হাসিমাখা সেই কণ্ঠধ্বনি আজো শুনি।

লেখক : ইতিহাসবেত্তা, সাহিত্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যাংকার।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক: এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবসান

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

মতিউর রহমান মল্লিক আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে সেই আশির দশকে যখন তিনি প্রথম ঢাকায় পদার্পণ করেন। সুদূর বাগেরহাট থেকে রাজধানীতে এসে প্রথমত কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও বন্ধু ও ভক্তদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে তিনি দ্রুত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। তাঁকে ঢাকায় আনা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবেই। যখন তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশোন্মুখ হতে শুরু করেছে তখনই তিনি আমাদের সংগঠনের কাছে এক সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবার নজর কাড়েন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন তাকে মফস্বলের সীমিতগণ্ডির বাইরে এনে বৃহত্তর জাতীয় পরিসরে তাঁকে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। আমি তখন ঢাকা শহরের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। তাঁকে আমার সাথেই সংযুক্ত করে দেয়া হলো। তাঁকে বলা হলো একটি সঙ্গীতগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে।

মতিউর রহমান মল্লিক স্বভাবগতভাবে শিশুর মতো বিনয়ী ছিলেন। নিজেকে সর্বদাই পেছনের দিকে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন। এত সুন্দর করে গান, কবিতা লিখতেন, দরাজ গলায় গাইতেন; কিন্তু এনিয়ে তার মধ্যে কোন অহংকার তো ছিলোই না; বরং নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। এর আগে কবি নজরুল ইসলাম ও আবাসউদ্দীন আহমেদ যে কালোত্তীর্ণ ধারা শুরু করেছিলেন মল্লিক তাঁর প্রতিভার জোরে সে ধারাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। অধিকন্তু তিনি একটা ভিন্ন মাত্রায় ইসলামী সঙ্গীতের এক নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

মল্লিক ভাই আমাদের সাথে পুরনো ঢাকার একটি মেসে থাকতেন। একদম সাদামাটা জীবন ছিল তাঁর। লাজুক স্বভাবের মল্লিক জ্যেষ্ঠদের সামনে লজ্জা ও বিনয় ন্যুব্জ হয়ে থাকতেন। তিনি সঙ্গীতগোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে যেয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক জগতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে আগে নিজেকে গড়তে হবে। তিনি ভালো করেই জানতেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ঝড়-ঝঞ্ঝা কত বেশি। ঐতিহ্যগত সঙ্গীত চর্চার যে ব্যাকরণ আমাদের দেশে চালু আছে তাকে উপেক্ষা না করে কীভাবে ইসলামী সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র প্রবাহ রচনা করা যায় সেটাই ছিল তার সাধনা। তিনি সঙ্গীতের গ্রামার জানার জন্য অনেকটা গোপনে হারমোনিয়াম হাতে নিয়ে সঙ্গীত চর্চা শুরু করেন। হারমোনিয়াম দিয়ে ইসলামী সঙ্গীতের সাধনা করতে হবে এমন ধারণার চরম বিরোধী ছিলেন অনেকেই। এজন্যেই

www.pathagar.com

গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়েছিল। মল্লিক ভাই ছিলেন প্রচন্ড রকম স্পর্শকাতর; আত্মমর্যাদাবোধ ছিল খুবই প্রখর। তাই গোপনীয়তা ছিল একটু বেশি মাত্রায়।

মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একজন স্বভাবজাত শিল্পী। তিনি নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং গাইতেন। সঙ্গীত চর্চাও ব্যাকরণ শেখার আগে থেকেই তিনি এগুলো করতেন। ঢাকায় আগমনের পর আমরা তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে শুরু করলাম। সত্তর দশকের শেষ দিকে ঢাকায় ইসলামী অনুষ্ঠানমালার একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বাহাত্তর থেকে পচাঁত্তর পর্যন্ত দেশে ইসলামী অনুষ্ঠান বলতে গেলে ছিল না। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর ইসলামী আন্দোলনের নেতারা ভাবলেন দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে সেকুলারিজমের বিষবাষ্প থেকে রক্ষার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটাতে হবে। এরূপ একটা সময়ে শিল্পী মতিউর রহমান মল্লিক যেন কাল বোশেখী ঝড়ের মত ঢাকার আকাশে আবির্ভূত হন। এ সময় মল্লিক যে অনুষ্ঠানেই গেছেন, তার সুরের ঝংকারে আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর প্রথম গানের সংকলন "সুর শিহরণ" আমি সম্পাদনা করি। এতে কবি নজরুল ও ফররুখ আহমদের কয়েকটি গানও অন্তর্ভূক্ত ছিল। বইটি আমার সংগ্রহে আজ আর নেই।

আমি নিজে সংস্কৃতি কর্মী হলেও নিজে গান-কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারিনি। তবে প্রবন্ধ লিখে প্রশান্তি ও স্বস্তি পেতাম। আমরা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে যেয়ে প্রথমেই যে সমস্যা মোকাবিলা করলাম তা হলো: কীভাবে আগাতে হবে তার কোন দিক-নির্দেশনা পাচ্ছিলাম না। সাধারণ অর্থে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বলতে নাচ, গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। সুতরাং সব মাধ্যমকে কীভাবে ইসলামীকরণ করা হবে বা এর বিকল্প কিছু করার সুযোগ আছে কিনা অথবা থাকলে তা ইসলামী শরীয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা নানাবিধ বহু প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমাদের কাছে ছিল না। এ অবস্থায় আমরা পরীক্ষামূলক কিছু প্রয়াস শুরু করি। ইসলামী সঙ্গীতকে একটু আকর্ষণীয় ও একটু ব্যতিক্রমী করার জন্য স্থির স্পাইড তৈরি হলো। প্রধানত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কিছু দৃশ্য এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক মসজিদ ছিল এর বিষয়বস্তু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজ শুরু করা হলো। ১৯৭৮ সালের ছাত্রসংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আমরা আবাসিক হলগুলোতে ইসলামী সঙ্গীত ও স্থির স্পাইড প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সঙ্গীত ও স্পাইড প্রদর্শনীর সাথে থাকতো আবেগময়ী ভাষায় ধারাবিবরণী। এগুলো লেখার দায়িত্ব ছিল আমার। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আবাসিক হলগুলোতেও একই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। অনুষ্ঠানগুলোতে অভাবনীয় সাড়া পাই যা আমাদেরকে সামনে চলতে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে।

ঢাকা জেলার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্বে ছিলেন রেজাউল করিম শফিক, যিনি কর্মজীবনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে পরলোক গমন করেন। শফিক ভাই একদিন জানালেন নারায়ণগঞ্জ জেলার মুরাপাড়া কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি, অভিষেক অনুষ্ঠানে একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি থাকতে হবে। তিনি আমাদের সাহায্য চাইলেন। মল্লিক ভাইকে রাজী করানো হলো। আমি আগেই

www.pathagar.com

একটা ধারাবর্ণনা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। তখনও কাঁচপুর ব্রীজ নির্মাণ হয়নি। সুতরাং ডেমরা ফেরীঘাট থেকে নৌকায় করে যেতে হবে মুরাপাড়া। আমরা তিনজন ছাড়াও মল্লিক ভাই তাঁর ৪/৫ জন সহশিল্পীকে সাথে নিলেন। নৌকাভ্রমণের আনন্দই আলাদা। নৌকায় বসে শুরু হলো আড্ডা। হঠাৎ করেই মল্লিক ভাই বললেন, মুরাপাড়া কলেজে অনুষ্ঠান তো করবো, কিন্তু আমাদের শিল্পীগোষ্ঠীর একটা নাম থাকলে ভালো হতো না? আমি তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব করলাম: "সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী" নামটি কেমন লাগছে? মল্লিক ভাইসহ সবাই একযোগে সমর্থন করলো। আমার ভালো লাগলো নামটি সবার পছন্দ হওয়ায়। সেই থেকে মল্লিক ভাই সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক। কলেজে পৌঁছে দেখি শতশত ছাত্র-শিক্ষক এবং কিছু অভিভাবক। অনুষ্ঠান শুরু হলো। আমি ধারাবিবরণীতে এবং সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর গান মল্লিক ভাইয়ের নেতৃত্বে শুরু হলো। মল্লিক ভাইয়ের সহশিল্পীরা তখনও পরিপক্কতা অর্জন করেনি। শ্রোতাদের বিশেষ আকৃষ্ট করা গেলো না। অনুষ্ঠান শেষ হলে শ্রোতাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেলো। তাঁর মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি হঠাৎ দৌড়ে নদীর পাড়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ে দেখতে পাই তাঁর চোখে অশ্রু। আমি ও শফিক ভাই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে যে সংশয় নেই; বরং আমাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতায় শ্রোতাদের প্রত্যাশা ছিল গতানুগতিক-একথা তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। এরপর কিছুদিনের মধ্যে মল্লিক ভাই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন; কারণ তিনি জানতেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীকে দাঁড় করানো তার একটি পবিত্র দায়িত্ব, নিছক কোন শখ বা পেশা নয়। এরপর আর তাঁকে সম্ভবত বিচলিত হতে হয়নি, তিনি এগিয়ে চলেছেন বাধাহীন খরস্রোতা নদীর মতো। তাঁর দ্বিতীয় গানের বই বের হয় "ঝংকার" নামে। জানি না এটিও কারো সংগ্রহে আছে কিনা।

মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গের মত। মনটা ভালো থাকলে আর প্রাণবন্ত পরিবেশ পেলে তিনি উচ্ছলতায় হারিয়ে যেতেন। পাখির মতো যেন ডানা মেলতেন। প্রাণ খুলে হাসতেন, রসিকতা করতেন। আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম কুয়াকাটার কাছে আমার বাড়িতে বেড়াতে যেতে। শিল্পী রাশিদুল হাসান তপনকে (যিনি বর্তমানে কানাডা প্রবাসী) নিয়ে মল্লিক ভাই আমার গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। সাগরপাড়ের গ্রামের ছোটবালিয়াতলী গ্রামটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন। তিনি পাখির মতো উড়ে বেরিয়েছেন। ছুটে গেছেন ধানক্ষেতের প্রান্তসীমায় ছোট্ট খালের পাড়ে। সেখানে বসে গান গেয়েছেন; কবিতার পংক্তি আওড়িয়েছেন। আরো কত কী! কিছুদিন পড়ে আমি বিয়ে করলাম পাশের গাঁয়ে। মল্লিক ভাই জানতেন আমি আমার জায়ার প্রতি প্রেম-ভালবাসায় কতটা কাতর। একদিন বললাম, আমি তো ভালো কবিতা লিখতে পারি না; আপনি আমার বউয়ের জন্য আমার হয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখে দিন না। সেদিনই অতি চমৎকার একটা প্রেমের কবিতা লিখে দিলেন। সে কবিতাটি আমার স্ত্রী সযত্নে ত্রিশটি বছর পাহারা দিয়েছে। বার বার পড়েছে। তিনি জানেন কবিতাটি মল্লিক ভাইয়েরই রচনা। আমি সেটিকে নিজের বলে চালিয়ে দেইনি। তবে আমার হৃদয়ের গভীরের অনুভূতিগুলো তিনি এত নিখুঁতভাবে কীভাবে তুলে এনেছেন তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। মল্লিক প্রতিভার এক দুর্লভ প্রকাশ ছিল ঐ কবিতাটি। কবিতাটি নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

তুমি

একটি নমনীয় যন্ত্রণা অথবা
একটি কোমল বিরহের নাম তুমি
না-
বরং একটি সর্বভুক ভালোবাসার অক্টোপাস
বিশাল সমুদ্র গর্ভে আমি এখন
কেমন যেন সসীম হয়ে আছি।।
সব রকমের শব্দ এবং সঙ্গীত
আজকে কেবল নতজানু তোমার শব্দমালার কাছে
না হয় নরম আহ্বানের কাছে
একবার বাংলাদেশের প্রান্তদেশে
একটি বদ্বীপ দেখে
সৌন্দর্যবোধ আমার মধ্যে
প্রচন্ড ক্ষুধার মতো মনে হয়েছিল
এখন তুমি আমার নাফ নদীর ক্ষুধার মতো
যেমন টেকনাফে সুনীল সীমাহীনতা।।

আমি যখন ছাত্র থাকি
কেবল তোমার দৃষ্টিগুলোই তখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
অক্ষরের পর অক্ষর
হাত যখন একটির পর একটি বই খোঁজে;
তখন তোমার হাত বদলের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াই
(শুধু তোমার সুনীল চিঠিগুলোই
হাইলের মত আমার পেছনে আছে)
আমি এবং তুমি
এই ধরনের যুক্ত অক্ষর আছে বলেই
ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে একটি নিরন্তর ইতিহাস
একটি চাঁদ আর একটি সূর্য যেমন
প্রতিদিন সর্বোত্তম উপমা
আগে খুব বেশি বুক কাঁপতো না
যেমন আজকাল কাঁপে
বুকের এই ঢিপ ঢিপ শব্দের মধ্যে
কেবল তোমারই অরম্ভদ উচ্চারণ নাকি
এ এক ধরনের শঙ্কিত ভালোবাসা
না একাকীত্বের সময় না কাটার
ধারালো চাবুক।।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক মূলত একজন বিপ্লবী ও প্রতিবাদী কবি। তিনি সেই প্রত্যাদিষ্ট আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন আমরণ সোচ্চার। তাঁর প্রায় প্রতিটি গান ও কবিতার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। "দাও খোদা দাও হেথায় পুর্ণ ইসলামী সমাজ" তাঁর প্রত্যাশার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনে যে সকল অনাচার ও অসত্যের সয়লাব তিনি দেখেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল খরস্রোতা নদীর মতো; যার মাধ্যমে তিনি কালিমাকে ধুয়েমুছে সাফ করতে চেয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এক বিপ্লবের। "নিষণ্ন পাখির নীড়ে" কাব্যগ্রন্থে তিনি 'অভিশপ্ত অসুন্দরের প্রতি' কবিতায় লিখেন:

অভিশপ্ত অসুন্দর
তোমার সমস্ত ভয়ঙ্কর থেকে
আমার হৃদয়কে, আমার ঘরকে, আমার স্বদেশকে
রেহাই দাও
অথবা তুমি
ফিরে যাও তোমার বীভৎস উৎসের কুৎসিত ভেতরে।

আবার একই কাব্যগ্রন্থের 'তুমি কি এখন' কবিতায় তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে–

হতাশ হয় না জিহাদের জঙ্গীরা
হতাশ হয় না কোনো খাঁটি বিপ্লবী
হতাশ হয় না শহীদের সঙ্গীরা
বুকে নিয়ে ফেরে ঈমানের দুন্দুভী
.....
তোমার সামনে তিতুমীর আছে
আছেতো খানজাহান
হাজী শরীয়ত আছে আরো কাছে
আছে শাহজালাল অম্লান
.....
বখতিয়ারের ঘোড়ার শব্দ ঐ
লোকালয়ে যেনো অবিকল শোনা যায়
তাই কি আমিও দুই কান পেতে রই
সতেরো সওয়ার কবে আসবে দরজায়
.....
তবে তুমি ছুটে চলো বেগে আরো বেগে
বন্যার মত দুরন্ত দুর্বার
চলো তাকবীর জোরে আরো জোরে হেঁকে
পড়ে থাক পিছে পচা লাশ মুর্দার।

www.pathagar.com

মল্লিকের কবিতায় ইতিহাস চেতনাও অত্যন্ত প্রখর; একই সাথে স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য তাঁর লেখার অন্যতম উপজীব্য। বাগেরহাটের সন্তান মতিউর রহমান মল্লিকের রক্তে যেমন তিতুমীর, খানজাহান আলীর সংগ্রামী ধারা প্রবহমান তেমনি হাজী শরীয়তউল্লাহ আর হযরত শাহজালালের বিপ্লবী চেতনাও বহমান ছিল। তিনি একটি সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, আর সে স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সহজেই সনাক্ত করতে পারতেন। সামাজিক সমস্যা ও রাজনীতির জটিল বিষয়গুলো নিয়েও তিনি ভেবেছেন। তিনি লিখেছেন-

মীর জাফরের পদভারে দেশ
জর্জরিত;
ক্লাইভ এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া
সব জড়িত
বাংলাদেশের সর্বনাশের
পেছনে আজও; জগৎ শেঠেরা হয়নিতো শেষ:
তাদের কাজও।

স্বাধীনতার চেতনায় মল্লিক ছিলেন উজ্জীবিত। স্বাধীনতা যাতে বিপন্ন না হয় সেজন্যে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। তিনি লিখেছেন-

সীমান্তে কাড়ি প্রতিদিন বিডিআর
সাধারণ লোক? তাও গাড়ি বর্ডারে
কৃষক-মজুর-গ্রাম্য নির্বিচারে।
গাড়বো না কেনো?
কেনো গাড়বো না?
ঐ খুশি করতে কেন পারবো না?
পারবো না কেন?
পাকওয়ালাদের বারোটা বাজিয়ে
হানাদারদের পাজরে ঘা দিয়ে
এইতো সেদিন তোমাদের হাতে
দিয়েছি যে তুলে পতাকা স্বাধীনতার!

মল্লিক ছিলেন একজন মানবতাবাদী কবি। মানুষের দু:খ-কষ্টে তিনি দারুণভাবে বিগলিত হতেন। তিনি দরদ দিয়ে বিপন্ন মানুষের জন্য গান গাইতেন, কবিতা লিখতেন। দু'হাজার সাত সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী সিডর আঘাত হানলে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি লিখেন–

সিডর দিয়েছ ডর
বিপন্ন অন্তর
সিডর দিয়েছে স্বজন-হারানো গুমরিত প্রান্তর
দিয়েছে করুণ মৃত্যুর হাহাকার
দিয়ে গেছে খুলে ভয়াল সিডর
বেদনায় যত অশ্রুসিক্ত দ্বার
আর দিয়ে গেছে বুকফাটা চিৎকার
ধস্ত বিরান বিবর্ণ সংসার।

www.pathagar.com

মল্লিক ছিলেন একজন নিভৃত দরবেশ। মহান আল্লাহর দরবারে যিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন সব কিছু উজাড় করে। মহামহিমের সৌন্দর্যের পিপাসায় তিনি ছিলেন কাতর। আমরা তার দরাজ কণ্ঠে শুনতে পাই "তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর তা হলে না জানি তুমি কত সুন্দর"। নবী প্রেমে মল্লিকের গান এক অপরূপ সৃষ্টি। "বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসুল" -এত সুন্দর অভিব্যক্তি একমাত্র নজরুলের সাথেই তুলনীয়।

মল্লিকের এক একটি গান ও এক একটি কবিতা যেন স্বকীয়তায় জ্বল জ্বল করে। তাঁর এসব সৃষ্টি দীর্ঘকাল মানুষের মাঝে টিকে থাকবে। একজন মানুষ যিনি একাধারে কবিতা ও গান লিখেন, গানের সুর দেন, নিজেই গানের শিল্পী; আবার নিজেই শিল্প-সংস্কৃতির সংগঠক ও নেতা। অপরদিকে তিনি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। এরূপ একজন বহুমুখী প্রতিভার দারুণ অভাব জাতি দীর্ঘকাল অনুভব করবে। তিনি মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন এবং তা যথেষ্ট গতি লাভ করেছে। সারাদেশে এমনকি দেশের বাইরেও তার আন্দোলেনের ঢেউ ছড়িয়ে গেছে। আমি নিজে দেখেছি আমেরিকার হাইওয়েতে অথবা আরবের মরুভূমির বুক চিড়ে চলন্ত গাড়িতে মল্লিকের গানের সিডি বাজছে। মল্লিকের গানের ভক্তরা এমনিভাবে ছড়িয়ে আছে দুনিয়ার সর্বত্র।

মল্লিকের এই অবিস্মরণীয় প্রতিভা বাংলাদেশে সত্যিই বিরল। নানাবিধ অসঙ্গতিতে ভরা আমাদের সমাজে সত্য ও সুন্দর যেন উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও এক ধরনের সিন্ডিকেট রয়েছে যারা পারস্পরিক পিঠ চুলকানির চর্চা করেন। এখানে মুখচেনা একশ্রেণীর ইহজাগতিক কবি-সাহিত্যিকদের জন্য উপরে উঠার সহজ সিঁড়ি রয়েছে। পক্ষান্তরে আল মাহমুদের মতো কালজয়ী কবিরাও হন অপাঙক্তেয়। মতিউর রহমান মল্লিকের মত প্রতিভা যদি ইহলৌকিকতার পথে হাঁটতেন তাহলে প্রচারিত প্রচারযন্ত্র তাকে কোথায় টেনে তুলতো ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই।

লেখক : সাবেক সচিব, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক।

www.pathagar.com

মৃত্যু তাকে আড়াল করেছে কেড়ে নেয়নি

মাসুদ মজুমদার

মতিউর রহমান মল্লিক। তার কোন পরিচয়টি মুখ্য, কবি ও গীতিকার না শিল্পী। তাকে একেবারে কাছে থেকে দেখার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তিনি স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন এবং বন্ধু। সবকিছুর উর্ধ্বে আমার অনুজপ্রতিম ভাই। প্রথম তাকে যে দিন দেখলাম-সে দিনই তার ভেতর অফুরন্ত সম্ভাবনার এক ভিন্ন চরিত্রের মানুষের সন্ধান পেলাম। তিনি ভালো গাইতেন। তার গায়কী নিয়ে অনেকেই ভাবতেন। আপ্লুত হতেন। উপভোগ করতেন। প্রশংসাও করতেন। আমি এসব নিয়ে ভাবতাম না, তার ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রতিভা ও চৈতন্যবোধটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করতাম। একবার বলেছিলেন, তাকে অনেকেই বুঝতে চান না। এ নিয়ে তার অভিমানের অন্ত ছিল না। তার ধারণা ছিল তাকে যে ক'জন বোঝে এবং জানে তার ভেতর আমিও একজন। তাই কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করতেন। মনের কথা বলতেন। দুঃখ-কষ্ট, সুখ ও স্বপ্নগুলো শেয়ার করতেন। অনেক কষ্ট সযতনে লালন করার মতো মানুষ ছিলেন। তবে নরম মনের এ মানুষটি দুঃখমানব ছিলেন না। ছিলেন আসর মাতানো সুখসারী। নিজের কথা দ্বিধাহীনভাবে বলতে না পারাটা অনেকে দোষ ভাবতেন। আমার কাছে এটাই ছিল তার বড় গুণ। লাজুক প্রকৃতির মানুষ নিজের ব্যাপারে কখনো অকপট হন না। মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সত্যিকার অর্থে লাজুক। এ লজ্জার আবরণে তিনি নিজেকে ও প্রদর্শনেচ্ছাকে লুকাতেন। নিজের প্রতিভা আড়াল করতেন। এমন আচরণটাও ছিল তার গুণ। কারণ তিনি চাইতেন নিভৃতে বসে ধ্যানী হতে। কাব্য চর্চার ভেতর নিজের মতো করে ডুবে যেতে। কিছুদিন দু'জন একরুমে থাকতাম। অনেকেই ভাবতেন তিনি আপনভোলা। খেয়ালি মানুষ। আপন ভুবনে ডুবে থাকতে অভ্যস্ত। আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। প্রচণ্ড জেদ এবং অভিমান তাকে সতত তাড়া করত। তার জেদের ভাষা বুঝতাম। এই জেদ বদমেজাজের বিষয় ছিল না। মিথ্যা, অসততা, অস্বচ্ছতা ও পরচর্চা থেকে মুক্ত থাকতে এই জেদকে তিনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন। কোনো মানুষের কথা ও কাজ অপছন্দ হলে তাকে এড়িয়ে চলার জন্য তার এই জেদ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর লাজুক স্বভাবের অভিমানমাখা চেহারাটা ছিল তার স্বাভাবিকতার প্রকাশ। স্বজন-প্রিয়জনদের মাঝে তার প্রাণচঞ্চল স্বভাবটার আসল ও স্বকীয় রূপের প্রকাশ ঘটত। রসিক প্রকৃতি তার মাঝে সহাবস্থান করত। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে তার অভ্যস্ততা ছিল ঈর্ষণীয়। তবে বাগেরহাটের আঞ্চলিক ভাষায় তার স্বাচ্ছন্দ্য কম ছিল না।

তার ভেতর কবিতা, গান ও গল্পরা বাসা বেঁধেছিলো। যেমন ঠাঁই নিয়েছিলো কাব্য সুন্দর। গান তাকে মাতাল করত। স্বভাবজাত কবি প্রতিভা তাকে মগ্ন করে রাখত। মাঝে মধ্যে দেখতাম ছন্দ এবং শব্দ দিয়ে খেলা করতে। সত্য বলা এবং সত্যের বলয় সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

রাখতেই তার আগ্রহ ছিল বেশি। বিনয় দিয়ে প্রতিকূলতা জয় করার এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তার ভেতর বিরাজ করত। বিনয় এবং পরিমিতিবোধ তাকে এতটাই ঘিরে রাখত, মাঝেমধ্যে মনে হতো তিনি যেন বিনয়ের কারিগর। তার বিনয়ী আচরণ এবং হাসিমাখা মুখে কথা বলার ধরন তন্ময় হয়ে দেখতাম। তার এ বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অসাধারণ লাগত। আরো অসাধারণ লাগত তার কুরআন তেলাওয়াতের অপূর্ব ভঙ্গি এবং কণ্ঠের স্বাতন্ত্র্য। অনেক ফোরামে একসাথে কাজ করেছি। অসুখটা খামছে ধরার আগ প্রর্যন্ত তাকে কর্মপাগল সতত তৎপরই পেয়েছি। অনেকের জীবনবোধের বৈপরীত্য এবং বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক জীবনযাপনের প্রতি তার ঘৃণার প্রচণ্ডতা বহুবার দেখেছি। কাউকে পছন্দ না হলে এড়াতেন। ভালো লাগলে সান্নিধ্য খুঁজতেন।

আমানত রক্ষায় মল্লিক ভাই ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রতিশ্রুতি পালনে সতর্ক মানুষটির রুটিন পাল্টে যেত। সময় মেপে ঘড়ি ধরে চলতে তার কষ্ট হতো। নিজের মতো করে একটি রুটিন সাজিয়ে চলতে পারাটা যেন তার স্বভাবেরই অংশ ছিল। তাকে কখনও ভোজনবিলাসী হিসেবে পাইনি। স্বল্প আহার বলতে যা বোঝায় সেটাই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক। একবার কবির গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অভিমান করে ঢাকা ছেড়েছিলেন। বেশি খবরদারি তাতে সইত না। অনেকটা আমাদের আগোচরে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন। এক পড়ন্ত বিকেলে তার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বকুলতলায় চাটাই বিছিয়ে ঘুমোচ্ছেন-সম্ভবত সময়টা ছিল বসন্তকাল। কবিদের বাড়ির ভেতর পুকুর পাড়ে ছিল গাছভর্তি সফেদা ফল। এভাবে অসময়ে তার বাড়িতে আমাকে দেখে চমকে গেলেন। জড়িয়ে ধরে সেই যে আবেগ ঝরালেন- ভোলার নয়। কয়েক দফা তাকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। শেষবার হাসপাতালে দেখতে গিয়ে কান্না থামাতে পারিনি। অনেক কথা বলতে চাইলেন- থামালাম। একটা উল্লেখ্যযোগ্য সময় ধরে আমি ছিলাম তার অবিভাবক। হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই অবিভাবকত্ব ফলাতে হয়েছিল। তার তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য চর্চার সাথেই ছিলাম। আমার প্রতি ভরসা ছিল, বিশ্বাস ছিল। প্রায়ই 'গুরু' বলে বোকা বানাতেন। বলতাম গরুই তো থেকে গেলাম। মানুষ হতে পারলাম কই। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমতায় আমরা ছিলাম বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আরশের প্রভুর সামনে আমার সাক্ষ্য হবে মল্লিক ছিলেন কবিপ্রাণ। বিশ্বাসের ঝাণ্ডা উঁচু রাখতে তার জীবন ছিল উৎসর্গিত। মৃত্যু তাকে আমাদের সান্নিধ্য থেকে আড়াল করেছে, তার অবদান কেড়ে নেয়নি।

কবি আমাদের মাঝে নেই। তার শূন্যতা চোখে পরার মতো। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির বিষয়। তার অবস্থান থেকে তিনি প্রচুর দিয়েছেন। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অন্যতম অনুপম বৈশিষ্ট্য এই বিশ্বে সব মানুষ গুরুত্বপূর্ণ, কেউ অপরিহার্য নন। তবে কোনো কোনো মানুষ অবদানের জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকেন। কবি মতিউর রহমান আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে একটা ঐতিহাসিক ধারা সৃষ্টির অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। বহমান এ ধারায় তিনি তার সময়কে জয় করার চেষ্টা করেছেন। তার সাফল্যগুলো এখন আরো বাঙময় হয়ে ধরা দিবে। তার ভেতরই একজন জাতশিল্পীকে খুঁজে নেয়ার দায়, নতুন প্রজন্মের ওপরই বর্তায়।

লেখক : সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর, দৈনিক নয়াদিগন্ত।

www.pathagar.com

মল্লিক আছেন, এদেশের গ্রাম বাংলার কৃষক কৃষানীদের ঐশ্বরিক চেতনায়, প্রার্থনায়

আবদুল হাই শিকদার

তার সাথে আমার বন্ধন সেই অনেক দিনের। কত সভা- সেমিনার একসাথে কাটালাম। গীতিকবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রস্তান শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের জন্য অপূরনীয় ক্ষতিই নয়, বরং সঙ্গিত অঙ্গনেও সৃষ্টি হয়েছে, অপূরনীয় শূন্যতা। যে কোন দেশ ও জাতির ভাগ্যে হঠাৎ করে মল্লিকরা জন্মান না, মল্লিকদের জন্ম হয়, কয়েক শতাব্দী পরে। তারা আসেন, পৃথিবীকে নতুন কিছু দেন। তাদের ব্যাপ্তিময় কর্মযজ্ঞে প্রান ফিরে পায়, পৃথিবী। তারা হয়ে ওঠেন, প্রাণ পুরুষ। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীজুড়ে মহত্তম কর্মযজ্ঞ সাধনের মধ্য দিয়ে, কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে সৌর্য, বৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের নান্দনিক উপস্থাপনার পাশাপাশি তারা বৈশ্বিক হয়ে ওঠেন। বিশ্বমন্ডলে তারা প্রসারিত করেন তাদের সৃষ্টিশীল হাত। তবে এসব সৃষ্টিশীল মানুষদের কাতারে একেবারে ব্যাতিক্রমী এক সত্তার নাম, কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্যে চলে আসা দুটি ধারার একটি হলো,রবীন্দ্র চেতনা বা রাবীন্দ্রিক ধারা। আর অন্যটি সংঘবাদী সাহিহ্যের ধারা। উপমহাদেশর মুসলমানদের মাঝে এ ধারাটির সূচনা করেছিলেন, সওগাত সম্পাদক মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন। সওগাতকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে পূর্ব বঙ্গেও একটি ধারা প্রবাহিত হয়। মুহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পথ ধরে হাটেন, সিকান্দার আবু জাফর; তিনি তার পত্রিকা সমকালকে ঘিরে একটি সাহিত্য বলয় ঘরে তোলেন। এভাবে এক এক করে সংঘবদ্ধ সাহিত্যের ধারায় উঠে আসে আবদুল্লাহ আবু সাইদের নাম। আর এ সংঘবদ্ধ ধারার সর্বশেষ প্রান্ত এবং উজ্জলতম প্রতীকের নাম, মতিউর রহমান মল্লিক।

মল্লিককে সংঘবাদী সাহিত্যিক বললে কম বলা হবে। কারন এর আগে যারাই সংঘবদ্ধ সাহিত্য চর্চার ধারায় ছিলেন, তারা সকলেই ব্যাক্তি স্বাতন্দ্রবাদের মধ্যে ঘোরপাক খেয়েছেন। এ গন্ডি থেকে বেরিয়ে সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মকে সর্ববাদী করে তুলেছিলেন, মল্লিক।

বাংলা সাহিত্যে হামদ ও নাতের কথা বললে নজরুল, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ এবং আজিজুর রহমানের নাম স্মরণ করলে, এক্ষেত্রে মল্লিকের নাম উচ্চারনও অনস্বীকার্য। নজরুলের পরে, তার মত ব্যাপ্তিময় ইসলামী সঙ্গিত সাধনা আর কে করেছে? তিনি আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার সাথে সাথে হামদ নাতে যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অবাক করার মতো।

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি, সেখানে আদর্শবাদী সাহিত্যের জন্য তাদের কবি সাহিত্যকরা কত সেক্রিফাইস করেছেন। লাতিন লেখক মাইকোভস্কি

www.pathagar.com

আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন, আদর্শবাদীতার জন্য, অন্যদিকে সাহিত্যের পরতে পরতে আদর্শবাদীতা প্রচারে কী না করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি! আদর্শবাদীতার কারনেই তাদের সাহিত্যকর্ম সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। এমনকী বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছেন, কেউ কেউ।

এক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের দিকে তাকালেও দেখতে পাই, সত্তুর দশকের শেষ দিকে মল্লিক তার ব্যাপ্তিময় কর্মযজ্ঞ নিয়ে সাহিত্যের পথে পা বাড়ালেও আদর্শবাদী পথে হাটায় মূল সাহিত্য ধারায় অনেকাংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, কবি মল্লিক। সার্বজনীনতায় মল্লিকেরও ক্ষতি হয়েছে। আদর্শবাদ ও বিশেষ রাজনৈতিক পরিচয়ে মল্লিক যেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ঠিক তেমনি তার আদর্শিক বলয়ে সবচেয়ে প্রতাপশালী কবি হয়ে উঠেছেন, কবি মল্লিক।

এ দেশের সাহিত্য আকাশে আদর্শবাদ ও বিশেষ রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে এনে যদি মল্লিককে সার্বজনীন করে তোলা যায়, যদি মল্লিককে বাংলাদেশের অপরিহার্য এক নামে পরিচয় করানো যায়, তবেই সফল তার সৃষ্টিকর্ম এবং তার আদর্শবাদী চেতনা। এ কাজটি তার ভক্ত এবং অনুসারীদেরই করতে হবে। তারা তো তাদের আদর্শের কাছে আপোস করেনি। বাংলা সাহিত্যে যখন কবিতার ইতিহাস লেখা হবে, তখন গোলাম কুদ্দুস, হাসান হাফিজুর রহমান, ফখরুখ আহমদ, ষাটের দশকের আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ আর সত্তুর দশকের আমিসহ অন্য কবিদের কাতারে মল্লিককে বাদ দেয়ার কোন উপায় নেই। কারন মল্লিকের বাইরেও যদি আমরা ভিন্ন আদর্শবাদী চেতনা ও বিশেষ রাজনৈতিক বলয়ের কবিদের কথা চিন্তা করি, তবে প্রথমে দুটি নাম উঠে আসবে, সুভাস মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য। সুভাস ও সুকান্ত ছাড়া যেভাবে বাংলা কবিতার ইতিহাস লেখা সম্ভব না, ঠিক তেমনি মল্লিক ছাড়া সমকালীন বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাসও পূর্ন হবে না। কেউ তাকে গ্রহন করুক আর না করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। প্রথমদিকে প্রকৃতিপ্রেমী নান্দনিক কবি জীবনানন্দ দাশকে অনেকেই গ্রহন করেন নি। অনেকেই মল্লিককে না পড়ে, না জেনে তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, এটা ঠিক না। আমাদের এই সো-কলড রাজনৈতিক বলয় মল্লিককে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করতে চাইলেও এটা কখনোই সম্ভব না। মল্লিক আছেন, এদেশের মাটির টানে, প্রানের সুরে, গ্রাম বাংলার কৃষক কৃষানীদের ঐশ্বরিক চেতনায়, প্রার্থনায়। যখন একদিন সকাল আসবে, নতুন করে শিশুসূর্য উঠবে, সো কলড রাজনৈতিক বলয় ধ্বংস হবে। তখন সব আধার ছিন্ন করে একদিন ঠিকই বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্ফুটিত হবে কবি মল্লিকের সৌরভ।

লেখক: বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক
সহকারী সম্পাদক- দৈনিক আমার দেশ।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের নিপুণ রূপকার

আবদুল হালীম খাঁ

এক

কবি মতিউর রহমান মল্লিক কবিতা ও গানে যে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন তা সহজে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টির গুণগত মান অনেক উর্ধ্বে। আমরা এখনো তাঁর বিশাল অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারিনি। এখনো অনেকে মাকড়শার মতো নিজের তৈরি জালের ভেতর দৃষ্টি আবদ্ধ করে রেখেছেন। জালের বাইরে অসীম জগতের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পাচ্ছেন না। কিন্তু এখন সময় এসেছে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে চোখ মুছে উপরের দিকে তাকাবার, দৃষ্টি সম্প্রসারিত করার।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ উপাত্ত করে যে কাব্য তৈরি করেছেন, সেই মতাদর্শের লোক তখন এ দেশে কতজন ছিল? এবং এখনই বা কতজন আছেন! মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুসারী তাঁর কবিতা মূল্যায়ন করে তাঁকে উচ্চে তুলে ধরেছেন, তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে। আর জীবনানন্দ দাস! এখন তো তাঁদের নামে এদেশের কবি সাহিত্যিকগণ অজ্ঞান।

কবি মতিউর রহমানের কবিতা ও গান কী সাহিত্য মানে তাঁদের চেয়ে কম? মোটেই কম নয়। বরং তাদের চেয়ে কয়েক ধাপ উপরে! তা হলে তিনি উপেক্ষিত ও অবহেলিত থাকবেন কেন? থাকলে সেটা আমাদেরই মানসিক দুর্বলতা ও হীনতা। আমাদের এ সময়ে মল্লিকের চেয়ে অথবা তাঁর মতো অগ্রসর আর কয়জন আছেন? মল্লিকের কাব্য সাহিত্য ও সংগীতে যে আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে সে তো এদেশ ও জাতির প্রাণের কথা, একান্ত হৃদয়ের বিশ্বাস এবং স্বপ্ন। কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম ও বেনজীর আহমদ বিপ্লবী-বিদ্রোহী ছিলেন,তাঁদের বিপ্লব-বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে, মূলত এদেশের স্বাধীনতার জন্য। মতিউর রহমান মল্লিকও একজন বিপ্লবী-বিদ্রোহী কবি। তাঁর বিপ্লব-বিদ্রোহ অন্যায়, অনাচার, অবিচার, মিথ্যা, বাতিল, জোর-জুলুম-নির্যাতন, অন্ধবিশ্বাস ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। তাঁর বিপ্লবী কবিতা সত্য, ন্যায়, হক, সুন্দর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এদেশের নব্বই ভাগ মানুষের ঈমান আকিদা বিশ্বাস ও স্বপ্ন সাধ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক চারণের মতো-একাই তাঁর বিপ্লবী বাণী কবিতা ও গানে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর বন্দর থেকে শুরু করে আটষট্টি হাজার গ্রামের মাঠে-ঘাটে, সভা-মাহফিলে, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মুখে মুখে তাঁর গান গাওয়া হচ্ছে-কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছে। প্রতিটি

www.pathagar.com

ইসলামী সভা-জলসায় মল্লিকের গান বাজে। তাঁর গান ছাড়া সভা জমে না, বক্তার বক্তৃতায় জোস আসে না। রমজানের সেহেরি ও ফজরের আযানের আগে ও পরে মল্লিকের গান গেয়ে জনতার ঘুম ভাঙ্গানো হয়। শুধু বাংলাদেশই নয়, বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের অনেক দেশে তাঁর গান পৌঁছে গেছে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক এখন অসাধারণ উজ্জ্বল একটি নাম। অশেষ ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ একটি নাম এবং গৌরবময় একটি নাম। এ নাম নিয়ে আমরা নির্দ্বিধায় গর্ব করতে পারি।

একবার একজন মাসিক পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে কাব্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সময় সম্পাদক সাহেব প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা বলুন তো বাংলাদেশে যদি ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যায়-ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন এদেশের সভা-মাহফিলে কোন কবির কবিতা আবৃত্তি করা হবে, কোন কবির গান গাওয়া হবে? বর্তমানে যে সকল কবির প্রশংসা গীতি আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে তাঁদের কয়টা কবিতা এমন আছে? হঠাৎ করেই আমি উত্তর দিয়েছিলাম-অন্তত একজন তো আমাদের আছেন আর তিনি আমাদের মল্লিক ভাই। কাজী নজরুল ইসলামের পরে আমাদের একমাত্র গর্বের সম্বল-সম্পদ।

মতিউর রহমান মল্লিক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন সংগঠক, বাগ্মী, অনুবাদক, ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক এবং সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যের এক সাহসী সংগ্রামী সেনাপতি। বাংলাদেশে ইসলামী গানের প্রচলন, প্রচার-প্রসার এবং এটাকে দেশের অলিতে গলিতে জনমানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের তুলনা হয় না। এ ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃত। তাঁর অক্লান্ত শ্রম ত্যাগ সাধনা ও নিষ্ঠার কথা ভাবলে সত্যি অবাক লাগে। সমুদ্রের জোয়ারের মতো কী বিশাল আবেগে উত্থিত ও উত্তাল হয়ে উঠেছিলেন তিনি গান রচনায়। কত বড় মহত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর ! কত বিপুল পরিমাণ মহত স্বপ্ন ছিল তাঁর! তিনি রচনা করেছেন এবং স্বকণ্ঠে গেয়েছেন :

আমার কণ্ঠে এমন সুধা
দাও ঢেলে দাও হে পরওয়ার
যা পিয়ে এই ঘুমন্ত জাত
ভাঙ্গে যেন রুদ্ধ দুয়ার।

আমার গানের পরশ পেয়ে
অশ্রু ধারায় ওঠে নেয়ে
শাহাদাতের ভাগ্য চেয়ে
জীবন জুড়ে আনে জোয়ার।

আমার গানের সুরে প্রভু
দিও দিও অগ্নিধারা
দ্বীন কায়েমের চির সবুজ
অনুভূতি পাগল পারা
আল কোরানের আয়াত দিয়ে
তৌহিদেরই শরাব পিয়ে

www.pathagar.com

হেরার পথের রোশনী নিয়ে,
পার হয়ে যায় দূর পারাবার!!

মতিউর রহমান মল্লিকের যে গান, সে গান তো একজন মুমিন মুসলমানের দিনরাতের তসবিহ পাঠ-জপমালা। তাঁর গান তো একজন চিন্তাশীল হৃদয়বান পাখির গানে ফুলের শোভা ও ঘ্রাণে নদীর কলতানের মধ্যে মহান স্রষ্টাকে যেভাবে অনুভব করেন তারই প্রকাশ, সুপ্ত প্রাণকে যেভাবে জাগিয়ে তোলে, গভীর ভাবে-ধ্যানে অভিভূত করে স্রষ্টার সেই মহিমার প্রকাশ :

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
নেই কেহ আল্লাহ ছাড়া।

পাখির গানে গানে
হাওয়ার তানে তানে
ঐ নামেরই পাই মহিমা
হলে আপন হারা।

ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে
অলির গুঞ্জরণে
ঐ নামেরই গান শুনে মন
দেয় যে নিরব সাড়া।

নদীর কলকলে
ঢেউয়ের ছলছলে
ঐ নামেরই সুর শোনা যায়
হলে আপন হারা।

মল্লিকের গানে মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। মুসলমানতো দুর্বল ভীরু কাপুরুষ নয়। মুসলমানতো নিরবে জালিমের নির্যাতন সহ্য করতে পারে না। মুসলমানরা হলো দুনিয়ার সকল জাতির শাসক এবং পথ প্রদর্শক।

মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি
আমি চির রণবীর
আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না
নারায়ে তাকবীর।
বিপ্লবী আমি চির সৈনিক
চির দুর্জয় চির নির্ভীক
আল কোরানের শামশির আমি
কুটি কুটি করি রাতের ভীড়-
নারায়ে তাকবীর।
কে সে কহে আমি ভেসে গেছি আজ
মিথ্যার সয়লাবে

www.pathagar.com

শক্তি আমার দেখিও আবার
বাজবে দামামা যবে–

আল্লার আমি শক্তি অসীম
আলী হায়দার ইবনে কাশিম
সারা দুনিয়ার সরদার আমি
চির উন্নত উচ্চ শির,

মুসলিম জাগে কারবালা শেষে
কঠিন শপথ করে
লাখো শহীদের কলিজার দামে
নতুন পৃথিবী গড়ে

সেই মুসলিম চির উদ্দাম
তাই তো বজ্র শপথ নিলাম
আল্লার রাজ গড়বো এবার
চির শান্তির সুখের নীড়-
নারায়ে তাকবীর।

তথাকথিত নাস্তিক কবিদের মাতাল প্রলাপের বিপরীতে মল্লিকের কবিতা গান পরম প্রভুর কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে। পাঠক শ্রোতার হৃদয়ে আনে আলোর বান, পবিত্র পরশে ছুঁয়ে যায় মনপ্রাণ। তাঁর অসংখ্য সংগীত মানব জাতির জন্য আল্লাহর সুন্দরতম আদর্শ রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাণে নিবেদিত। শুধু তাই নয়, বর্তমান ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শোষিত বঞ্চিত মজলুম মানবতার কান্নায় যখন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই তিনি আমাদের ডাক দিয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদার সুখী সমৃদ্ধ শান্তির সমাজ গড়তে। তরুণ যুবকদের প্রতি তাঁর নি:শংক আহ্বান–

কে আছিস বীর আয় ছুটে আয়
খোদার পথে জীবন বিলাই
কারবালার এই প্রান্তরে ফের
বালাকোটের এই মাঠে ফের
তৌহিদেরই নিশান উড়াই।
ভীরুর তরে নয়কো কোরান
খোদার দেয়া জীবন বিধান
আল ফেসানী বেরলভী আর
তিতুর মতো বিপ্লবী চাই।

সব মতবাদ দুপায় দলে
কাবার পথে আয়রে চলে
বজ্র সাহস বক্ষে বেঁধে
রাশেদার যুগ যাই গড়ে যাই।

www.pathagar.com

মল্লিকের এমনি জাগরণ মূলক অনেক গান রয়েছে। আরেকটি গান বহু কণ্ঠে গীত হয়। শ্রোতা নন্দিত গানটির প্রথম কলি: 'দাও খোদা দাও। হেথায় পুর্ণ ইসলামী সমাজ.....'। 'তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর, না জানি তা হলে তুমি কত সুন্দর' এ গানটি সবার কণ্ঠে কণ্ঠে শোনা যায়। এই লাইন দুটি চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় তাঁর রচনা কতটুকু হৃদয়স্পর্শী, কতটুকু জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি মতিউর রহমান মল্লিক কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে রচনা করেছেন বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা-গান। 'বহতা সময়' এ সময়েরই রচিত একটি গান। অপ্রকাশিত এ গানটিতে তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত জীবন-দর্শন প্রস্ফুটিত হয়েছে। মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত 'মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া' সেপ্টেম্বর-২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি নোয়খালীর 'হিল্লোল' শিল্পী গোষ্ঠী হতে সংগৃহীত–

সময় বয়ে যায়-নদীর স্রোতের মতো
কিছু কথা কয়ে যায়-রেখে যায় স্মৃতি
হাসি-কাঁন্নার অবিরত!!
ঘড়ির কাঁটার সাথে
সময়ের কাঁটা বাঁধা আছে বলে মনে হয়
ঘড়ির কাঁটা থামেও যদি
থামে না বহতা সময়
শুধু তার হাত ধরে ছুটে চলা-দিগন্তে বেলা ক্ষয়ে যায়!!
নদীর স্রোতের মতো-সময় তো বয়ে বয়ে যায়।
অনন্ত মহাকালে একা পথ চলা
অথৈ সাগর তীরে, বেদনার গান গাওয়া
জীবন কলস ভাসে
কালের কপোল তলে প্রত্যয় নিয়ে অবিরাম
দিনের ক্লান্তি শেষে
খোঁজে না তো কোনো বিশ্রাম
শুধু ধৈর্যের পথুরিয়া গান গাওয়া-অবিকল সুরে বেঁজে যায়
নদীর স্রোতের মতো-সময় তো বয়ে বয়ে যায়!!

কবি গীতিকার ও সুরকার মতিউর রহমান মল্লিক মূলত ইসলাম কায়েম করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিলেন। ইসলামী গানের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ছাপ্পান্নো হাজার বর্গ মাইল তিনি চারণের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলাদেশে ইসলামী সংগীত ও সংস্কৃতির বিকাশে মতিউর রহমান মল্লিকের ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দুই

কবির মনোভূমির অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান তার মনন চৈতন্যের সহযোগ-সমন্বয়ে রূপান্তরিত কাব্য শিল্পে। যে প্রক্রিয়ায় এই রূপান্তর ক্রিয়া সংঘটিত হয় তা অনেকটা রহস্যময়।

www.pathagar.com

জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রাশি কবির মনে রূপান্তরিত বিন্যস্ত ও শিল্প সমন্বিত হয়েই কাব্যরূপে বেরিয়ে আসে। এই রহস্যময় রূপান্তর কর্মকেই কবি বুদ্ধদেববসু বলেছেন জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম চলে কবির সারাজীবন ব্যাপী। এই সংগ্রাম থেকে কবির মুক্তি নেই। কবি কবিতা লেখার বিষয়টিকে নিরন্তর সংগ্রাম মনে করেন। এর মধ্যে ভাবনার সঙ্গে রয়েছে ভাষার এবং ভাষার সঙ্গে টেকনিকের সংগ্রাম। কবি তার মনোভূমির ভাবনাকে রূপান্তর করেন ভাষায়। নতুন প্রকাশকলার সন্ধানে তাকে প্রতি মুহূর্ত ব্যস্ত থাকতে হয়- নিরন্তর ভাবতে হয় টেকনিক নিয়ে। সাধনা, শ্রম ও ধৈর্য অবলম্বন করলেই মহাকালের আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব হয়।

মতিউর রহমান মল্লিক আজীবন অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে কাব্য সাহিত্য সাধনা করেছেন। সুফী সাধকের মতো কাব্য সাধনাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সারাজীবন এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থেকেই তিনি জীবনপাত করেছেন।

মতিউর রহমান মল্লিক আপন অনুভবের আবর্তে সুন্দর ও সত্যসন্ধানী কবি। ব্যক্তিজীবনের নিভৃত উপলব্ধিকে তিনি ধ্বনিময় শব্দ তরঙ্গে ছন্দসুরে অতি সহজে অসাধারণ কাব্য আবহ সৃষ্টি করে অতি অল্প শব্দের আয়োজনে বর্তমান কালের সঙ্গে অতীত ইতিহাসের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, নিকটের সঙ্গে দূরের এবং পরের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে এক অপরূপ মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর কবিতায় বিশ্বাস, প্রেম, সমাজ, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও ইতিহাস এক সঙ্গে উঠে আসে। এজন্য তাঁর কবিতা এক কথায় জামে জামশেদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জামশেরে জাম পাত্রে নাকি সারাবিশ্বের চিত্র প্রতিফলিত হতো। পাত্রটির দিকে এক নজর তাকালেই সারাবিশ্ব দেখা যেতো। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা পড়লে আমাদের সামনে স্বদেশসহ সারাবিশ্বের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একটি কাব্য অথবা একটি কবিতা সময় ও স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। আর কবি ইতিহাস সচেতন হলে তো কথাই নেই। এখানে আমি সময় ও স্থান বলতে একটি খন্ডিত স্থান বা দেশের কথা বলছি না। এখন তো পুরো বিশ্বটাই আমাদের এক সমাজ- এক পরিবার মনে হয়। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে পৃথিবী খুব ছোট হয়ে গেছে। দূর এতো নিকটে এসে গেছে যে, কয়েকটা মহাদেশকে এখন এপাড়া ওপাড়া মনে হয়। চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায় বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনের শত শত নরনারী শিশুর লাশ, লাখো লাখো অসহায় মজলুমের বুকফাটা চিৎকার। অধিকার আদায়ের জন্য লাখো লাখো জনতার মিছিল। কান পাতলেই শোনা যায় কাশ্মীর, মায়ানমারের অসহায় মুসলমানের আর্তনাদ। গুজরাটের মুসলমানদের খুন আজো তো শুকায়নি। জালিমের জুলুম নির্যাতনে অধিকার হৃত মানুষের বেদনা শোকের কথা শোনার বিশ্বে যেনো কেউ নেই। এ সময়ে কবির ব্যক্তিগত সুখ-দু:খ, আবেগ-অনুভূতি, স্নেহ-প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতি ও ইতিহাস উঠে আসা খুবই স্বাভাবিক। কারণ কবি তো আকাশচারী বায়ুভূক প্রাণী নন। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তো বন্ধ ঘরের টেবিলে বসে কবিতা লেখেন না। তিনি পাখির মতো উড়ে উড়ে ঘুরে সারাবিশ্ব দেখেছেন আর কবিতা লিখেছেন। সারা বিশ্বটাই কবির স্বদেশ-কবি বিশ্বপ্রেমিক।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মানবতাবাদী। তিনি শোষক, জালিম, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসী ও যুদ্ধবাজদের কদর্য চরিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

কসোভোয় নামে সার্বিয় বর্বর
দাঁতাল শুয়োর
কাশ্মীরে নড়েচড়ে
দাঁতাল শুয়োর ঝিলাম নদীতে নামে
শিরী নগরের অলিতে গলিতে
দাঁতাল শুয়োর নামে
রোহিঙ্গাদের বুকের উপরে স্বাধীনতা বিরোধীরা
আরাকানীদের মাথার উপরে গৃধ্নেুর কালো ছায়া
আরব সাগরে সাদা ভল্লুক নামে
নীল দরিয়ায় সাদা ভল্লুক নামে
ফিলিস্তিনিদের পক্ষে প্রান্তরে মাগদুব-দললীন
সুদ-খেকো গৃধ্নুরা
এবং দাঁতাল শুয়োর এখন
সাদা ভল্লুক কোনখানে নামেনি যে,...
(তবুও আকাশে চাঁদ : তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা)

এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়-

ফিলিস্তিনীদের দুই হাতে পাথর
পর্বতের মতো পাথর
ফিলিস্তিনীদের মাথায় রুমাল
প্রলয়ের মতো রুমাল
যেন একেকজন গাজী সালাহউদ্দীন আইউবী
জেরুজালেমের প্রতিটি উঠোন থেকে
তাড়িয়ে দেবে
ইহুদ বারাকের মতো বিভৎস অভিশাপ
(অশেষ ফিলিস্তিনীরা :ঐ)

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের আরেকটি শাণিত কবিতা 'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা'। এক দেশপ্রেমহীন মহিলা যার স্বভাব চরিত্র বস্তিবাসী ঝগড়াটে নারীর, রুচিতে বরং তার চেয়ে নিম্নে, যে স্বদেশে বাস করে বিদেশ ভালোবাসে অধিক, ভালোবাসে মায়ের চেয়ে বেশি মাসীকে। কবিতাটিতে তার স্বভাব চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কবি মল্লিক। কবি বলেছেন :

সমস্ত মুখ কাল নাগিনী
চোখের ভেতর বিড়াল হাঁটে
চশমা কেবল বাড়ায় বাঁকা চাতুর্যকে

www.pathagar.com

এরপর কবি বলেছেন :

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা আগ্নেয়াস্ত্র সর্বদা যে
খিস্তি-খেউড় তোমার স্বভাব
জন্মগত রক্তে গরল
স্বামীও তোমার ঘর ছাড়ালোক
জিহ্বাতো নয় শাঁখের করাত
কয়লা ধুলে ময়লা বাড়ে
তোমার ঠোঁটের মধ্যে নাচে
বস্তিবাসীর ঝগড়াটে বউ।
(তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, পৃষ্টা-২২)

মতিউর রহমান মল্লিকের কয়েকটি প্রতীকী কবিতার মধ্যে একটি 'একজন ফুটবলের কথা' উল্লেখ করার মতো। কবিতাটিতে আগাগোড়া একজন নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত মানুষের কথা ফুঁটে উঠেছে। একটি নির্মম সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যে সমাজের নায়ক একজন শ্রমিক-সর্বোপরি একজন খেটে খাওয়া মানুষ। যিনি সারাদিন গাধার মতো খাটুনি খেটে যান একটি সুন্দর স্বচ্ছল পরিবারে জন্য। কিন্তু তার সাথীরা তাকে হুকুমের গোলাম বানিয়ে রাখে। তার সাথে ফুটবলের মতো আচরণ করে। কবির উচ্চারণ 'সময়ের লাথি খেতে খেতে/ সে এক নিষ্পেষিত ফুটবল/ ঢুকে গেল সকালের অফিসে/নির্দিষ্ট ভেতরে/ তারপর নির্বাচিত খেলোয়াড়েরা/ নির্ঘাত খেলে গেল সূর্যাস্ত অবধি/প্রত্যেকের পাও ঘুরে ঘুরে/ সেই যে ফুটবল নিয়মিত প্রেসে যায়/ কোথায় প্রুফ/ পরকীয়া শব্দ নিয়ে জপছে এক/রুদ্ধদ্বার সাধক।

কবিরা সমাজের নির্মোহ পর্যবেক্ষক। সমাজকে ভালোভাবে অবলোকন করেন তৃতীয় চোখের নিপুণ দক্ষতায়। দেখে ফেলেন অন্ধকারের পেছনের অন্ধকার। তারপর চেতনার জাল ফেলে তুলে আনেন সমাজের অক্ষমতা, বিকলাঙ্গতা। আশার কথা মতিউর রহমান মল্লিক এই কাতারের একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী। তাঁর কবিতায় আমরা বার বার সেই চিত্র দেখতে পাই। কবি বলেছেন (১) মানুষ কি কেবলই তিনটি মুদ্রিত হরিণ/ অথবা একটি স্বাক্ষরিত শাপলার/পেছনেই ছুটে বেড়াবে (মানুষ কি কেবলই, পৃ. ১৪)

(২) যে সব মানুষের মধ্যে মেয়েদের ফেলে দেয়া/চুলের মতো প্রশ্নের জট থেকে যায়/সে সব মানুষ এক সময় গাছকাটা দায়ের মতো/ ভয়াবহ হয়ে যেতে পারে। (প্রশ্ন বিষয়ক উপসংহার, পৃ. ১১)

অনেকেই প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। শুধু বাইরের সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। নারীর অঙ্গের রূপ বর্ণনায় তারা পঞ্চমুখ। কিন্তু সৃষ্টি বস্তুর সৌন্দর্য কি শুধু বাইরে? নারীর সৌন্দর্য কি শুধু তার অঙ্গেই? কবির তো উপরে উপরে দেখলে চলে না। প্রতি বস্তুর বাইরে যত রূপ-সৌন্দর্য আছে, ভেতরে আছে তার অধিক। মনিকাঞ্চন মাটির নিচেই থাকে, সমুদ্রের ফেনার মতো তা ঢেউয়ের উপরে ভাসে না। এ জন্য কবি বলেছেন :

কবি কি ডুব দেবে না

www.pathagar.com

ভাবের স্বচ্ছ সম্ভাবনায়
শিকড়পন্থী মহান মানুষ
তৃপ্ত রবেই ডালপালাতেই?
এরপরে কবি বলেছেন–
নারী কি শুধুই নারী কবির নিকট
নদী কি শুধুই নদী
কবিতার স্বভাব কি তার অঙ্গে বিভোর
নাকি এক হৃদয় আছে
কবিতার গহীন ভেতর।
(কবি ও কবিতা, পৃ. ৭)

এই যে আমাদের জীবন সমাজ আর দেশে, প্রতিটি ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করার মতো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কখনো জিজ্ঞাসার মধ্যে যেমন সমস্যা রয়েছে তেমনি তার সমাধাবের ইঙ্গিতও রয়েছে। সমাজ বিচিত্র। মানুষ আরো বিচিত্র। শৃগালের মতো ধূর্ত স্বভাবের মানুষগুলো তাদের ধূর্তামী ঢেকে রাখে নানারকম শুভ্র আবরণে। তারা মানুষের কল্যাণের সব পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। তারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলে মানুষকে বুঝায়। সাধারণ মানুষ আর কি করবে? তাদের অত শত বুঝবার ক্ষমতা নেই। তাদেরকে যা বুঝানো হয় সরল মনে তাই বোঝে, যা দেখানো হয় তারা সাদা চোখে তাই দেখে। এভাবে ধূর্ত লোকগুলো সমাজের সাধারণ মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখতে চায়। এই সরলমনা মানুষদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন–

অথচ আজকাল মানুষের কী হলো যে,
নিকটতম নর্দমাকেই
শেষ পর্যন্ত সমুদ্র উপাধী দিয়ে
বিচক্ষণতার ঢেকুর তুলতে লেগে গেছে

হায় রে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ
তোমার প্রত্যেকটি আস্তানার ভেতর
দেখি ধাড়ি ইদুঁরের আনাগোনা
প্রকৃত শস্য ভান্ডারের তাহলে কী হবে এখন?
(জিজ্ঞাসা, পৃ. ১২)

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আছে অনেক গৌরবের কথা, শৌর্যবীর্যের কাহিনী, সফলতা ও বীরত্বের কাহিনী। ইতিহাস সচেতন কবির কাছে, শুধু কবির কাছে কেন আমাদের সবার স্মরণে বার বার ফিরে আসে। অমর অম্লান অনেক নাম আর কাহিনী :

একসাথে অনেক এবং অনেক ওমর
জন্মেছিল বলেই গোটা পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যে
লুফে নিয়েছিল ফারুকের মতো
আপোষহীন বর্ণমালা।
তার মানে অনেক অনেক খালিদ নিয়েই

www.pathagar.com

একজন খালিদের পৃথিবী জোড়া বিস্ময়
এবং শেষ অবধি অনেক এবং অনেক
সালাহউদ্দীন থাকেন বলেই
পবিত্র জেরুসালেম মুক্ত লাইন হয়ে যায়
.....
দেখো সিরাজউদ্দৌলা একা না হয়ে গেলে
পৃথিবীর চেয়েও বড় একটা বাংলাদেশ
আমরা পেয়ে যেতাম
(চূড়ান্ত রিপোর্ট, ২৩ পৃ.)

অতীতের অনেক গৌরবময় ইতিহাস, বীরত্বের কাহিনী, অমর সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের কাহিনী বলার পরেও পাড়াগাঁয়ের গতর খাটানো শ্রমজীবি মানুষের কথা কবি ভুলে যাননি। কবি দুঃখ কষ্টে ভেঙ্গে পড়া ভাঙাচূড়া চেহারার অশিক্ষিত মানুষকে হৃদয়ের দরদ ঢেলে দিয়ে তাদেরই মুখের ভাষায় তাদের ডাকা নামে তুলে এনে বসিয়েছেন কবিতার ফরাশে। তাই বেলায়েত আলী হয়েছে 'বেলাতালী'। তার জীবন সংসার ও চরিত্র ছবির মতো ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনেঃ

সাত হাটুরের সাথে তোতলাতে তোতলাতে
তালপাতার কিষাণ বেলাতালী
জোড়াতালি দেয়া সংসারের মতোই
কথা বলে বলে ঝরে ঝরে পড়ে যায়
আজো কি?
যেমন তার কেরাসিনের শিশি আর
সষ্যের তেলের শিশি টুংট্যারর-র-টুংট্যারর-র-র-র
বাজতে বাজতে করুণ দুঃখের মতো
ছড়িয়ে পড়ে ধুলায় ও বাগানের বিষাদে!
(শুধু যাবো আর আসবো, -৪৪)

তিন

কবির কাছে আবহমান বৈশ্বিক জীবনরূপ ও বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষার বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তা হলেই কেবল শাশ্বত মানবের আনন্দ বেদনার কথামালা রচিত হতে পারে– রচিত হতে পারে বৈনাশিক খরা এড়িয়ে যে জীবন ও ইতিহাস ঐতিহ্য বহমান বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তার অন্তরঙ্গ রূপকল্প। কবিরা সব সময়ই হারানো কাল-ঐতিহ্যকে বার বার ফিরে পেতে চান, অতীত জীবনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সংস্থাপন করতে চান। কবিরা চিরকালই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু বন্ধন রচনা করেন তাদের বোধ ও প্রজ্ঞায়।

মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন-
বিশ্বজোড়া খ্যাতিভরা অতীতকে মোর সামনে রাখি,
অতীতের সেই আরশীতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।

এলিয়ট এই চেতনাকে বলেছেন- a perception not only of The pastness of the

www.pathagar.com

rast, but of its presence. এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Tradition and The Individual Talent প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- This historical sense which is a sense of the timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal togather, is what makes a writer traditional.

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ঐতিহ্যবোধ প্রবল। তিনি শুধু বহমানকালের কবি নন- তাঁর রচনায় অনুভূত হয় মুসলিম ঐতিহ্য ও বিশ্ব ইতিহাস।

ভাষার মূল বিশেষত্ব এই যে তা মানুষের কল্পনা চিন্তা ও স্মৃতির প্রতীক। এই প্রতীক যে সব শব্দ বা ধ্বনির উপর ভর করে দাঁড়ায় তারা আমাদের চেতনায় নিয়ে আসে কোনো না কোনো চিত্র বা চিত্রের অনুষঙ্গ। যে কোনো শব্দ উচ্চারণ মাত্র আমরা একটি ছবি দেখি, আর দেখায় যদি খুলে যায় কল্পনার চোখ, তখন শুধু ছবি নয়, দেখি তার পরিপার্শ্বের সব কিছু। তার পাশের সব কিছুর সঙ্গে, সমগ্রের মধ্যে জুড়ে থাকে প্রকৃতি বা বস্তুর ঘ্রাণ এবং তার রঙ। আমাদের কল্পচেতনায় তখন নানা দৃশ্য, মিশ্র ঘ্রাণ ও মিশ্র রঙের চিত্রকে বিশদ করে দেয়।

কোনো কোনো কবি ভাষাকে বিশেষভাবে চিত্র রচনার জন্য ব্যবহার করেন। বিশেষ ভাবনা বা জীবন দর্শন প্রকাশের জন্য কবি ছবি আঁকেন এবং পরিপার্শ্বের সমগ্রতার সঙ্গেই তা প্রকাশ পায়। আমাদের ইন্দ্রীয়ানুভূতিতে তখন বর্ণ ও গন্ধ বাদ পড়ে না। মতিউর রহমান মল্লিকের অন্ত প্রকৃতি চিত্র রচনায় সমগ্রের দিকেই মনোনিবেশ করে। ভাষা দিয়ে ছবি আঁকার দক্ষতা তাঁর অসাধারণ এবং তাঁর ছবি সাদা কালো নয়-রঙিন।

কবি মতিউর রহমান তাঁর সমকালীন কবিদের থেকে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি তাঁর আরেক বৈশিষ্ট্য। নিজের কাব্যভাষা তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। এজন্য তাঁর কবিতার অপরিচিত কয়েকটি লাইন পড়ার পর, লেখাটা কার তা না জেনে আমরা প্রায় নির্দ্বিধায় বলতে পারি-এগুলো মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার পঙক্তি। তাঁর কাব্য ভাষায় তিনি নিজের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর মুদ্রিত করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি দেয়া যায় :

যখন দিবস হয়েছে আরও দিবস
রাজপথ হয়েছে অধিকতর কঠোর কঠিন কর্কশ
কোলাহল ঘিরে ধরে মতিঝিল!
আমূল মহানগরী নড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে ঝিলমিল।
(কষ্ট ৯৭, পৃ. ৩৬)

শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মল্লিক শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে ইঙ্গিত ও প্রতীকের দিকে ঝুকে পড়েছেন দেখা যায়। একটি শব্দের ভেতর থেকে তিনি তার অর্থের অতিরিক্ত কিছু নিষ্কাষণ করে নিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দের মধ্য থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছে বাঙময় ছবি। অবশ্য সব শব্দই কোনো না কোনো চিত্রের প্রতীক। আর প্রতীক এমন ইমেজ যার মধ্যে জাদুশক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়। এই জাদুশক্তি মতিউর রহমান মল্লিকের পঙক্তির পর পঙক্তিতে অনুভব করা যায় :

কুহু নেই কেকা নেই

www.pathagar.com

পাতা নেই ফুল নেই
শাখা নেই বাকল নেই
কান্ড নেই শিকড় নেই
মাটি নেই রস নেই
(পরিকল্পনা, পৃ. ১০)

ভাষার অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ বিশেষণ। সৃষ্টিশীল কবিতা বিশেষণের সুপ্রযুক্ত ও অপ্রত্যাশিত নতুন ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কোনো সভ্য ভাষাতেই বিশেষণ ছাড়া মনের কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। অনেকে উপমাকে বিস্তারিত বিশেষণ বলে মনে করেন। বিশেষণের সুষ্ঠু ও সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে ভাষার শরীর পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতায় বিশেষণের আশ্চর্য সৌন্দর্য সঙ্গতির প্রদীপ্ত শিখা জ্বেলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্প কবিতা ও গানে তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করেছে। রবি ঠাকুর পরবর্তী অনেক কবি এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা ও গানে আমরা এটি পুরোমাত্রায় লক্ষ্য করছি। তাঁর নির্মাণ কলার দিকে খালি চোখে তাকালেও চোখে পড়বে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে বেশ কিছু কলাকৃতি। আবার কখনো এমন সব সূক্ষ্ম নির্মাণকলা তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন যে গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে না তাকালে তা চোখে পড়ে না। এজন্য কবিতা পাঠককেও কিছু কবি হতে হয়।

কবি মতিউর রহমানের 'চিত্রল প্রজাপতি' এক রূপময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্য। এতে প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের গভীর যোগসূত্র ও প্রভাব অনুভব করা যায়। মানুষের সংসার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞান ও বোধবিশ্বাস মিলন বিরহ, স্নেহ প্রেম, সুখ দুঃখ, হতাশা বঞ্চনার কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে বেশ কয়েকটি কবিতায়। কবি অতি সহজে পাঠকের মনকে নিজের অনুভব ও চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করেছেন। কবি ও পাঠক যেনো একই গন্তব্যের যাত্রী। কবি একটি দৃশ্য বর্ণনার পর যখন আরেকটি দৃশ্যে চলে যান তখন পাঠকও কবির সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যান। কাব্যের মোহও আবহ সবাইকে এক কেন্দ্রে একত্রিভূত করে। সেখানে আকাশ, ফুল, পাখি, নদী, মানুষ একাকার :

ঐকতানের মত পবিত্রতম বৃষ্টিরা নাজিল হয়ে যায়
শুভ্র এবং শুভ্রতার মত
নরম কাশফুলেরা নেমে আসে আকাশ থেকে
অথবা কোমল উপলব্ধির মত
স্বপ্নের পাখিরা একই সঙ্গে
ডানা মেলে দিলো পৃথিবীর ওপর
(বৃষ্টিরা, পৃষ্ঠা নং-৯)

উল্লিখিত কবিতাংশে বৃষ্টি, শুভ্র, কাশফুল, কোমল উপলব্ধি আকাশ পাখি শব্দগুলো আভিধানিক অর্থ থেকে যে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে তা অনুভব করা যায় এমন, যা হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আলতোভাবে। কবির ভাষা একেই বলে। এ পর্যন্ত মতিউর রহমান মল্লিকের পাঁচটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে কবি কাব্যলোকের একেকটি দরজা খুলে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন সব কয়টি জানালা। এ জানালা-দরজায় দাঁড়ালে আমরা একেকটি নতুন ভুবন দেখতে পাই। অবশ্য সব কবিদের কাজই নতুন নতুন ভুবন দেখানো, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্বপ্ন দেখানো। আমরা কি চেয়েছিলাম কি পেলাম আর কি পাইনি। কবি বলেছেন আমরা বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করে অনেক বিজয়ই পেয়েছি বটে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় আজো পাইনি।

অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে,
অনেক বিহান হেসেছে আবার
অনেক বিহান হাসেনি যে।
(নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ.২৩)

কবিতাটির ভাষা style নাজিম হিকমতের সেই বিখ্যাত কবিতাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়–

আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলি
আজো আমরা পাইনি
মধুরতম যে কথা আমি বলতে চাই
সে কথা আজো আমি বলিনি।

ঈদ আসে ঘরে ঘরে আনন্দ আর মানবতা ও সাম্যের বাণী নিয়ে। ঈদ ধনী, গরীব, সাদা কালো ও ছোট বড়র ভেদাভেদ ভুলিয়ে সবাইকে একত্র করে এক জামায়াতে দাঁড় করাতে চায়। জাতীয় জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈদ উৎসবের মতো আর কোনো উৎসব নেই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, সেই রকম ঈদ এখন আর আসে না, হৃদয়ে সুখ শান্তি ও আনন্দ অনুভব করা যায় না। এখন ঈদ এলে কালো- বাজারীদের পোয়া বারো। তারা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাদের রক্ত শোষণ করা শুরু করে। ঈদ আসে তবু চুরি ডাকাতি সন্ত্রাস খুনাখুনি ও যুদ্ধ থামে না। শুধু দরিদ্র মানুষ নয় সমাজের সকল মানুষ অর্থলোভী ও বিশ্বাস ঘাতকদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। এখন ঈদ বড় কষ্টের বড় যন্ত্রণার। কবিও অসহায়। তবু–

মীর জাফরের পদভারে দেশ
জর্জরিত;
ক্লাইভ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া
সব-জড়িত
বাংলাদেশের সর্বনাশের
পেছনে আজও;
জগৎ শেঠেরা হয়নি তো শেষ :
তাদের কাজও।
সর্বহারার সঙ্গে স্বাগত
সম্ভাষণ;
তবুও ঈদের চাঁদকে জানাই
অভিবাদন।
(ঈদ : পুষ্পিত বনের বৃত্তান্ত, পৃ.৪০)

www.pathagar.com

'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কাব্য গ্রন্থের 'বাগেরহাটের সারাবেলা' তিন পৃষ্ঠা দীর্ঘ কবিতা। কবি শহুরে হলেও জন্মস্থান বাগেরহাটে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন ভালোবাসার আবেগে : এখনও শটিবন আমাকে কাঁদায়/কাউওডিম গাছের পাতায় আমার মন পড়ে থাকে/ ধোপা কোলার বিহ্বলতায় হঠাৎ আমি দীর্ঘ হয়ে উঠি/ সোনার ভিটের ছায়ায় বাড়তে থাকে/ আমার শৈশবের সোনালি বয়স/এবং এখনও বাঁশ বাগানের সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডাকতে থাকে।

আজ বিশ্বের দিকে দিকে ইহুদী-খ্রিস্টান নাছারারা ক্ষেপা ভাল্লুকের মতো লাফাচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী ও যুদ্ধবাজ। তারা সারাবিশ্বে অশান্তির আগুন জ্বেলে রেখেছে। মুসলমানরা নানা দলে উপদলে বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেশে দেশে ইহুদী-খ্রিস্টানদের হাতে মার খাচ্ছে। মারখাওয়া হতাশাগ্রস্ত এই মুসলিম জাতিকে ডাক দিয়ে আশার বাণী কবি শুনিয়েছেন : 'হতাশ হয় না জিহাদের জঙ্গীরা/হতাশ হয় না কোনো খাঁটি বিপ্লবী/ হতাশ হয় না শহীদের সঙ্গীরা/বুকে নিয়ে ফেরে ঈমানের দুন্দুভি/চলে অবিরাম চির মুজাহিদ বীর/সত্যের পথে সেনানী অকুতোভয়/ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাশার জিঞ্জির / সে শের-দিলীর মানে নাকো পরাজয়/'..... কবি ইতিহাসের সোনালি ও গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরো বলেছেন : বখতিয়ারের ঘোড়ার শব্দ ঐ / লোকালয়ে যেনো অবিকল শোনা যায়/ তাই কি আমিও দুই কান পেতে রই/ সতেরো সওয়ার কবে আসে দরজায়/'.... মুসলমানরা দুর্বল ভীরু জাতি নয়। তারা ঈমানের তেজে দীপ্ত ও শাণিত : দুর্বল ভীরু আনে না দ্বীনের জয়/ খানিক বিপদে ভয়ে কাঁপা তার কাজ না/ ঈমানের তেজে পৃথিবী বিস্ময়/শুধু সেই পারে গড়তে হেরার রাজ/ (তুমি কি এখন : নিষণ্ন পাখির নীড়ে, পৃ.১৫)

এখন আমাদের বড় দুঃসময়। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আকাশে উড়ছে কালো শকুন। নদীতে মাছ নেই পানি নেই- আছে কুমীর হাঙ্গর। শহরে গ্রামে পথে ঘাটে দস্যু-সন্ত্রাসী, সীমান্তে সন্ত্রাসী যুদ্ধবাজদের ফিসফাস দিনরাত। তারা কেড়ে নিচ্ছে আমাদের সম্পদ। বাংলাদেশকে তারা তাদের পণ্যের বাজার আর হোলিখেলার মাঠ বানাতে চাচ্ছে। তাদের কত শত আবদার এটা দাও ওটা দাও। তাদের দাবীর শেষ নেই। তারা হাত বাড়িয়ে আছে আমাদের রক্তে কেনা স্বাধীনতাটুকুর জন্যও । কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় ফুটে উঠেছে তাদের দাবীর চিত্র :

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।
নাইবা দিলাম জল
নাইবা দিলাম
চালের মতোন বাঁচবার সম্বল।
রাখি-বন্ধন-ঘোড়াতো দিয়েছি
পাঁচ- ছয়টার মতো-
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।
সীমান্তে কাড়ি প্রতিদিন বিডিআর
সাধারণ লোক? তাও গাড়ি বর্ডারে
কৃষক- মজুর- গ্রাম্য নির্বিচারে।
গাড়বো না কেনো?

www.pathagar.com

গোড়বোনা?
যা খুশি করতে কেনো পারবো না।
পারবো না কেন?
পাকওয়ালাদের বারোটা বাজিয়ে
হানাদারদের পাঁজরে ঘা দিয়ে
এই তো সেদিন তোমাদের হাতে
দিয়েছি যে তুলে পতাকা স্বাধীনতার।
ভোলো তাই যতো
বিধিসম্মত
চির অক্ষত
বিমল ভাষ্য একাত্তরের যুদ্ধের
চেতনার
.....
কৃতজ্ঞতার এটাই ক্রান্তি-প্রান্তীয় বস্তুত,
ট্রানজিদ দাও, ট্রানজিদ দাও ভৃত্যরা আপাতত।
ভেঙেছি না হয় কলসীর কাণাকোণা
তাই বলে কি গো প্রেম দেবে না ?
প্রেম দেবে না?
দেবে না বাজার?
দেবে নাকো গ্যাস ?
দাবী মানবেনা নিত্য বড় দাদার?

'ট্রানজিট মতিউর রহমান মল্লিকের একটি দীর্ঘ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা। এতে ভারতের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আমরা তাদের কাছে ম্লেচ্ছ-যবন ছাড়া আর কিছু নই, তাদের কাছে আমাদের সামান্য মর্যাদা নেই। কবিতাটা সম্পূর্ণ তুলে না ধরে আংশিক থেকে বিষয়টা পুরোপুরি বুঝা যাবে না বিধায়, বাকী অংশটুকু তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

ভালোয় ভালোয় তবু সব শেষে
এঁটোভুজী ভীরু ভক্তের বেশে–
করো সোনা মাথা নত।
ট্রানজিট দাও ট্রানজিদ দাও পোষ্যরা আপাতত।
তোদের জন্য কমতো করিনি;
বল, আজো করি কম?
অনন্ত কাল আশ্রয় দেই
তোদের দেশের যতো সন্ত্রাসী যম।
গোপন অস্ত্রধারীদের রাখি
জামাই আদরে
অতিথি বানাই ঢাকিয়া চাদরে

www.pathagar.com

চলে হরদম
দহরম
বহরম–
তবু কি তোদের হবে না রে বোধ ক্রমাগত উন্নত?
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে বশ্যরা আপাতত।

গেঁথেছি কতো যে রাজনীতিবিদ
বুদ্ধিজীবী ও লেখক
হোমরা- চোমরা কত যে বেঁধেছি
তোদের
হাঁ হাঁ হাঁ বেশক;
কিনেছি বিবেক-
মান-সম্মান-অহং-আত্মবোধের।
প্রচারপত্র তাও তো কিনেছি-
মন্ত্রমুগ্ধ মিডিয়া কিনেছি কতো।
আমাদের গড়া নফররা দেখ্
কতো বেশি হা-হা-হা কতো বেশি সংহত
এবং তা হলে-
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে,
বিকলাঙ্গ ও নস্যরা আপাতত।
দেবে না এখন ?
কিছু-দিন-পর পারতপক্ষে স্বাধীকার দেবে
ভূগোল নিহিত স্বাধীনতা দেবে
মানচিত্রের পাতা ছিঁড়ে দেবে
ছল-বল-কল বোঝো না যখন–
চাতুর্য কার্যত;
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও
ম্লেচ্ছ-যবন- চোষ্যরা আপাতত।

বাংলাদেশ আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সাত সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এ স্বাধীনতা আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। এদেশের স্বাধীনতা নস্যাত করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। তারা বিভিন্ন সময় দালাল তস্কর খুনী সন্ত্রাসীদের এ দেশের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে ও নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। মতিউর রহমান মল্লিক স্বদেশ প্রেমিক কবি। তাঁর স্বদেশপ্রেম অতুলনীয় অপার। তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতো স্বদেশের দিকে তাকিয়ে জেগে আছেন। স্বদেশপ্রেম মূলক রয়েছে তাঁর অনেক কবিতা। 'সজাগ থাকার রাত্রিদিন' স্বদেশ প্রেমমূলক তার ছন্দবদ্ধ দীর্ঘ একটি কবিতা ২০০৭ সালে সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেটি টাংগাইল থেকে 'কৃষ্টি' অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ পায়। কবি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে–

www.pathagar.com

আজ জনতার জেগে থাকবার, সজাগ থাকার রাত্রিদিন–
মুক্ত স্বাধীন স্বদেশভূমি যে, ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন।
সচেতনতার অনেক অনেক প্রয়োজন বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার, মূল উঠানোর এলগন।
বাঁচাতে হবে শাহ মাখদুম শাহজালালের পূণ্যভূমি।
অশেষ গাজী ও শহীদ যেখানে অনন্ত কাল রয়েছে ঘুমি-
সব বর্গীর হাত থেকে আজ বাঁচাতেই হবে দেশ মাতারে,
ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে যে, দাঁড়াতে হবে এক কাতারে।...
এখন সময় সাবধানতার, সর্তকতার সমূহ ক্ষণ,
এখন সময় ক্লাইভদের সকল পর্দা উন্মোচন
করার এবং স্বদেশ প্রেমের অসীমশক্তি জাগিয়ে তোলা;
দুঃস্বপ্নের সকল রজনী প্রবল ক্ষুব্ধ ঘৃণায় ভোলা।....

যখন দেশ সুখ শান্তি সাম্য সমৃদ্ধি ও ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক প্রশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্বাধীনতা লাভের মূল উদ্দেশ্যে স্বপ্ন দেখছে জনতা তখন–

ক্ষেপে গেছে যারা-তারাই মূলত চায় সারাদেশে অস্থিরতা,
অশান্তি চায়, দুর্গতি চায়, চায় যে- চরম অরাজকতা।
পরাশক্তির হস্তক্ষেপ বেড়েই চলেছে ক্রমাগত,
খাল- কেটে আনা কুমীরের দিন অনুদিন আরো বাড়ছে তত,
চলছে দেদার ওদের বেনিয়া কর্মকান্ড প্রকাশ্যে যে–
দেশীয় দালাল আগের চেয়েও ওদের সঙ্গে সহাস্যে যে।.....

মল্লিকের 'সজাগ থাকার রাত্রিদিন' কবিতা আবৃত্তির জন্য খুবই উপযোগী। এতে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি জাতির দিশারী কবি।

চার

মতিউর রহমান মল্লিকের 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি সাজ্জাদ হোসাইন খান বলেছেন– "কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত। এই সমর্পণ কবির কাব্যভাষাতে উচ্চকিত, বহমান। বিষয় বিন্যাস ও শব্দ ব্যবহারের চলমান টেকনিক সময়কে স্পর্শ করলেও বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতা মতিউর রহমান মল্লিককে একটি ভিন্ন উপত্যকায় হাজির করেছে। উপস্থাপনের সারল্য, শব্দ আবিষ্কারের অনুসন্ধানী মস্তিষ্ক তাঁর কবিতাকে আরো গ্রহণীয় করেছে এবং আরো আগ্রহী করে তুলেছে পাঠক সমাজকে। ঐতিহ্য-ইতিহাস আর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমকালকে ধারণ করেই উঠে আসে তাঁর কবিতার পংক্তিমালায়, শিল্পসুষমায়। তাঁর গীতিময় কাব্যভাষা গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিককে স্মরণে নিয়ে আসে। উন্মোচিত করে তাঁর আরো একটি পরিচয়।

www.pathagar.com

ভাষার সারল্য, বিষয়ের গভীরতা আর শব্দ বুননের আধুনিক কৌশল তাঁর কবিতাকে ঐশ্বর্যের চৌকাঠ অবধি পৌঁছে দিয়েছে ইতিমধ্যে। কাব্যবৃক্ষে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এখন এক মুখর পাখি/ বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে' সেই মুখরতারই কলধ্বনি।"

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা সম্পর্কে কবি সাজজাদ হোসাইন খানের এ মন্তব্য যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতায় অযথা কল্পনার ডালপালার বিস্তার নেই। শব্দগুলো দিয়েশলাই কাঠির মতো বারুদ ভরা। ভাষা মেদহীন, ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন। কোথাও অবোধ্য বা দুর্বোধ্যতার অন্ধকার নেই। কোথাও বিষয়ভাব ও শব্দের পুনরাবৃত্তি নেই। প্রতিটি পঙতি ক্রমে ক্রমেড় নতুন নতুন দৃশ্যপটের ভাঁজ খুলে উন্মোচন করেছে। এর ফলে পাঠকদের সামনের দিকে টেনে নেয়, সমস্যার সাথে সমাধানের পথ দেখায়, আশার বাণী শোনায়, নতুন দিনের স্বপ্নে মন প্রাণ বিভোর করে। মল্লিকের কবিতা এক কথায় বলা যায় খাদহীন। প্রয়োজনীয় উপমা ও অলংকারে সাজানো শব্দমালা মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করে।

মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতায় রয়েছে কালজয়ী আদর্শের অনুপ্রেরণা, ইতিহাস ঐতিহ্য তাহজিব তমদ্দুনের প্রাণবন্ত নকশা। তাঁর কবিতা ও সংগীতের সুরে পাঠক মুহূর্তে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তিনি জাতীয় জাগরণের কবি। আমাদের আদর্শ স্বপ্ন ও ঐতিহ্যের নিপুণ রূপকার।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবনা

খোন্দকার আয়েশা খাতুন

বাগেরহাটের বাগ থেকে একটি ছোট্ট চারাগাছ তার ক্ষুদ্র অথচ বলিষ্ঠ কান্ডের উপর কেবলি দু'টি পাতা বিস্তার করে যখন ছড়াচ্ছে সুরলহরী তখনি অনেক প্রত্যাশায় তাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন মীর কাসেম আলী। সেই প্রত্যাশার বাস্তব রূপের নাম-গায়ক, গীতিকার, সুরকার, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, সংগঠক, নাট্য আন্দোলনের পুরোধা, সংস্কৃতি বিপ্লবের প্রাণপুরুষ কবি মতিউর রহমান মল্লিক। কবি আব্দুল হাই শিকদারের ভাষায়, 'বিংশ একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম বাতিঘরটির নাম কবি মতিউর রহমান মল্লিক।'

একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই আমরা হারালাম আমাদের প্রিয় ভাই মল্লিককে। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে এগিয়ে আসা মল্লিকের প্রতিভাকে শুধু নজরুল ও ফররুখের সাথেই তুলনা করা যায়। নজরুলের খেয়ায় চড়ে ফররুখের নারঙ্গীবনের সবুজ পাতার কাঁপন মল্লিক অনুভূতির কুঁড়িতে বিপ্লবের শিশির জড়িয়ে জাগ্রত করেছেন বিশ্বাসকে। নজরুল যখন মাগরিবের আযান শুনেন, ফররুখের আকুতি- 'তবু তুমি জাগলে না,' মল্লিক তখন আশাবাদ ব্যক্ত করেন– 'কোন একদিন এদেশের আকাশে কলেমার পতাকা উড়বে।' আদর্শের একটি দৃপ্ত প্রকাশ আমরা যেমন তার জীবনে, মননে, বিশ্বাসে পেয়েছি তেমনি পেয়েছি তার লেখনিতে। স্রষ্টার প্রেমে সিক্ত পাগলপারা কবি- উচ্ছ্বাসে উদ্বেল তার প্রকাশ। আদর্শের প্রকাশকে অনেকে বলেন, শিল্প আর শিল্প থাকে না, ওয়াজ মাহফিল হয়ে যায়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখনিতে আদর্শ যেমন এসেছে তেমনি এসেছে স্রষ্টার প্রতি তার প্রেম। তিনি তা প্রচার ও প্রকাশের প্রচেষ্টায় কাজ করেছেন সব সময়ই। কিন্তু সাহিত্যের শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয়নি কোথাও। বরং তার প্রতিটি সৃষ্টিই কালোত্তীর্ণ হয়ে সব বয়সী মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবে চিরকাল।

কবি মল্লিকের প্রতিভা সম্পর্কে বিচারপতি আব্দুর রউফ বলেন, "মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে জ্ঞানের উৎস বলে থাকে কিন্তু মল্লিক বলেন প্রকৃতি ও পরিবেশের স্রষ্টা আল্লাহ। তাই সব জ্ঞানের উৎস আল্লাহই। মল্লিকের শিল্প সাধনা ঐ উৎসমূলের সাধনা।" তার রচিত গানের মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়ের আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে–

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর।

আশাবাদী কবি মল্লিক সবকিছু দেখেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে–

নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?

www.pathagar.com

বিপদ বাধায় পড়বো বলে
ন্যায়ের পথে লড়বো না?

বিজয়ের কবি মল্লিক। বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি তাই বলে অবাস্তব ঘোরেও থাকেননি। তাই বলেছেন-

অনেক বিজয় এসেছে
আবার অনেক বিজয় আসেনি যে
অনেক বিহান হেসেছে
আবার অনেক বিহান হাসেনি যে।

মানুষের বৈষয়িক রূপের সমালোচনা করতে গিয়েও তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেননি। বরং চমৎকার ভাষায় বলেছেন- 'মানুষ কি কেবলই তিনটি মুদ্রিত হরিণ অথবা একটি স্বাক্ষরিত শাপলার পেছনেই ছুটে বেড়াবে।'

মানুষকে তিনি তিরস্কার করেছেন কিন্তু ঘৃণা করেননি, কখনো ভুলে যাননি যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাই মানুষের বোধ জাগাতে সচেষ্ট কবি বলেছেন–

এক মনয বিহঙ্গ
নিজের ভিতর থেকে নিজেই জেগে উঠলো
যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা গেল না বলে,
জলাশয় কাঁপিয়ে তুললো
জীবনবাদী কোন রঙ্গিন মৎস
যেন কোন উদ্যোমী উদ্ভিদ কিশলয়
ছড়িয়ে দিতে লাগলো বসন্তের বাতাসে-
(প্রেস রিলিজ: তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা)

বিশ্বাসের প্রতিফলন জীবনে এনে প্রত্যয়দীপ্ত জীবনবোধ থেকে যে সংস্কৃতির বিকাশ সেটাও আমরা মল্লিকের সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে বিস্তার হতে দেখেছি। রাজধানী থেকে শহরে, শহর থেকে শহরতলীতে, গ্রামে গঞ্জে। আবার গ্রাম থেকে রাজধানীতে এনে অযুত নাট্যসেনা তিনি তৈরি করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন পুরস্কৃত করেছেন। নাট্য সংগঠন গড়ে তুলেছেন শুধু দেশে নয় বিদেশেও। বিরল যোগ্যতার অধিকারী মল্লিক নিজেই এক জীবন্ত আন্দোলনের রূপ নিয়েছেন।

অনেক পত্র পত্রিকায় তিনি যেমন লিখেছেন তেমনি সম্পাদনাও করেছেন এক দশকব্যাপী স্বনামখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা কলম। তারই সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছে সুর শিহরণ পদ্মা-মেঘনা যমুনার তীরে, প্রত্যয়ের গান ও ইসলামী গানের সংকলন।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। নিজেকে নয় অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ছিল তার আনন্দ। তাই শ্রদ্ধেয় কাজী দীন মুহাম্মদ স্যারকে বলতে শুনেছি, 'মানবতাবোধটিই তাকে আরো বড় করে তুলেছে। তার মধ্যে প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে অথচ কোন অহংকার ছিল না।' সুসাহিত্যিক জুবাইদা গুলশান আরা বলেন, 'নম্র স্বভাবের হলেও ভীরু ছিলেন না- ছিলেন সাহসী সৈনিক।'

www.pathagar.com

কবি মল্লিক যদিও কিছু স্বর্ণপদক ও সম্মাননা পেয়েছেন কিন্তু তার প্রতিভার তুলনায় এগুলো যথার্থ মূল্যায়ন নয়। জাতীয় পর্যায়ে তার মূল্যায়ন হতে আমরা দেখিনি। যদিও জাতির জন্যই তিনি নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। জাতি তার প্রতিভা ও অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করবে বলে আমি আশা রাখি।

তার লেখনিতে প্রকৃতির মতোই এসেছে নারী। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মমতা ও ভালবাসায় তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যেমন অবদান রেখেছিলেন খাদিজা (রা:) মা ফাতিমা, আয়েশা (রা:), খাওলা (রা:) তেমনি মল্লিকও তার সাহিত্য আন্দোলনে নারীদের এগিয়ে নেয়ার অপরিসীম চেষ্টা করেছেন। নারীদের বাদ দিয়ে কোন বিপ্লবই বাস্তবের মুখ দেখবে না। তাই তিনি তার সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছেন নারীদের। নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, বহু নারী সংগঠন গড়ে তুলেছেন, বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছেন। প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে নারীদের জন্য গড়ে তুলেছেন লেখিকা প্রাঙ্গন। এর প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস খেটেছেন। নাট্য প্রশিক্ষণে নারীর সম্পৃক্তকরণ ও লেখিকার সাহিত্য প্রশিক্ষণও তারই অবদান। শিশু কিশোরদের বন্ধু ছিলেন তিনি, কি গ্রামে, কি শহরে যেতেন শিশুদের ভিড় লেগেই থাকতো তার সাথে। গান গাইতে শুনতে, কবিতা শুনতে সবাই চারপাশে ভিড় জমাতো। ওদের সাথে তিনি নিজেই যেন এক শিশু হয়ে যেতেন। কিশোরদের গড়ে তোলার যে মহান দায়িত্ব তিনি অনুভব করতেন তার প্রকাশ পাই তার বই বিভিন্ন বাচ্চাদের নামে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে। যেমন–

সুমাইয় বেড়ে ওঠে সাগর ঘিরে
তাহেরার সাথে থাকে আকাশ বুঝি
জুম্মি ও নাজমীর দু'চোখে আশা
মুন্নার বুক ভরা আলোর পুঁজি।

এভাবে আসে ইমরান, রুহী, পরম, প্রকৃতি, শাওকী, নুসাইকা, আবদুহু, মাহসিন, নাওমী, মাশফী নাসীহা, নাভিদ, নাবিল, সুহাইম, নাহিদ, শিবলী, তাহিয়া, পিউ মাহফুজ ইত্যাদি সব শিশু কিশোরদের নাম।

এভাবে তোমাদের ব্যাপার নিয়ে
ভেবে ভেবে অবশেষে দিলাম তুলে-
তোমাদের হাতে হাতে আমার লেখা
প্রথম ছড়ার বই বিনা উসুলে।

সব শিশুদের মাঝেই তিনি একটি প্রত্যাশা একটি স্বপ্নের রূপ দেখেছেন। মল্লিক তাবৎ দুনিয়াটাকেই নিজের অখণ্ড ভাবনার বিষয় বলে মনে করতেন। তার চেতনায় বৈশ্বিক ভাবনা–

মূলত কবি অথবা মানুষ কখনো খণ্ডিত হন না
হাসির শব্দ, কান্নার শব্দ
এবং শিল্পকর্মের মতো
কবিরাও এক সময় সর্বত্র বোধগম্য হয়ে যান।
(সেক্সপিয়ারের বাড়ি)

www.pathagar.com

একবার মিন্টু ভাই বলেছিলেন, কক্সবাজার গেলে তোমাকে দু'টো আন্তর্জাতিক চোখ দেবো তারপর নাফ নদীর এক বুক জলে নামিয়ে দিলে বাংলাদেশের শ্বেতপত্র পড়ে নিও। (আবর্তিত তৃণলতা)

এসো এই গাছের নিচে একটু দাঁড়াই
তারপর ভালবাসি পৃথিবীর সকল মানুষকে।

এটা শুধু কথার কথা বা তাত্ত্বিক ভাষা নয় এ ছিল মল্লিকের হৃদয়ের তলদেশ থেকে উৎসারিত। জানি, জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু। তাই জীবনকালে গুণীজনের মূল্যায়ন কোনদিনই হয় না। মল্লিকেরও হয়নি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি তার প্রতিভার মূল্যায়ন করতে, তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে। বরং কষ্ট দিয়েছি অনেক বেশি। তাই কি প্রচণ্ড অভিমান গোপন করে চলে গেলেন এত অল্প সময়ে। বাইরের আঘাত তাকে কখনো টলাতে পারেনি- ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা তাকে আরো বলিষ্ঠতা দিয়েছেন সে আঘাতের প্রতিদানে। কিন্তু যখন ভেতর থেকে আঘাত পেয়েছেন একান্ত প্রিয়জন থেকে, সে আঘাত তিনি সইতে পারেননি, ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেছেন, আনত দৃষ্টি ব্যথায় বোবা হয়ে গেছে। আহত হয়েছেন, অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্টে নীল হয়েছেন। প্রিয়জনের ব্যথার আঘাত চিত্রল প্রজাপতির কবিকে এতটাই কষ্ট দেয় যে তাকে বলতে শুনি-

এবং আগুন চেপে রাখার
কতটুকুই বা ক্ষমতা রাখে
একটি নিয়মিত পাহাড়?
.....
অথচ একজন বেদনাবিদ্ধ
মানুষেরই কেবল আছে
সমস্ত আগুন চেপে রাখবার মতো
অসংসক্ত ক্ষমতা।
(আগুন চেপে রাখার ক্ষমতা: নিষণ্ন পাখির নীড়ে)

মল্লিক চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার। প্রয়োজন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনগুলোকে এগিয়ে নেয়ার। তাহলেই তার স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে। আমাদের কর্তব্য পালন হবে আর-

তবুও এ মাটি হবে আরো উত্তম
তবুও এ ঘাটি দেবে আরো উপশম
ভাটি বাংলার আকাশে উঠবে
পূর্ণিমার চাঁদ, শুক্লা দ্বাদশী চাঁদ
জোছনা সরাবে সকল আঁধার
আঁধারের সব বাধ।

লেখক : ইসলামী ছাত্রী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী

www.pathagar.com

নিভে গেল নতুন আলোর বাতিঘর

(প্রিয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই স্মরণে)

মিয়া গোলাম পরওয়ার

মামলার হাজিরায় একদিন খুলনা কারাগার থেকে কোর্টে এলেন এ্যাডঃ শাহ আলম ভাই জানালেন "মল্লিক ভাই ইন্তেকাল করেছে।" ইন্নালিল্লাহ পড়লাম। মনটা ভীষণ আচমকা ব্যাথাতুর ও বিষণ্ন হয়ে উঠলো। কোর্ট শেষে কারাগারে ফিরে মাঝে মাঝে বুক ভেঙ্গে আসে। দু'চোখ হয় অশ্রুবিগলিত। যতই মল্লিক ভাইকে নিয়ে ভাবতে যাই-প্রচন্ড আবেগে গেয়ে উঠি-

"এখানে কি কেউ নেই.....
আল্লাহর পথে জীবনকে বিলাবার
.....
এখানে কি নেই মালেকের মত কেউ-
এখানে কি নেই হামজার মত কেউ-
.....
এখানে কি নেই সালাহদীন সম কেউ
.....
ঐ তো কাফেলা মদীনার পথে
চলেছে দুর্নিবার....
ঐ তো নকীব
হেঁকে যায় শোনো
আল্লাহ আকবর....।

মল্লিক ভাইয়ের সারা জীবনের সৌন্দর্য ছিল বিত্ত বৈভব ও ঐশ্বর্যহীনতা। শয়নে স্বপনে তার জীবন সংগ্রাম ছিল আল কুরআনের সমাজ। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দুর করে তৌহিদের নূর ছড়ানো। এ লক্ষ্যে তিলে তিলে তার জীবনকে তিনি নিঃশেষ করে গেলেন।

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমিও যখন সে নেশায় বিভোর হই, তখন কারা প্রকোষ্ঠ এক অদম্য সাহস নিয়ে মল্লিক ভাইয়ের কণ্ঠে গেয়ে উঠি-

"এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না
আলোয় আলোয় হেসে উঠবে
এ নদী গাতিহীন হবে না
সাগরের পানে শুধু ছুটবে...।
কুয়াশা তো কেটে যায় রোদ উঠলেই
বালিয়াড়ী ভেঙ্গে যায় স্রোত ছুটলেই...।"

এসব স্বপ্ন আর আশা নিয়ে মল্লিক ভাইয়ের মায়াময় চেহারা যখন কল্পনার চোখে দেখি, তখন ভেসে ওঠে ৭৫-৭৬ এর চঞ্চল উচ্ছল আমার জীবনে মল্লিক ভাইয়ের স্মৃতি। মল্লিক ভাইয়ের প্রাণ উজাড় করা মমতাভরা স্নেহ আর ভালোবাসার স্মৃতি। সে স্মৃতি আবেগময়। অনুপ্রেরণার, ঘুম ভাঙ্গানোর সুর ঝংকার। সে স্মৃতি এক দুর্নিবার আকর্ষণে নিজেকে বিলিয়ে দেবার। দৃপ্ত শপথের।

www.pathagar.com

মনে পড়ে কোন এক সকালে আমাকে বাড়িতে না পেয়ে আমার রুমের দরজার শিকলে লটকানো এক টুকরা কাগজে মল্লিক ভাইয়ের লেখা তাঁর কাব্যিক মনের এমন অভিব্যক্তির কথা-
"পরওয়ার ভাই-
এসেছিলাম-
চলে গেলাম-
আপনাকে পেলাম না তাই"।

আমার সাংগঠনিক জীবনে তাঁর আগমন ছিল যাদুর পরশের মত। নিঃশব্দ নীরব প্রচার বিমুখ এ খোদার সৈনিক। মানুষকে কাছে টানতো তার প্রচন্ড আত্মিক শক্তি দিয়ে। আন্দোলনের এক শ্রেণীর নেতা কর্মীরা সারা জীবন তার সান্নিধ্যে ছুটতো যেন কোন দরবেশের আধ্যাত্মিক দীক্ষা পেতে।

ইবনে সিনা হাসপাতালের বেডে অসুস্থ মল্লিক ভাইকে যখন দেখতে গেলাম, আমার সাথে মহানগরী তৎকালীন সেক্রেটারি কালাম ভাইও ছিলেন। আমি বললাম, "মল্লিক ভাই, বাড়ীর গাছের পেয়ারা এনেছি আপনার জন্য।" শোয়া অবস্থায় নড়ে চড়ে আগ্রহ নিয়ে বললেন- "আমি খুব পছন্দ করি, ছোট ছোট করে কেটে দিন।" দিলাম এবং তৃপ্তি সহকারে খেলেন। বেডে মল্লিক ভাইয়ের পাশে বসে অনেক কথা। কথার মধ্যে উদ্বেগ নেই, অসুস্থতার পরিণতি নিয়ে নেই কোন দু:চিন্তা বরং দারুণ প্রত্যয়।

দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য যাওয়া এবং মল্লিক ভাইয়ের শারীরিক বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে সাইফুল আলম খান মিলন ভাইয়ের কাছ থেকে ফোনে খোঁজ-খবর নিতাম। চিকিৎসার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত মিলন ভাই নিজেও মাঝে মাঝে ফোন করে অনেক কিছু জানাতেন। কিডনী ট্রান্সপারেন্ট ও খুলনার সিদ্দিক হেলাল ভাইয়ের ছেলে আহছান উল্লাহর কিডনী দানের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়েও অনেক কথা হতো। এ জন্য শারীরিক উপযুক্ততার অপেক্ষা। আল্লাহ সে অপেক্ষার অবসান করে দিলেন তার দরবারে ডাক দিয়ে। মুহতারাম আমীরে জামায়াত নিজামী ভাই মল্লিক ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম আল্লাহ পাক তার এ বান্দাহকে আন্দোলনের প্রয়োজনে সুস্থ ও কর্মক্ষম করে দেবেন। কিন্তু বান্দাহর কোন ভাবনাই পূরণ হয় না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।

হে আল্লাহ। আমার প্রিয় মল্লিক ভাই গোটাজীবন দিয়ে, তার কণ্ঠ দিয়ে, সুর দিয়ে, মেধা ও প্রতিভা দিয়ে সত্যের যে সাক্ষ্য পেশ করেছেন- তা তুমি কবুল করে নাও। তাঁকে তুমি শহীদদের মর্যাদা দান কর। আমীন।

প্রায় ৩ যুগব্যাপী অপসংস্কৃতির মরণছোবলের মুখে দাঁড়িয়ে সুস্থ ও আদর্শিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করে ফুলে ফলে বিকশিত করে যে মহীরুহ আজ দিগন্ত বিস্তৃত-মল্লিক ভাই তার প্রাণপুরুষ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন নতুন ধারার স্রষ্টা। সর্বনাশা জাহেলি সংস্কৃতির মোকাবিলায় এক নতুন সংস্কৃতির আলো তিনি জ্বালিয়েছিলেন। নতুন আলোর তিনি ছিলেন এক বাতিঘর। নিভে গেল সেই নতুন আলোর বাতিঘর।

মল্লিক ভাই শহীদ বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে একদিন বেলাল ভাইয়ের আম্মাকে সান্তনা জানাবার সময় বলেছিলেন, "এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের পয়লা শহীদ মালেক ভাই, আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পয়লা শহীদ বেলাল ভাই।"

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি "হে আল্লাহ তুমি শহীদ বেলালের উস্তাদ মল্লিক ভাইকে হাকীকি শহীদ হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করো।" আমীন।

লেখক : অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাবেক এমপি

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ মশিউর রহমান খাঁন

কবিতা রচনা আর সংগীত চর্চাসহ সকল কাজের মধ্যে 'সংগঠন' কে এগিয়ে নেয়ার তীব্র স্পৃহা পোষণকারী এক সংগঠক তাঁর নাম কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

জীবনের সকল কাজের মধ্যে সংগঠনকে খুঁজে ফেরা এ যেন এক ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গি। এ যেন আল্লামা মওদুদী (রঃ) এর "দ্বীনই জীবন উদ্দেশ্য" এর বাস্তবরূপ।

জিনি ঢাকাস্থ বাগেরহাট ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ফোরামের বেশ কিছু সদস্যের (যারা এখনও শপথ নিতে পারেননি) প্রতি আফসোস (ক্ষোভ) প্রকাশ, করে তিনি বেদনার সাথে আমাকে বলতেন মশিউর ভাই, ফোরামের মাধ্যমে আমি এদের শপথের কর্মী বানাতে চাই কই তাতো হচ্ছে না? ফোরামের এক নম্বর কাজ হতে হবে ঢাকাস্থ বাগেরহাটের জন শক্তিকে আন্দোলনের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করা আর বাগেরহাটের সংগঠনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান।

স্বভাব সুলভ কণ্ঠে তিনি বলতেন, তাহলেই আমি এই ফোরামের সভাপতি, আর যদি তা না হয় তাহলে ওসব ফোরাম-টোরাম আমার দরকার নেই।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মৃতিচারণের অবকাশ নেই। তাই নিজের সামান্য অনুভূতি প্রকাশ না করে .....

মল্লিক ভাইয়ের নূরানি চেহারার দিকে তাকালেই আমার কেন যেন চোখে পানি এসে যেত।

আজও তার কোন ছবি যদি চোখের সামনে রাখি অথবা মোবাইলের রিংটোনে মল্লিকের কণ্ঠ ভেসে আসে তাহলে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। কেন এমন হয়, তার কারণ আজও আমি খুঁজে পাইনি।

২০০৫ এর কথা। 'প্রত্যাশা প্রাঙ্গন' তখন গজনবী রোডে। আমি এই প্রথম জেলার দায়িত্ব আসার পর) প্রত্যাশায় উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে সে যে কি উৎফুল্লতা? সবাইকে ডেকে ডেকে পরিচয় করানো 'তোমরা সবাই দেখে যাও আমার বাগেরহাটের পীর সাহেব এসেছে। খান জাহানের খলিফা এসেছে। সে যে সম্মোহনী সম্বোধন তা কোনদিন ই ভুলবনা।

যতবার 'প্রত্যাশায়' গিয়েছি আতিথ্য গ্রহণের পর বিদায়ী মোসাফায় হাতের মধ্যে কাগজের উপস্থিতি বুঝতে পেরে অবাক হয়ে জান্নাতি চেহারার দিকে তাকাতেই বলে উঠেছেন 'আমার পীর সাহেব এসেছেন এটা তার হাদিয়া বা নজরানা'। এরকম হাজারো স্মৃতি জমা হয়ে আসে স্মৃতির মনিকোঠায় আর ইসলামী আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঔদাসীন জীবনের মধ্যে সংগঠনের তীব্র চেতনাবোধ আমাকে অবাক করেছে। ভোগ আর মোহমুক্ত জীবনের মধ্যে আন্দোলন আর সংগঠনের তীব্র উপস্থিতি সত্যিই এক ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য।

আজ সময়ের দাবি, জীবনের সকল কর্মকান্ড আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মাঝে আমরা সে অনুভূতিই খুঁজে পাই।

পরিশেষে মহান মালিকের কাছে ফরিয়াদ 'তুমি মল্লিক ভাইকে জান্নাতের পাখি করে দাও'

লেখক : চেয়ারম্যান খানজাহান আলী ট্রাস্ট, বাগেরহাট

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ-দৌলার নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ইতিহাসের চিত্রকে সামনে রাখা প্রয়োজন। কারণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটা সেই ইতিহাসের ধারাবাহিক ফসল।

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ-দৌলার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে যে অপ-শক্তিটি শাসক হয়েছিলো, তাদেরকে ইতিহাসে বৃটিশ শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সকল শক্তির উৎস এবং সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলো বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। বৃটিশ শাসক বা বৃটিশ শাসন এই সাইনবোর্ডটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুর্য্যের নিদর্শন। মূলতঃ শাসন বা শাসক ছিলো খৃষ্টান এবং বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। যাদের এক নামে ব্রাহ্মণ্যবাদীখৃষ্টিয় শাসক চক্র হিসেবে আমরা পরিগণিত করতে পারি। মনে রাখা দরকার তারা কোনো রাজনৈতিক চক্র ছিলো না, তারা ছিলো একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যার নাম 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কোম্পানী নামধারী শাসকগোষ্ঠী সেটাই ছিলো প্রথম এবং শেষ। যদিও পরবর্তীতে শাসক চক্রটি রাজনৈতিক সাইনবোর্ডে পরিচিত হয়। তারা ছিলো উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ডই ছিলো, এদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে। একদিকে ছিলো খৃষ্টানদের ক্রুসেডযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহা অন্যদিকে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে, মুসলমান শাসনে বর্ণহিন্দুদের প্রতিহিংসাপরায়নতা।

ব্রাহ্মণ্যবাদীখৃষ্টিয় চক্র নবাব সিরাজ উদ-দৌলাকে হত্যার পর ক্রমান্বেয়ে মুসলমানদের সকল ভূসম্পত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে কেড়ে নিলো ১৭৯৩ সালে। ফারসি ভাষাকে বিদায় করে ইংরেজিকে করা হলো রাষ্ট্রভাষা। সকলপ্রকার চাকরি এবং ব্যবসা থেকে মুসলমানদের উৎখাত করা হলো। রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা ইসলামী আইনকে (৫০ বছরের মধ্যে) উৎখাত করে তা মুসলমানদের পারিবারিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। রাষ্ট্রীয় আইন করা হলো ইসলাম বিরোধী মতবাদকে ভিত্তি করে খৃষ্টীয় আইন। মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হলো।

মোটকথা রাজার আসন থেকে মুসলমানদেরকে পথের ভিখারীতে পর্যবসিত করা হলো। উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়া। কিন্তু মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য বারবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুধু মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

নয়, সে স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিলো ভারতবর্ষের সকল জনগণ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, শিখ সম্প্রদায় এবং সকল উপ-জাতিদের জন্য। তা ছিলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ। নেতৃত্বে ছিলেন মুসলমানরা, কারণ তারা ছিলেন এক সময়কার শাসক এবং বীরযোদ্ধা। টিপু সলতান, সৈয়দ আহমদ বেরলভী, তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, ফকির মজনুশাহ প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেসব যুদ্ধের। এসব যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন না হলেও তার একটা অনিবার্য ফল ছিলো, তাহলো ব্রাহ্মবাদীখ্রষ্টীয় শাসকচক্র রাষ্ট্রীয় শোষণ, নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্বির্য্য, শক্তি-সামর্থহীন এক ঘুমন্ত দাসশ্রেণীর জাতিতে পরিণত করেছিলো। উল্লেখিত স্বাধীনতাযুদ্ধগুলো সেই জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশে চেতনার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিলো।

সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলতঃ আত্মবিকাশের মাধ্যম, নিজের অস্তিত্বকে অন্যের কাছে নান্দনিকরূপে তুলে ধরার পন্থা। কিন্তু মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা সবদিক দিয়ে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো এবং হচ্ছিলো যে তারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলো। তাই আত্মবিকাশের চিন্তা তাদের মাথায়ই ছিলো না। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ জানান দেয়া এবং আত্মবিকাশের প্রয়োজন হেতু বুদ্ধিবৃত্তিক তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্দোলন শুরু হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির শক্তিমত্তা সম্পর্কে ধারনা ছিলো বলে স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৪ সালে কলকাতায় প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতোটাই উগ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন যে, তখন মুসলমানতো দূরের কথা কোনো হিন্দুকে অর্থাৎ কোনো ভারতীয়কে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য করা হতো না। তবে স্টুয়ার্ট মিল, বার্ক, বেকন, হেগেল, বেনথাম, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর চিন্তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে নব্যশিক্ষিত হিন্দু সমাজে যেরূপ ইয়ং বেঙ্গল দলের উদ্ভব হয়েছিলো সেরূপ কোনো প্রগতিশীল ও বন্ধনমুক্ত দল বা গোষ্ঠী মুসলমান সমাজে গড়ে ওঠেনি।' (উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা–ওয়াকিল আহমেদ।)

তবে ১৮৫৫ সালে ৬ মে 'আন্‌জুমানে ইসলামী' নামে ভারতে মুসলমানদের প্রথম সংগঠন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ২৩ দিন পর 'সোমপ্রকাশে' (২৯ মে ১৮৫৫) 'মুসলমানদের সভা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়– 'নগরবাসি সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বন্ধনার্থে এক সভা (সংগঠন) স্থাপন করিয়াছেন, ... ইংরাজ ও বাঙালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাহাদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মন্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে; কিন্তু কি পরিতাপ! যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোনো প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, ... এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোনো কোনো প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কোনো প্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম; অধুনা নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমাদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন। (উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা–ওয়াকিল আহমেদ।)

উপরোক্ত মন্তব্য জানার পর সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনের শক্তিমত্তা সম্পর্কে আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। ১৮৫৫-র পরবর্তীকালে কলকাতা শহর শুধু নয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাতে অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে উক্ত সময়ে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন পর্যায়ক্রমে মীর মশাররফ হোসেন, মাওলানা আকরম খাঁ, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী, কায়কোবাদ, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহীম, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, মুন্সী মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শেখ জমিরুদ্দীন, সৈয়দ এমদাদ আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখ। (উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা–ওয়াকিল আহমেদ।)

এর পরেও শাসক গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত সময় পর্যন্ত এটাই প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, বাংলা সাহিত্য মানেই হিন্দু বাংলা সাহিত্য। 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার সাফল্যের মাপকাঠি ছিলো হিন্দু কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের অনুকরন-অনুস্মরণে সাফল্যের কৃতিত্ব। কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান ছিলো না।' (আমার আত্মকথা– আবুল মনসুর আহমদ।)

সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসিমুদদীন, শিল্পী আব্বাস উদ্দীন, কবি ফররুখ আহমদ, সঙ্গীতজ্ঞ কে মল্লিক, কবি সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, কবি মাহফুজুল্লাহ, আল মাহমুদ প্রমুখদের পাই মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রের নায়ক হিসেবে। যাদের সৃজনশীলতার স্পর্শে সাধারণ মুসলমান থেকে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত প্রেরণা পান।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয়। 'দৃশ্যতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশ ভাগ হইয়াছে মনে হইবে। কিন্তু এর গভীরে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এ বিভাগের আসল কারণ ছিলো কৃষ্টিক। বিশ শতকে এটা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাজনৈতিক পরাধীনতা মানব-মনের যে ক্ষতি করে, কৃষ্টিক পরাধীনতা ক্ষতি করে তার চেয়ে অনেক বেশি।' (আমার আত্মকথা– আবুল মনসুর আহমেদ।)

নবাব সিরাজ উদ-দৌলা থেকে এই পর্যন্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ভিত্তি গড়ে উঠেছে তার ওপর কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কর্মধারাকে বিশ্লেষণ করতে পারলে তার চিন্তা-চিন্তনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে বলে মনে হয়। মুসলমানদেরকে সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে যে চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায় কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাকে স্বাগত জানালেও তাঁর চিন্তা-চেতনার সাথে সেসব সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও তিনি নিজে কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ ও আব্বাস উদ্দিনের ইসলামী কবিতা ও গান ভালোবেসেছেন, আবৃত্তি করেছেন এবং নিজের দরদী কণ্ঠে তা পরিবেশনও করেছেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে ইসলামী গানের প্রেরণা পেয়েছেন। তবে কবি রাজনীতির মতো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্বেকার সকল কবি-সাহিত্যিকদের যে সংগঠন প্রক্রিয়া ছিলো তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিধায় বারবার সেসব সংগঠন ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের রচনার যে সদূরপ্রসারী শক্তিমত্তা ছিলো তা রাজনৈতিকভাবে স্থায়ী অবদান রাখতে পারেনি। বিক্ষিপ্তভাবে

www.pathagar.com

জনগণের চেতনা জাগ্রত হয়েছে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদসহ সকল ইসলামী কবিতা ও গানকে সাংগঠনিক মর্যাদায় ফিরিয়ে এনে সেগুলোকে আরো বেগবান করতে সমর্থ হন। এছাড়াও নাস্তিক্যবাদী, বস্তু বা ভোগবাদী কবি-সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়ে তিনি বলতেন, 'চরম বস্তুবাদী বা নাস্তিক্যবাদীদের রচনাও আমার সংগ্রহে থাকবে, তার ভিতর থেকে যা কল্যাণকর তা গ্রহণ করবো, যা নয় তা বর্জন করবো।' 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' মুমিনদের হারানো বস্তু যদি অমুসলিমদের কাছেও তা পাও অর্জন করো।' –এই হাদিসটিকে তিনি স্মরণ করতেন।

১৯৫৬ সালে পহেলা মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাগেরহাট জেলার বারুইপাড়া গ্রামে। পরিবারটি ছিলো সংস্কৃতিবান। পিতা মুন্সি কায়েম উদ্দিন ছিলেন একজন কবি। তিনি জারিগান রচনা করতেন। কবির চাচারা সেসব গান বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পরিবেশন করতেন। কবির মা কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। কবির বড় ভাই কবি আহমেদ আলী মল্লিক একজন নামকরা কবি (প্রকাশিত গ্রন্থ চারটি)। তাঁর এলাকাটি ছিলো কাব্যময়, গাছ-গাছালীর ছন্দময় আলো-আঁধারী, পাখির কণ্ঠ ঝংকার, নরম বাতাসে দোলা সবুজ ধানের বিল, খাল। অতএব কবি মল্লিকের মন-মস্তিস্কে কাব্য এবং শিল্পপ্রতিভা স্থান গেড়ে বসবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁর কণ্ঠছিলো অসাধারণ সারল্যে ভরা, মিষ্টি ও দরদী। শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে এবং বানানে তিনি ছিলেন সর্বদাই সতর্ক। সাহিত্য-সংস্কৃতির নেতৃত্বের এটা একটা মহতগুণ। কিছুটা শিশুর সহজাত এবং হৃদয় থেকে উত্থিত প্রেমমাখা আধোভাঙা স্বরে তিনি কথা বলতেন। যা শ্রোতার অন্তরে গেঁথে থাকতো। তাঁর হাসি ছিলো অসাধারণ মিষ্টতায় ভরা। এই যে মানুষটি, তাঁর ভিতরে মহান আল্লাহতালা যে শক্তির সঞ্চার করেছিলেন, সে শক্তি ছিলো একটা নেয়ামত এবং রহমত। যা পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা এবং সাধনা কবি মতিউর রহমান মল্লিক করে গেছেন।

তিনি দার্শনিক কবি শহীদ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর ভক্ত ছিলেন, অন্যদিকে দার্শনিক কবি মহাকবি ইকবালের কাব্য প্রতিভার অনুসারী ছিলেন। তিনি মাওলানা মওদূদী রা.-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফহিমুল কুরআন এবং তাঁর রচিত সাহিত্য ভান্ডার থেকে অফুরন্ত জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ইতিহাস তাঁর সামনে ছিলো।

কিশোর বয়সেই তাঁর সংগীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিলো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে কবি মল্লিক সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রথম দিকে তিনি নিজে গান রচনা করতেন, সুর করতেন এবং নিজেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃত 'ইসলামী ছাত্রআন্দোলন'-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব মীর কাসেম আলী। পরবর্তীতে অধ্যাপক গোলাম আযমের সম্মতিতে কবিকে তিনি ঢাকায় নিয়ে আসেন, ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৭-এ 'সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী' গঠনের মাধ্যমে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে পূর্ণভাবে একীভূত হন কবি। সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী গঠনে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের সংস্কৃতিমনা কর্মী, সাথী অথবা সদস্যবৃন্দ, যাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিলো তাঁদের মধ্যে জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, জনাব আবদুল

www.pathagar.com

হালিম, জনাব লোকমান হোসেন, জনাব নজরে মাওলা, জনাব তাফাজ্জল হোসেন খান, জনাব আখতার হোসেন, শিল্পী আবুল হোসেন, ইঞ্জিয়ার রাশিদুল হাসান প্রমুখ। শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার হাল ধরেছিলেন ড. মিয়া মোহাম্মদ আইউব। উল্লেখ্য 'সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী'র নামকরণ করেছিলেন ড. মিয়া মোহাম্মদ আইউব। এই শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পেছনে জনাব এটিএম আজাহারুল ইসলাম, জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, জনাব আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের-এর বিশষ অবদান ছিলো বলে কবি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের ভূমিকা' –কবি মতিউর রহমান মল্লিক।)

উনিশশতকের মাঝামাঝি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুসলমানদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য এবং কাব্য-সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে যথার্থ ইসলামের ভিত্তিতে যা, তাছাড়া বাকি সব সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের চিন্তা-চিন্তনের ব্যাপক পার্থক্য ছিলো। কবি মনে করতেন ঐ সময়ের জন্য ঐসব সংস্কৃতি এবং কাব্য-সাহিত্যের হয়তো প্রয়োজন ছিলো কিন্তু সেসব পূর্ণভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেনি। বরং বহু ক্ষেত্রে বিকৃত করেছে। যার কারণে পূর্ণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম বিঘ্নিত হয়েছে এবং আজও তার কুক্রিয়া অব্যহত রয়েছে।

'.... যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে, তার সামনে নিজের ইচ্ছা, শক্তি ও স্বাধীনতাকে সমর্পণ করেছে, সর্বপরি নিজের জীবনকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক পরিচালনার জন্য নিজেকে বাধ্য করেছে, সত্যিকার অর্থে এ ধরনের ব্যক্তিই হচ্ছে মুসলমান। ... এ সমর্পণ করার নামই ইসলাম।' (উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান –মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর রা.।)

কবি মতিউর রহমান মল্লিক উক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে নিজের সকল প্রকার যুক্তিগত দিক দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন বলে তাঁর মুসলিম সাহিত্য, কাব্য বা সংস্কৃতি বলতে আলাদা কোনো বিষয় ছিলো না। বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যাবস্থার আলোকে প্রত্যেক মুসলিম তার জীবন নির্বাহ করবে এটাই ছিলো তার স্বপ্ন এবং এরই জন্য তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগ্রাম। তাঁর চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়–

'দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ
রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কোরানের রাজ।
কোটি কোটি মানুষ যেথায় বঞ্চিত রে বঞ্চিত
বাতিল মতের জিন্দানে হায়! লাঞ্ছিত রে লাঞ্ছিত।

অন্য একটি গানের অংশবিশেষ–

'মানুষের গড়া যতো মতবাদ
দলে পিষে পায়ে করি বরবাদ।
পতাকায় আজ আঁকতেই হবে
শাশ্বত কোরআন।

এরকম বিষয় এবং বক্তব্য সম্পর্কিত অসংখ্য চয়ন তিনি রচনা করেছেন তার কবিতায় ও গানে। কবি মনে করতেন নবাব সিরাজ উদ- দৌলার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য মুসলমানদের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিলো তা যথার্থ হলেও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম হয়েছে তা যথার্থ ছিলো না। একদিকে সৈয়দ আমহদ বেরলভি, তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, ফকির মজনু শাহ প্রমুখ সংগ্রাম করেছেন মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য তাদের সেই সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উপদান হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো প্রেরণা ছিলো না। পৃথিবী ব্যাপী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে রাজনৈতিক যুদ্ধকে প্রেরণা যুগিয়েছে কিন্তু ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ব্যাপারে সেটা ঘটেনি। অন্যদিকে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন যখন তৈরি হতে থাকলো তখন এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিলো না যা ঐসব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে পৃষ্টপোষকতা করবে। সাংগঠনিক সাহায্য সহযোগিতা না পাবার কারণে সে সময়কার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো জনগোষ্ঠীর সংগে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। পরিণামে জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা শক্তিশালী হয়নি। মনে রাখা দরকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের অন্তর্লোকের চিন্তাকে বলিষ্ঠ করা সবল ও পুষ্ট করা। জনগণের মানসিক চাহিদার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক চর্চা কোনো ক্রমেই মুসলমানদের পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো কোনো ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি বরং ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতিকে তারা অবাধে প্রচলন করেছে। সেই সুযোগটা ইসলাম বিরোধী চক্র (মুসলিম নামধারী) কাজে লাগিয়েছে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈতিক অবৈধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছ, তাদের চিন্তাধারাকে বিকৃত করেছে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিষয়টির গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ি সঠিক ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। তিনি আজীবন সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতা, সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা এবং সাংগঠনিক পরিচর্যার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলনের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর কর্মধারা ছিলো রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ ঘটানো যা জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনাকে বলিষ্ঠ করবে। তিনি বলতেন- 'আলাদা ভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই বরং ইসলামী সংস্কৃতিই হলো রাজনীতি।'

বর্তমানকাল পর্যন্ত সংগীতে, সাহিত্যে, টিভিতে, নাটকে বা সিনেমায় যা চলে আসছে 'মুসলিম অধ্যুষিত' তকমা আটা দেশটিতে, তাতে মুসলিম নামক আদর্শকে বিকৃত পন্থায় বিশ্ববাসির কাছে তুলে ধরা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের নাটক, সিনেমায় মুসলিম মহিলাদেরকে মুসলিম বেশে উপস্থাপিত করা হয়নি বা করা হয় না। তাদের কার্যক্রমও মুসলিম আদর্শের পরিপন্থি। নাটক সিনেমার বক্তব্যে যুগ যুগ ধরে যুবক যুবতিদেরকে অবৈধ প্রেমের নানারকম কৌশল শেখানো হয়। বিশ্ববাসী মনে করে এটাই বুঝি মুসলমানিত্ব বা মুসলিম আদর্শ। যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যকে পদদলিত করা হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশের পটভূমিতে সংস্কৃতির জননী সিনেমা নাটকের এই রূপ বরং কোনো কেনো ক্ষেত্রে আরো উগ্র, আরো সুস্থ মনন ধ্বংসকারী। মঞ্চতো আরো ভয়াবহ, সেখানে যাত্রার নামে, বিচিত্রা অনুষ্ঠানের নামে যা প্রদর্শন করা হয় তা কখনো একটি কল্যানকামী সুস্থ্য মানসিকতার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে খাপ খায় না। যদিও সেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনাকে শক্তিশালী করে চলেছে এবং সেসব অনুষ্ঠানও শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক সেইসব চাকচিক্যময়, তরুণদের কাছে আকর্ষণীয়, ইন্দ্রীয় রসে ভরপুর নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপরীতে শুরু করলেন 'ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'। 'ইসলামী' শব্দটা কবি ইচ্ছে করেই জুড়ে দিতেন। 'অশ্লীল সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি'– কথাগুলো ঠিক নয়, সংস্কৃতি নিজেই একটা সুন্দরতম পরিচয় বহন করে। কিন্তু সংস্কৃতির পবিত্রতাকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য তিনি 'ইসলামী' শব্দটা জুড়ে দিতেন। (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের ভূমিকা' –কবি মতিউর রহমান মল্লিক।)

ইসলাম বহির্ভূত চাকচিক্যময় অনুষ্ঠানের বিপরীতে চাকচিক্যবিহীন ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা কম সাহসের কাজ নয়। কিন্তু কবির সে সাহস ছিলো। কারণ সাহসের জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। কবি জানতেন মুমিনরা কখনোই আনন্দ পাবেন না ইসলাম বহির্ভূত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে। বরং প্রত্যেক মুমিন আনন্দ পাবেন সেই অনুষ্ঠান দেখেই যে অনুষ্ঠান শুধুমাত্র আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টির জন্য উপস্থাপন করা হয়। [কমিউনিস্টরা আগে দর্শক তৈরি করে নেয় এবং তাদের দর্শক তৈরির নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে।] কবি জানতেন ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দর্শক মূল সংগঠন আগেই তৈরি করে রেখেছে। তাদের মানসিক চিন্তাকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রয়োজন ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ব্যর্থ হবে না। মানুষকে সাংস্কৃতিবান ও মানুষের কাছে ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে, পাশাপাশি বিরোধী সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল থেকে প্রজন্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কবিসহ আরো কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী'। ১৯৭৭ সাল থেকে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে কার্যক্রম শুরু হয় তারই ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা ছাড়াও বিভিন্নস্থানে অসংখ্য শিল্পী সংগঠন যেমন প্রতিষ্ঠা পেলো, তেমনি অসংখ্য গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর আবির্ভাব ঘটলো। (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের ভূমিকা' –কবি মতিউর রহমান মল্লিক।)

কবির রচনা থেকে জানা যায়, উক্ত সকল সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সেই সময়কার দূরদর্শী এবং নেতৃত্বের সর্বগুণে গুনান্বিত ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃবর্গ। তিনি আরো লিখেছেন, 'একথা স্বীকার করতেই হবে যে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজকে সারা বাংলাদেশে যে নব-উত্থিত শক্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে তার মূল প্রেরণা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ছাড়া অন্যকোনো সংগঠন নয়।' (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনঃ ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের ভূমিকা' –কবি মতিউর রহমান মল্লিক।)

কবি ইসলামী সংস্কৃতিকে এমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যেমনভাবে করা উচিৎ এবং যৌক্তিক। তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য মূল সংগঠনকে নেয়ামক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কেনো আদর্শিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। বরং পরিবেশ পরিস্থিতির তাড়নায় উজ্জিবিত কতক লেখক বা কবি তৈরি হতে পারে কিন্তু ইসলামের চিরন্তন শ্বাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য পিতৃভূমিকার মতো সংগঠনের ভূমিকা থাকা আবশ্যক।

www.pathagar.com

কবি দেখলেন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্পর্কে নেতৃবর্গের চিন্তাভাবনা বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্বপূর্ণ, কবি সযত্নে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে পরম শ্রদ্ধেয় সেইসব নেতৃবর্গকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন সাংস্কৃতিক নেতার অফুরন্ত উৎসাহ, প্রেরণা এবং সহযোগিতা পেয়ে কবি দেশ এবং বিদেশে ইসলামী সংস্কৃতির রূপ তুলে ধরতে পেরেছেন। বিপুল সংখ্যক ভক্ত-অনুরক্ত সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এটা কবির ব্যাক্তি প্রতিভার স্বার্থকতা। কিন্তু তাঁর যে চিন্তা-চেতনা, তাঁর যে জ্ঞান-গবেষণা এবং তাঁর সারা জীবনের প্রচেষ্টা-পরিশ্রম ও সাধনা তখনি স্বার্থক হবে যখন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্থান করে নেবে। এক্ষেত্রে কবির ভক্ত-অনুরক্তদেরকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে কবি প্রদর্শিত সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ অনুসারে। প্রথাগতভাবে শুধুমাত্র কবির জন্মদিন বা মৃত্যুদিবস পালনের মধ্যে বা কবি বন্দনার মাধ্যমে কবির স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

কবি বলতেন সাহিত্যের আন্দোলন ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্ভব নয়। এই জন্য সারা দেশে কবি-সাহিত্যিক সৃষ্টির পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ম্যাগাজিন, লিটলম্যাগ, বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা প্রকাশে ব্যাপারে কবির ভূমিকা অসাধারণ। এই ভূমিকার কারণে ইসলামী কবিতা, গল্প এবং অন্যান্য সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সংগীত রচয়িতাও তৈরি হয়েছে অনেক।

শুধুমাত্র সাহিত্য, কবিতা ও সংগীত চর্চা নয়, কবি ইসলামী চিত্রকলা, নাটক, সিনেমা, শিশু-কিশোরদের চিত্রকলা, আবৃত্তি, বক্তৃতা অনুশিলন, অভিনয়, মঞ্চাভিনয়, মিডিয়া সাংবাদিকতা, উপস্থাপনা, বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ– অর্থাৎ সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। রূপরেখা তৈরি করেছেন। ম্যাগাজিন ও পত্রিকা প্রকাশের কথা বলেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিতভাবে সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং আলোচনা সভার আয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একজন সাংস্কৃতিক কর্মীকে অবশ্যই ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর তার সহজ পদ্ধতি হলো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনাসভা এবং মতবিনিময়।'

কবি নিয়মিতভাবে নাটক প্রদর্শনীর কথা বলেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক শিল্পী ও সাহিত্যিককে তার কর্মের জন্য সম্মানী প্রদানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর আক্ষেপ ছিলো যে, বিত্তবানরা নানাবিধ কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকে অথচ যে শিল্পী তাঁদের মনোরাজ্যে সত্যচিন্তার উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তাদের অন্তরকে পবিত্র আনন্দে ভরে তুলছে, তাদেরকে অর্থ প্রদানের বিষয়ে তাঁরা কার্পন্য করেন। এটা উচিৎ না। একটা ক্যাসেট প্রকাশ করা বা একটা নাটক মঞ্চস্থ বা প্রোডাকশন করা ইসলামিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে থাকে। তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক সভার শুরুতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার কথা বলেছেন। (বিষয়টি তিনি ভারত সফরের সময় সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের জনসভা দেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। সেখানকার জনসভায় প্রথমে শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তারপরে নেতাদের ভাষণ শুরু হয়। সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের কারণে দর্শকদের মনস্তাত্ত্বিকতায় নেতাদের প্রতি, সংগঠনের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা বোধটা শক্তিশালী হয় কারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানব মনে প্রেমবোধ তৈরির এক অনন্য হাতিয়ার।)

প্রতিটি বিভাগে, জেলায় ও বড় বড় শহরগুলোতে ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের কথা বলেছেন। আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র প্রশিক্ষত লোকই আনুগত্য প্রকাশ করে নির্ভুলভাবে সাংগঠনিক নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বিত্তবানদের স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন। (এ ছাড়া আন্তর্জাতিক নাটক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরিতে প্রবন্ধ লেখকের সাথে ঐক্যমতপোষণ করে একটি রূপরেখা তৈরি করতে বলেছিলেন। যথাসময়ে তা তৈরিও হয়েছিলো। কিন্তু অর্থের যোগান না হওয়ায় সেটা স্থগিত হয়ে যায়)। তিনি মনে করতেন বিদেশে আদর্শিক সংগঠনের যতো জনশক্তি আছে সবাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে চান। সেসব অনুষ্ঠানে তাঁরা তাঁদের বিদেশী বন্ধুদেরও নিয়ে যেতে চান। ইসলামি আদর্শের সৌন্দর্য এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সৌন্দর্য উপস্থাপনায় শিল্পীদের মহান দায়িত্বের অর্ন্তভুক্ত। আর সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতার বিকল্প নাই।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক শুধু কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সুরকার, গীতিকার বা কণ্ঠশিল্পী ছিলেন না। ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক ও বিশাল পরিসরে এগুলো তার বড় পরিচয় নয়। পলাশীর পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের কবি- লেখক ও শিল্পীদের সংগঠিত করা হয়নি, সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের পরিচর্যার কোনো উপায় ছিলো না। যে কারণে অমুসলিম সাহিত্য সংস্কৃতি এদেশের বেশিরভাগ মুসলমানদের মন-মস্তিস্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, এরা চোখ মেলে আর অন্য দিকে তাকাতে চায় না। এই সংস্কৃতির সাথে তাল রেখে এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এদেশের বেশিরভাব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনীতিকে শক্তিশালী করেছে। পক্ষান্তরে ৭০ দশকের পর থেকে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের মাধ্যমে যে ইসলামী সাংস্কৃতিক চর্চা এদেশে শুরু হয়েছে, স্বল্প পরিসরে হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক অকল্পনীয় পরিশ্রম করে, অসাধারণ মেধা আর প্রতিভার মাধ্যমে, গবেষণা ও সাধনা করে ইসলামী সংস্কৃতির যে কাঠামো তৈরি করেছেন, তাতে ইট সিমেন্ট মাখিয়ে যে বিল্ডিং করেছেন তাকে টিকিয়ে রাখা, বহুতল করা এবং আরো সৌন্দর্য মন্ডিত করার দায়িত্ব যেমন মূল সংগঠনের তেমনি ইসলাম অনুসারি সকল মুমিনের এবং কবি ভক্তদের। তাহলে হয়তো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সকল চেষ্টা, শ্রম ও সাধনা সফলতা পাবে এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরো গতিশীল ও বেগবান হবে। আল্লাহ আমাদের সেই মঞ্জিলে পৌঁছার তৌফিক দান করুন।

এই মহান সাংস্কৃতিক নেতার মাগফেরাত কামনায়...

লেখক : উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র

www.pathagar.com

আশির দশক ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক

আসাদ বিন হাফিজ

ছাত্রজীবনে একটানা সাত-আট বছর মল্লিক ভাইয়ের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার সুবাদে মল্লিক ভাইকে কাছ থেকে দেখার এক বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অনেক তিক্ত-মধুর সম্পর্কের স্মৃতি জমা হয়ে আছে এই বুকে। আমাদের সম্পর্কটা নেতা-কর্মীর নয়, ছিল বন্ধুত্বের। আমাদের মিরহাজীর বাগের সেই বেড়ার ঘরে বহুদিন আমরা একত্রে রাত্রি যাপন করেছি, এক বিছানায় ঘুমিয়েছি। মাসের পর মাস সেই ঘরে দু'জনের খাবার রেখে ভাবীসহ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর রাতে বাসায় ফিরে সেই ঠান্ডা ভাত দু'জনে ভাগাভাগি করে খেয়েছি। সকালে ফজর পড়ে হয়তো লুঙ্গ পরেই আমরা হাঁটতে বেরিয়েছি বা কারো সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগে বেরিয়েছি, এসে দেখি ভাবী দু'জনের ময়লা কাপড়গুলো ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় যাকে বলে 'হরিহর আত্মা' আমরা ছিলাম তাই। লোকজন আমাদের ডাকতো 'মানিকজোড়' বলে। আমাদের নাম দুটো সব সময় এক ব্রাকেটে উচ্চারিত হতো। যেখানে আসাদ আছে সেখানে মল্লিক থাকবেই, আর যেখানে মল্লিক আছে সেখানে আসাদও থাকবে, এটাই ছিল স্বতসিদ্ধ বিষয়। আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনও এটা জানতো এবং যখন-তখন আমার সাথে সে বাড়িতে মল্লিক ভাইয়ের উপস্থিতিতে কেউ অবাক হতো না।

ছাত্রজীবন শেষ করে আমি তামিরুল মিল্লাতে অধ্যাপনা শুরু করলাম। সংগঠন বললো বিআইসিতে জয়েন করতে হবে। মল্লিক ভাই আগেই বিআইসিতে জয়েন করেছিলেন। বিআইসি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা কলম দেখাশোনা করতেন মল্লিক ভাই, আমাকে দেয়া হলো গবেষণা পত্রিকা পৃথিবী দেখার দায়িত্ব। আবারও এক অফিস, এক ঠিকানা। অফিসিয়ালি আবদুল মান্নান তালিব কলমের সম্পাদক আর জনাব এ. কে. এম নাজির আহমদ পৃথিবীর সম্পাদক থাকলেও সম্পাদনার মূল কাজ করতে হতো আমাদেরই। লেখকদের কাছে থেকে লেখা সংগ্রহ, সম্পাদনা, প্রেস যোগাযোগ, প্রুফ দেখা সবই করতে হতো এক হাতে। সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলে সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে প্রিন্টঅর্ডারও দিতাম আমরাই। বাংলাবাজারে 'মনোরম প্রেস' নামে একই প্রেসে ছাপা হতো কলম ও পৃথিবী। আমরা কেবল অফিসিয়াল দায়িত্ব হিসেবে নয়, আন্দোলনের স্বার্থ সামনে রেখেই এ কাজ আঞ্জাম দিতাম। এ কাজের কোন টাইমটেবল ছিল না। এই লেখকের বাসায় যাওয়া, ওই লেখকের বাসায় যাওয়া, তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি, তাদের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, অফুরন্ত কাজ। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের ভাইয়েরা কে কি লিখবে, আন্দোলনের জন্য এ মুহূর্তে কোন বিষয়ে লেখালেখি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা, সেই

www.pathagar.com

দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া, সময়মত সে লেখা জমা দেয়ার জন্য বার বার তাগাদা দেয়া, ঢাকার বাইরের লেখকদের সাথে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ, কাজের কি কোন শেষ আছে? এরপর আছে আরো কাজ। অফিসের কাজ শেষ হলে আমরা বসতাম সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে। শুরু হতো নানা চিন্তা-গবেষণা, আলাপ-আলোচনা এবং তা বাস্তবায়নের কাজ। এর কিছুদিন পর কলমের পাশাপাশি সাপ্তাহিকে সোনার বাংলার সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বও পান মল্লিক ভাই। ফলে লেখকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির এক অবারিত দ্বার খোলা ছিল আমাদের সামনে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো আসলেই ছিল অনেক মধুর ও স্বর্ণালী। প্রাণের প্রবাহে সজীব ও উদ্দাম।

এর কিছুদিন পর আ.জ.ম ওবায়েদুল্লাহ ও মাসুমুর রহমান খলিলী খুলে দিলেন আরো এক নতুন দ্বার। জন্ম নিল কিশোরকণ্ঠ। ওবায়েদ ভাইয়ের তাড়নায় বিনা পারিশ্রমিকে মাসের পর মাস কিশোরকণ্ঠ সম্পাদনা করে দিয়েছি। কেউ একজন জমা লেখাগুলো বাসায় দিয়ে যেতো, সম্পাদনা শেষে আবার তা পাঠিয়ে দিতাম কিশোরকণ্ঠের ঠিকানায়। ওবায়েদ ভাইয়ের নির্দেশে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু না কিছু লিখতেও হতো। এরপর অভিন্ন স্বপ্ন নিয়েই তিনি বের করলেন আরো একটি পত্রিকা, মাসিক অঙ্গীকার ডাইজেস্ট। সেখানেও লিখতে হতো পরিকল্পিতভাবে। এভাবেই কাটছিল ব্যস্ত সময়। কলম, পৃথিবী, সোনার বাংলা, কিশোরকণ্ঠ, অঙ্গীকার ডাইজেস্ট সবটাতেই আমরা মিলেমিশে সময় দিয়েছি, পরস্পর পরামর্শ করেছি, একে অন্যের সহযোগিতা করেছি, আর এসবই করেছি একটি সফল সাহিত্য আন্দোলনের স্বপ্ন ও সংকল্প নিয়ে। এমনকি দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য পাতা এবং মাসিক ফুলকুঁড়িতে যেন আমাদের ভাইদের লেখা বেশি করে ছাপা হয় সে জন্য নিজেরা লেখা সংগ্রহ করে তা সাজজাদ হোসাইন খান ও জয়নুল আবদীন আজাদ বা শরীফ আবদুল গোফরান ভাইয়ের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। সাহিত্য আন্দোলনের জন্য পত্রিকা হাতে থাকাটা যে কত জরুরি সে সময় আমরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। বিপরীত উচ্চারণ ও পরে বাংলা সাহিত্য পরিষদের মতো সংগঠন আর ওইসব পত্রিকা ছিল বলেই আশির দশকে ইসলামী আন্দোলনের সপক্ষে একদল কলম সৈনিক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল, যাতে মূখ্য ভূমকা রেখেছিলেন মল্লিক ভাই।

আশির দশক নিয়ে এ দেশের ইসলামী আন্দোলন যুগ যুগ ধরে গর্ব করতে পারবে বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে নতুন করে ইসলামী ধারা প্রবর্তন করার জন্য। কিন্তু সেই ধরাবাহিকতা পরবর্তীতে আর বজায় থাকেনি, কারণ আন্দোলন সম্পর্কিত লোকগুলো দাওয়াতী কাজের উপযুক্ত জায়গা থেকে ছিটকে পড়েছিল মল্লিক ভাই বেঁচে থাকতেই। কার্যকারণ যাই থাক না কেন, সাহিত্য আন্দোলনের জন্য পত্রিকা হাতে থাকাটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকতেই সেটা মল্লিক ভাই টের পেয়েছিলেন তীব্রভাবে। যে সোনার বাংলা ও কলম দিয়ে সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন মল্লিক ভাই এক সময় সেখান থেকে সরে এলেন তিনি। আমি বেরিয়ে এলাম পৃথিবী থেকে। আ. জ. ম ওবায়েদুল্লাহকে খুঁজে পাওয়া গেল না কিশোরকণ্ঠের বারান্দায়। মল্লিক ভাইয়ের পর সোনার বাংলায় এসেছিলেন কবি সোলায়মান আহসান। কিন্তু তিনিও বেশিদিন থাকলেন না। অভিমানী সোলায়মান আহসান সোনার বাংলা থেকেই শুধু বিদায় নিলেন না, আন্দোলনে তার যে সক্রিয়তা ছিল সেখানেও ভাটা

www.pathagar.com

পড়লো। এসেছিলেন বুলবুল সরওয়ার, সেও একদিন সরে দাঁড়াল। এভাবে আস্তে আস্তে সাহিত্য আন্দোলনে যারা সক্রিয় ছিলেন তারা সবাই ছিটকে পড়লেন পত্রিকার জগত থেকে। এ অবস্থার আর পরিবর্তন ঘটেনি। এখন যারা সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সব 'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার।' তাদের হাতে কোন পত্রিকা নেই। লেখকদের কাছে যাওয়ার সূত্র বা মাধ্যম ছিল এই পত্রিকা। এই সূত্র হারিয়ে যাওয়ায় ভাটা পড়লো দাওয়াতী কাজে। লেখকদের কাছে টানার মাধ্যম না থাকায় তারা যেমন যখন তখন লেখকদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পান না, লেখকরাও তেমনি তাদের কাছে আসার কোন প্রয়োজন বা গরজ বোধ করেন না। অবস্থাটা এখন এমন যে, লড়াকু সৈনিকরা ময়দান চষে বেড়ায় অস্ত্রহীন অবস্থায়, আর যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা ময়দানে আসার সময় পায় না। ফলে নতুন লেখকরা হাসান আলীম, মোশাররফ হোসেন খান, নাসির হেলাল, শরীফ আবদুল গোফরান বা গাজী এনামুল হকের মতো আর শপথের কর্মী হতে পারল না। এভাবেই কেটে গেল গত দুটো দশক এবং এখনো তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নতুন লেখকরা এখন শপথের কর্মী হতে ভয় পায়। কারণ, শপথের কর্মী হলে বাইরের ময়দানে তারা থাকবে বস্ন্যাকলিস্ট হয়ে আর ভেতরে তাদের অবস্থা হবে 'ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর।' অবশ্য তাদের ভাষাটা আরো কঠোর। তারা বলে, শপথ যতদিন না নেবে ততদিনই নাকি তাদের কদর থাকবে, শপথ নিলে রুদ্ধ হয়ে যাবে লেখা প্রকাশের পথ। শপথহীনেরা তখন ছড়ি ঘুরাবে তাদের মাথার ওপর। ফলে ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন এখন একটি কঠিন বন্ধ্যা সময় অতিবাহিত করছে।

আবারো মল্লিক ভাইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মল্লিক ভাইয়ের ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা, স্বপ্ন-কল্পনা সবটা জুড়েই ছিল আন্দোলন। এর বাইরে তিনি কিছুই বুঝতেন না, বুঝার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। তার সবকিছুই আবর্তিত হতো সংগঠন ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। আর এ কাজকে সফল করার জন্য তার ছিল নিজস্ব টেকনিক ও পদ্ধতি। ছাত্র আমলেই তিনি এ অঙ্গনের কাজকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করে অঘোষিতভাবেই তার দায়িত্বও ভাগ করে নিয়েছিলেন। গান তথা সংস্কৃতি অঙ্গনটা দেখতেন মল্লিক ভাই আর সাহিত্য অঙ্গনটা দেখার দায়িত্ব তিনি আমার কাঁধে তুলে দিয়ে স্বস্তি পেতেন। মনে হয়, তিনিই আমাকে ঢাকা মহানগর শিবিরের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক করতে সংগঠনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনিই আমাকে তখনকার জাতীয় সাহত্যি সংগঠন বিপরীতের সেক্রেটারি বানিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে সাইমুমের সভাপতি করেছিলেন, বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থাপক হওয়ার পেছনেও হয়তো তারই ভূমিকা ছিল, এমনকি হয়তো তারই হাত ছিল পৃথিবীতে ডাকার ব্যাপারেও। আর এ সবই ছিল আমার প্রতি তার স্নেহ ও ভালবাসার নিদর্শন। আশির দশকের আমরা যারা তার স্বপ্নের দোসর ছিলাম, তাদের মধ্যে থেকে এভাবেই তিনি আমাকে তার একান্ত কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় আশির দশক নতুন করে যে ইসলামী ধারার সৃষ্টি করেছিল, এভাবেই তার কেন্দ্রবিন্দুতে আমাকে তিনি তুলে এনেছিলেন।

লেখক : কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক

www.pathagar.com

আমাদের কবিতা.... ও কবি মল্লিক

হাসান আলীম

ক.

কাব্য বৈশিষ্ট বিচার বিশ্লেষণ অনেকটাই ব্যক্তি নির্ভর এবং কাল সাপেক্ষ। একটা নির্দিষ্ট সময়ের কবিবৃন্দ বা কবি বিশেষ সাহিত্য ক্ষেত্রে কি অবদান রাখল বা তার/তাদের কাব্য বৈশিষ্টই বা কি তা সাহিত্য ইতিহাসের একটি প্রধান বিষয়। কাল অনেকটা নিরপেক্ষ বা কোন কোন ক্ষেত্রে কারো জন্য অনন্ত প্রায়-কালোত্তীর্ণ।

কবি সে যে সময়ের হোক বা যে মাপেরই হোন তাঁকে তাঁর কালকে আশ্রয় করেই, কালকে স্পর্শ করেই বড় হতে হয়। যিনি কালোত্তীর্ণ তিনিও তাঁর কালকে ধারণ করেই সর্বকালীন এবং সার্বজনীন হন। এ-দৃষ্টিতে কাল বিভাজন করে কাউকে বিচার করা বা কোন গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ করা ভুল নয়।

বিংশ শতকের আট দশক বা প্রচলিত আশির দশক আমাদের কাব্য ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য কালপর্যায়। এসময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যা আমাদের সাহিত্যকে একটি ভিন্নমাত্রা দান করেছে। একটু পেছন থেকে তাকালে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হবে।

আমাদের কাব্য সাহিত্যের আধুনিকতার সুত্রপাত ঘটে মাইকেল মধুসূদনের হাতে। আধুনিকতা অবশ্য যুগের উপর শতাব্দ প্রবাহের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে অন্যভাবে বলা যায় মধ্যযুগের তুলনায় অবশ্যই আধুনিক ছিল। এখনও অনেকের কবিতা আধুনিক নয় কি? মধ্যযুগের কালোত্তীর্ণ কবিরা অবশ্যই আধুনিক এবং কালোত্তীর্ণ। এক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতক এবং ঊনিবিংশ শতককে আধুনিক যুগ বলে সে অর্থে প্রকাশ করা হয় তাকে অনেকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। প্রাচ্যবাদী বা অরিয়েন্টালিজম এবং পোষ্টমর্ডানিস্টরা অবশ্যই পাশ্চাত্যের আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখান করবে। সে যাই হোক আমরা আধুনিকতাকে মোটামুটিভাবে চিন্তা করতে পারি এমনভাবে, যাতে সময়ের স্পর্শ থাকবে, সাধারণ মানুষের কথা, ধর্ম ও ঐতিহ্যের তথা স্বাধীনতা ও বাকস্বাধিকারের বিষয় থাকবে এবং বিশ্বাসের পক্ষে জুলুমের বিপক্ষে থাকবে। চর্যাপদ পর্ব থেকে মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্বাসের পক্ষে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে ছিল। তবে অসুন্দরী এবং অশ্লীলতাে য ছিল না তেমন নয়। অপ্রধানকে আলোচনায় না আনাই শ্রেয় মনে করছি।

ঊনবিংশ বিংশশতকে আধুনিকতা তথা বিশ্বাস, সত্য সুন্দর স্বাধীনতা ও প্রতিরোধের বিষয় ছিল সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদদীন, জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের কবিতার বিশ্বাস ও সত্য সুন্দরের বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বিপুলভাবে শিল্পময় হয়েছে নজরুল ও ফররুখে।

www.pathagar.com

বিংশশতকের তিরিশের কবিরা আধুনিকতায় নতুন মাত্রা বিশ্বাসে অবিশ্বাস তথা নাস্তিবাদ নিয়ে এলেন। ছন্দের বলয় ভেঙে রবীন্দ্র নজরুল বৃত্ত ভেঙে এরা বের হয়ে আসেন। এ দলে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণুদে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমরসেন প্রমূখ কবিরা।

রবীন্দ্রবলয় ভাঙার উদ্বোধন বিশেষত: প্রকরণ, অলংকার ও বাণীতে করে ছিলেন নজরুল আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিরিশের কবিদের রবীন্দ্র উপেক্ষা অনেকটা সফল হল ছন্দ ভাঙার কল কল্লোলে। তাদের এ প্রচেষ্টা পরবর্তি দশক পর্যন্ত পরিব্যাপ্তি হল। গদ্যছন্দ, ব্যাপকভাবে রমনবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বস্তুবাদ বিস্তৃতি লাভ করল। তরুণ কবিরা সংক্রমিত হল। তবে চল্লিশের ফররুখ আহমদ এবং পঞ্চাশের আল মাহমুদ কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিলেন। ষাটের আবদুল মান্নান সৈয়দ এদের ফর্ম গ্রহণ করলেও পাশ্চাত্যের পরাবাস্তবতা নতুনভাবে বাংলা কবিতায় পূর্ণরূপে স্থাপন করেন। তার পরাবাস্তবতার রয়েছে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যময়তা সত্তুরের কবিরা অনুরূপ। তাদের কবিতায় স্বাধীনতা, যুদ্ধ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা নতুনভাবে স্থাপন পেয়েছে। একটি বিষয় লক্ষনিয় তিরিশ দশক থেকে সত্তুর দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতায়, বস্তুবাদ, ভোগবাদ, রমনবাদ এবং নাস্তিবাদ কামবেশী আদরনিয়ভাবে স্থান পেয়েছিল। এ বিষয়গুলো মূলধারা বা সূচনা যুগ, মধ্যযুগ এবং ঊনিশ বিশ শতক কবিতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এদের প্রভাব বাংলা কবিতায় ব্যাপকভাবে পড়েছিল বিশেষত: স্বাধীনতা উত্তর কবিতায়।

তবে আশার বিষয় আশির দশকের একদশ প্রত্যয়দীপ্ত কবি তাদের অর্থাৎ বহমান ধারাকে অস্বীকার করে মূলের দিকে নবরূপে ফিরে আসে। তারা নতুন স্থাপত্যকর্ম স্থাপন করেন আশির দশকের প্রায় শতাধিক কবি রয়েছেন তবে তাদের সকলেই মূলানুগামী নয়। বর্তমানে আশির কবির তালিকায় সরবভাবে উপস্থিতির সংখ্যা তিরিশের বেশী নয়। আশির একটি অংশ ছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুসারী অন্য প্রধান অংশে ছিলেন মাত্র ১৫/২০ জন কবি। এই কবিরা বিশ্বাসী গণমানুষের প্রতিফলন, যুগের যন্ত্রণা ও অরিয়েন্টালিজম তথা পাশ্চাত্য বিমুখতা ছিল তাদের কবিতায়। এরা আশরাফ-আল-দীন, **মতিউর রহমান মল্লিক,** আবদুল হাই শিকদার, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, মুকুল চৌধুরী, তমিজ উদ্দীন লোদী, রেজাউদ্দিন স্টালিন, বুলবুল সরওয়ার, গাজী রফিক, আসাদ বিন হাফিজ, নাসির হেলাল, গোলাম মোহাম্মদ, গাজী এনামুল হক, আহমাদ আকতার, আহমদ মতিউর রহমান, শরীফ আবদুল গোফরান, মহিউদ্দিন আকবর প্রমূখ কবিবৃন্দ। এই কবিরা স্বত:স্ফূর্ত হয়েই যে যার অবস্থানে থেকে স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাস ঐতিহ্য, সত্য সুন্দরের লক্ষে কবিতা লেখেন। তাদের কারো কবিতায় নাস্তিক্যবাদ তথা বস্তুবাদ, ভোগবাদ, অশ্লীলতা নেই। এরা নাস্তিবাদের বিপক্ষে সত্যের পতাকা উড়িয়েছে কবিতার মিনারে মিনারে। কেন এরা সত্য সুন্দরে বিশ্বাসে ধর্মে ফিরে এলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক বিষয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে প্রধান বিষয়গুলোই কেবল আলোচনায় প্রাধ্যান্য পাবে।

আশির দশকের প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিপরীত উ"চারণ' নামে একটি সাহিত্য সংগঠনের জন্ম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ড. মিয়া মুহম্মদ আয়ুব, মাসুদ মজুমদার, ড. মাহবুবুর রহমান, কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ। এরা ঢাবি কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চা করত। অনেকেই এ সংগঠনের সাহিত্য সভায়যোগ দান করেছে। এরা মূলধারা অর্থাৎ বিশ্বাসের পক্ষে সাহিত্য আন্দোলনের কার্যক্রম চালাত। এক পর্যায়ে এর পরিচালনার ভার আসে ড. মাহবুবুর রহমান এবং এরপরে আমি ক'বছর এর পরিচালনা করি। পঁচাশির দিকে এটি বিস্তার লাভ করে ঢাকা শহরকেন্দ্রিক একটি সাহিত্য সংগঠনে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

তখন এর পরিচালকের দায়িত্বপান কবি মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ এবং সর্বশেষ পর্যায়ে নাঈম মাহমুদ। দীর্ঘ পচিশ বছর সংগঠনটি সাহিত্য আন্দোলনের কাজ করে। এ সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্য পরিষদ গঠন এবং এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও সাহিত্য সভা চলতে থাকে। উল্লেখ্য বিপরীত উচ্চারণ নিরলসভাবে এপর্যন্ত সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা করে এসেছে। এসব সাহিত্য সভায় যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত।

বিপরীত উচ্চারণে যারা সাহিত্য আন্দোলনের নেতা ও কর্মীর মত কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আজকের প্রতিষ্ঠিত কবি মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, মোশাররফ হোসেন খান, মুকুল চৌধুরী, সোলায়মান আহসান, বুলবুল সরওয়ার, গোলাম মোহাম্মদ ও হাসান আলীম প্রমুখ। নব্বই দশকে যারা এ প্রতিষ্ঠান থেকে কবি সাহিত্যিক হিসেবে বেড়ে উঠেছেন তাদের মধ্যে মুর্শিদ-উল-আলম, আজগর তালুকদার, রফিক মুহাম্মদ, ওমর বিশ্বাস, নাঈম মাহমুদ, সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব, নিয়াজ শাহেদী, নকীব হুদা। প্রথম দশকে আজাদ ওবায়দুল্লাহ, আহমদ বাসির, আফসার নিজাম, রেদওয়ানুল হক, মাহমুদ বিন হাফিজ, রকীবুল ইসলাম, ফয়েজ রেজা, শিকদার মোস্তফা, শাহদাত তৈয়ব, আবিদ আজম, শাকিল মাহমুদ, সাইফ মাহদী, আল নাহিয়ান, হাসনাইন ইকবাল প্রমুখ। এ সংগঠনের বাইরে একই ধারার আরও কবিবৃন্দ একই সময়ে বরিশাল, যশোর, বগুড়া, সিলেট, রাজশাহী, চিটাগাং এবং ঢাকার অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেড়ে উঠেছে।

বিপরীত উচ্চারণ মূলত একটি সাহিত্য সংগঠন। সাহিত্য আন্দোলন, সাহিত্য সভা, সেমিনার ও বিশেষ বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করাই ছিল এর প্রধান কাজ। প্রথম দিকে এর কোন প্রকাশনা সংস্থা ছিল না। ফলে এ সংগঠনে বেড়ে ওঠা কবিদের কাব্যগ্রন্থ দেশের অন্যান্য বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হতে থাকে। পরবির্ততে নব্বই দশকে এসে এরা প্রকাশনা শুরু করে। এখান থেকে কবি মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, নাঈম মাহমুদ ও সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাবের একটি করে বই প্রকাশ হয়েছে।

বিপরীত উচ্চারণের আমরা সত/আটজন কাব্যসতীর্থ বেশ ঘনিষ্টভাবে সাহিত্য আন্দোলন, সাহিত্যসভা, সেমিনার এবং সাহিত্য কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূখবদ্ধ ছিলাম। আমাদের নকীবের কাজ করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। আজ কর্মব্যস্ততা ও যান্ত্রিক জটিলতার সময়ে আমরা পরস্পর দুস্তর ফারাকে না রইলেও যথেষ্ট কাছে নেই। তবে যে যার মত যে যার ভূবনে আপন রঙের মাধুরী মিশিয়ে কাব্যচর্চা করছেন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেউ কেউ। ব্যাপক প্রভাব রেখেছেন অনুজ কবি বৃন্দ নব্বইয়ের সম্ভাবনাময় কবিদঙ্গলে। আমরা সবাই বিশ্বাসী, স্বাপ্নিক, রোমান্টিক, ঐতিহ্যবাদী আমাদের লেখায় তার প্রমাণ রয়েছে।

খ.

আগেই বলেছি, তিরিশ দশক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল, যে ধারাটি ছিল নাস্তিবাদ, নৈরাশ্যবাদী, সংশয়বাদী বস্তুতান্ত্রিকতার স্থুল জঠরবদ্ধ যা ছিল আবহমান বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা থেকে ছিটকে পড়া এক উচক্রমন। এটি সত্তুর দশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রবলবেগে। যদিও চল্লিশ দশকের ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবিব, ড. আশরাফ সিদ্দিকী. ড. সৈয়দ আলী আমরাফ এ ধারার সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

ছিলেন না।

আশির এই সাহসী কবি দল সাহিত্যে একটি ভিন্ন স্রোত, ভিন্ন ধারা নির্মাণ করলেন, যা মূলধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এই বিশ্বাসী কবিদের অনেককেই বিভিন্ন জনেরা বিবেচনার বাইরে সাখেন। তাই এই একচক্ষু বিচরকদের রায়ের বিপক্ষে, সত্যের পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ এই কিঞ্চত মূল্যায়ন করা সামাজিক দায়িত্ব মনে করছি।

বিশ্বাসের মূল ধারায় নিষিক্ত নাবিক কবিদলকে জ্যোতি জোসনার কবিকণ্ঠ বলতে দ্বিধা নেই। এই কবিদল কেবর জোসনারলোকে পরিশ্রুতই হননি বরং নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশ্বাসী কাব্যকলার পংক্তি নির্মাণে। যুথবদ্ধতায় সর্বক্ষেত্রে কাব্যসৃষ্টি হয় না, তবে সৃষ্টিমুখর শিল্পীরা যুথবদ্ধ হলে, নেতৃত্ব দিলে, একটি ধারার সৃষ্টি হয়, একটি বেগবন্ত স্রোতপল্লবের নির্মিত সম্পন্ন হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরুণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম ও বুলবুল সরওয়ার প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের মোকাবেলায় এ ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিকে। বিপরীত উচ্চারণের ব্যানারে তাদের সে সাহসী উদ্যোগ দশক পেরোনোর আগেই পল্লবিত হয়ে একটি স্বাতন্ত্র কাব্যধারা রূপে জাতির প্রাণে নব প্রাণপ্রবাহের সৃষ্টি করে। রাজধানী ঢাকা থেকে এ নবতর স্রোতধারার লাভাস্রোত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লাব্বাইক বলে তাতে শামিল হয়ে যান চট্টগ্রাম থেকে সিলেটের সোলায়মান আহসান, সিলেট থেকে মুকুল চৌধুরী, যশোর থেকে মোশাররফ হোসেন খান, মাগুড়া থেকে গোলাম মোহাম্মদ প্রমুখ। সিলেটের সংলাপ সাহিত্য সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরা এগিয়ে আসে কবি আফজাল চৌধুরীর নেতৃত্বে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এ ধারায় জ্যোর্তিময় সাক্ষর রাখতে এগিয়ে আসেন আরো অনেকে। আসেন আবদুল হাই শিকদার, তমিজউদ্দিন লোদী, রেজাউদ্দিন স্টালিনের মতো ঐতিহ্যপ্রিয় দেশপ্রেমিক কবিবৃন্দ। পালাবদল ঘটিয়ে এ স্রোতে শামিল হয়ে যান শক্তিমান কবি আল মাহমুদ। নতুন সাহসে উজ্জীবিত হন সৈয়দ আলী এহসান, আবদুস সাত্তার, আবুল খায়ের মুসলেউদ্দিন প্রমুখ অগ্রজ কবিবৃন্দ। এভাবেই বিশ্বাসের হিরন্ময় প্রভাব আবার স্নাত হয় আমাদের কবিতা। তিরিশের দশক থেকে চলে আসা কাব্য নৈরাজ্যর বিরুদ্ধে যা আমাদেরকে আবার আবহমান বাংলা কাব্যের মূলধারায় ফিরিয়ে আনে। বিশুষ্কপ্রায় আস্তিবাদের প্রাণময় স্ফুরণ ঘটে সকলে যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায়। তাই আশির এই সাহসী প্রত্যয়বাদী কবিবৃন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে চিহ্নিত করার সময় এসেছে। সময় এসেছে অগ্রজ ও অনুজদের মেলবন্ধনে এ ধারাটিরে আরো পরিপুষ্ট ও সুশোভিত করার।

বর্তমান সময়ের সাহসী কবিদলের কাব্য প্রতিভায় ভ্রান্ত ইউরোপিয় কনসেপ্ট দূরীভূত হতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, 'এখানে বলা অসঙ্গত হবে না, বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ছদ্মবেশে অবিশ্বাসের যে সুরটি ক্রমবর্ধমান ছিল বিশ্বাসের সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে যে হয়ে উঠেছিল দিগন্ত বিস্তৃত আষাঢ় শ্রাবণের ঘণকালো মেঘের মতো, সে বিশ্বাস হেমন্ত আকাশের আলোয় গুটিয়ে গেছে। তার সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হয়নি কিন্তু আপাততঃ কাল শীতের স্পর্শ তার চোখের দীপ্তি নিস্প্রভ।' [চতুদর্শ শতাব্দীর বাংলা কবিতা] আশির কবিরা বিভিন্ন মতপথের হলেও এদের কবিতা পূর্বের দশকগুলোর কবিদের সৃষ্টিশীলতার চেয়ে আরও স্বচ্ছ, বেগবান ও আবেদনময়। আশির একজন কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের জবানীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়, 'আশির কবিদের ঐতিহ্য চেতনার

www.pathagar.com

একটি দিক তাদের কবিতায় মীথের পুনর্ব্যবহার। ভারতীয় কিংবা বৈশ্বিক মীথ যেমন তেমনি ইসলামী মীথের ব্যবহারও ঘটেছে কারো কারো কবিতায়।' [একবিংশ, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮]

আশির কবিরা ঐতিহ্য সচেতন। এদের কবিতায় আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য শিল্পীসম্মতভাবে উপস্থিত হয়েছে। এদরে কবিতায় শ্লোগান, চিৎকার নেই বরং প্রাজ্ঞ প্রতিভার দীপ্তি রয়েছে। আশির দশকের বিশ্বাসী শিকড়সন্ধানী কবিদের সম্পর্কে আশির কবি আসাদ বিন হাফিজ একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছিলেন, 'একগুচ্ছ বিদ্রোহী শব্দমালা' শীর্ষক তাঁর এই নিবন্ধটিতে তিনি আশির দশকের ঐতিহ্যবাদী কবিদের সম্পর্কে বলেছেন, 'একদল তরুণের হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে বেরিয়ে এসেছে একগুচ্ছ কবিতার বই। আশ্চর্যজনক এ অর্থে যে, বিশ্বাসের শব্দমালা আগে যারা উচ্চারণ করতেন, তাৎক্ষণিক, অর্থে তারা ছিলেন নি:সঙ্গ কিন্তু এখন সম্ভাবনাময় একদল কবিতাকর্মী, তরুণ্যের ব্যাপ্তি নিয়ে সমস্বরে আগের চাইতেও দৃঢ়তার সাথে হিরন্ময় বিশ্বাসের ধ্বনি উচ্চকিতকরে তুলে ধরেছেন। এসব কবিরা যদি বিশ্বাসের এ জোটবদ্ধতা বজায় রাখতে পারেন, নি:সন্দেহে বাংলা কাব্যে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক আরেকটি দিক হলো খ্যাতিমান কবিদের মধ্যেও বিশ্বাসের এ পালাবদল ঘটেছে।' অগ্রজদের কেউ কেউ আবশ্য এ উত্থানে নাখোশ হয়েছেন। আশির কবিদের নিয়ে অশোভন অকাব্যিক ক্লেদাক্ত উ"চারণ করতেও বাঁধেনি কবি শামসুর রাহমানের। তিনি বলেছেন–

আশির দশক যায় মাদি ঘোড়ার মত
পাছা দোলাতে দোলাতে।

আল মাহমুদ দ্বিধাগ্রস্থ। আশির দশকের গোড়াতেই তিনি টের পেয়েছিলেন, বাংলা কাব্যে এমন এক নতুন শক্তির উত্থান ঘটছে, যাদের উচ্চারণে আছে এ দেশের বৃহত্তর গণমানুষের আশা ও স্বপ্নের সৌরভ। এ তারুণ্যের জোয়ার বাংলা কাব্যের ক্ষয়িষ্ণু ভূগোল তছনছ করে বিশ্বাসের প্রাসাদ গড়বে জাতির বিবেকে। সময়ের ব্যবধানে শিল্পী ও সৌন্দর্যের সকল শাখায় এদের নেতৃত্ব অনিবার্য হয়ে উঠবে। সাথে সাথে তিনি 'বখতিয়ারের ঘোড়া' নিয়ে ছুটে এলেন ময়দানে। আশির এ কাব্যান্দোলনে চার তরুণ সেনাপতি **মতিউর রহমান মল্লিক**, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ ও বুলবুল সরওয়ারকে উৎসর্গ করলেন 'বখতিয়ারের ঘোড়া'। এটা ১৯৮৪-র শেষ লগ্নের ঘটনা। সেই থেকে তিনি এই বিশ্বাসী বলয়ের মুরুব্বী হিসাবে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বরিত হয়ে আসছেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তিনি একাধিক জাতীয় দৈনিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় প্রতি সপ্তাহেই তাঁকে পতিকায় নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কলাম লিখতে হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য আশির হিরন্ময় কবিদের বিষয়টি চাতুর্যের সাথে এড়িয়ে গেছেন তিনি। সাহিত্য সভাগুলোতে এসব কবিদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও লিখিতভাবে আশির দশকের কবিদের কবিতাকে কবিতা বলতে তিনি দ্বিধা করেছেন। এদের কবিতাকে বলেছেন কবি ভাষা। আশির দশকের কবিদের কবি বলে স্বীকৃতি দিতে তিনি দীনতায় ভুগেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা শীর্ষক এক নিবন্ধে কবি আল মাহমুদ বলেছেন, 'ভাষার অন্তরনিহিত সম্পদ যতই কাব্যতান ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হোক না কেন গদ্যে উৎসারিত হলে সেখানে গদ্য বলেই আখ্যায়িত করতে হবে। এমন কবিতা কবির রচনা বা কবির দ্বারা প্ররোচিত হলেও আমরা বড়জোর বলতে পারি কবির চিত্ররূপময় কবিভাষা। কবিভাষা কিন্তু কবিতা নয় সাম্প্রতিক কালের কবিরা এ যুক্তি সম্ভবত: এই মুহূর্তে মানতে প্রস্তুত হবেন না, কারণ তাদের সাম্প্রতিক কালের কবিভাষা পয়ারের গন্ডি অতিক্রম করতে

www.pathagar.com

গিয়ে বহমান গদ্যই স্ফূর্ত লাভ করেছে তবে ব্যতিক্রম যে সেই এমন নয়। কেউ কেউ দোটানার মধ্যেও উভয় তরঙ্গে সাঁতার কাটছেন। এ ধরনের কবিদের মধ্যে আশির দশকের রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, নাসিমা সুলতানা, ইকবাল আজিজ, বুলবুল সরওয়ার, মতিউর রহমান মল্লিক, মোশাররফ হোসেন খান, সোলায়মান আহসান, মোহাম্মদ সাদিক, আসাদ বিন হাফিজ, তমিজউদ্দিন লোদী, আবদুল হাই শিকদার, তুষার দাশ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, আবদুল হালীম খাঁ, হাসান আলীম, ফরিদ কবির, মুকুল চৌধুরী, মুসতাহিদ ফারুকী, আহমদ আখতার, নিজাম উদ্দীন সালেহ, গাজী রফিক, গাজী এনামুল হক, খসরু পারভেজ, বিলোরা চৌধুরী, আহমদ রাকীব, মঈন চৌধুরী। সাম্প্রতিক কাব্যভাষা বিষয়ে দোদূল্যমান তরুণতম কবি গোষ্ঠীর এই তালিকাটি বলাবাহুল্য একটি অসম্পূর্ণ তালিকা মাত্র।' আশির দশকের কবিদের কম্পর্কে কবি আল মাহমুদের এ দ্বিধা-জড়তা রহস্যময় ও দু:খজনক। আশির দশকের যে কবিদের তালিকা তিনি পেশ করেছেন তাদের সকলেই কবিতা রচনা করতে অপটু বা কাব্যভাষা বিষয়ে অস্পষ্ট দোদুল্যমান বোঝাতে চেয়েছেন। আল মাহমুদের এই গড়পড়তা ভবিষ্যৎবাণী কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তিনিই নন, পঞ্চাশের কবিদের গাত্রদাহ মূলত আশির শক্তিমান কবিদের প্রতিভার বহ্নিশিখাতে দাহ্য হওয়ার যন্ত্রণা থেকেই উত্থিত হয়েছে। আমার বিবেচনায় আশির দশকের এমন ক'জন কবি রয়েছেন যাদের কবিতা চিত্রকল্প প্রকৃত অর্থে নতুন এদের কবিতা গবেষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আশির দশকের কবিতা প্রসংগে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, 'যে জোয়ার এসেছিল সত্তর দশকে দশক ফুরাতে না ফুরাতে তার জল নেমে গেল। খানিকটা হতাশায়, খানিকটা স্থিততে। ফলে আশির দশকে যে কবিদল উদিত হলেন, তারা অনেক স্থিত, অনেক নিরাবেগ, অনেক শান্ত। এর একটি প্রমাণ এই যে, আশির দশকের তরুণ কবিদের গোত্রে গোত্রে যতো বিভক্তিই থাকে– তারা তাদের লক্ষ ও গন্তব্য সম্পর্কে অনেক বেশী দৃঢ় নিশ্চয়। আশির দশকের কবিরা আবার কবিতায় এসেছেন– মূল কবিতার কাছে। তারা জেনেছেন আবেগই কবিতা নয়, আবেগের শব্দ পিশল্পরূপ কবিতা।' [দরজার পর দররোজা, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৮]

গ.

এতো গেলো কবি সমালোচকদের বাক-বিতন্ডা আশির কবিদের সম্পর্কে অম্লবধুর বয়ান। এখন প্রায় পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় এসেছে আশির কবিদের আত্মসমালোচনার। সাহিত্যের জন্য এ সময়টি নেহায়েত কম নয়। এ সময়ের অর্জন কতটুক তার বস্তুনিষ্ট সমালোচনা হওয়া দরকার। দেশজাতি তথা জাতী সাহিত্যে তরা কতটুকু দিলেন আর নিজেরাই বা পেলেন কতটুকু। আমাদের অর্জন মূলত: কতটি কাব্য গ্রন্থ আমাদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কতটি সময়ের উল্লেখযোগ্যে, কতটি প্রভাব ফেলেছে চলমান সাহিত্যে এটিই প্রধান। এরপর রয়েছে যুথবদ্ধ কাব্য আন্দোলন যার শুরু হয়েছিল প্রবল বেগে– তার বর্তমান অবস্থাটাই বা কি তারও নিকেশ।

আমাদের নকিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার সংগীতসহ কাব্য গ্রন্থ বের হয়েছে ৫টি যথা: ১. আবর্তিত তৃণলতা [১৯৮৭] ২.অনবরত বৃক্ষের গান [২০০১] ৩.রঙিন মেঘের পালকি [শিশুতোষ, ২০০২] ৪.ঝংকার [গান, ১৯৭৮, ১৯৯৩, ৫.যতগান গেয়েছি।

কবি সোলায়মান আহসানের ৪টি কাব্য গ্রন্থ যথা: ১. দাঁড়াও স্বকাল বিরূপতা [১৯৮৫] ২. কৃষ্ণস্বর প্রত্যুষের [১৯৯১] ৩. নক্ষত্রের বিলাসিতা [২০০৩] ৪. শূন্য ও শূন্যতা [২০০৫]

www.pathagar.com

কবি মোশাররফ হোসেন খানের ১১টি কাব্যগ্রন্থ যথা: ১. হৃদয় দিয়ে আগুন [১৯৮৫] ২. নেচে উঠা সমুদ্র [১৯৮৭] ৩. আরাধ্য অরণ্যে [১৯৯১] ৪. বিরল বাতাসের টানে [১৯৯১] ৫. পাথরে পারদ জ্বলে [১৯৯৫] ৬. ক্রীতদাসের চোখ [১৯৯৭] ৭. নতুনের কবিতা [২০০০] ৮. বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনে মৃত্তিকা [২০০২] ৯. দাহন বেলায় [২০০২] ১০.কবিতা সমগ্র [২০০৩] ১১.আমার ছড়া [২০০৫]

কবি আসাদ বিন হাফিজের ৮টি কাব্যগ্রন্থ যথা: ১. কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর [১৯৯০, ১৯৯৭, ২০০০৩] ২. অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার [১৯৯৬, ২০০০, ২০০৩] ৩. নাতিয়াতুন্নবী [২০০৩] ৪. হরফ নিয়ে ছড়া [১৯৮৯-২০০২] ৫. আলোর হাসি ফুলের গান [১৯৯০, ১৯৯৮, ২০০২] ৬. কু কুরু কু [১৯৯২, ১৯৯৮, ২০০২] ৭. আল্লাহ মহান [২০০১] ৮. কারবালা কাহিনী [২০০১]

কবি মুকুল চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ ৪টি যথা: ১. অস্নষ্ঠ বন্দর [১৯৯১] ২. ফেলে আসা সুগন্ধি রুমাল [১৯৯৪] ৩. চা বারান্দার মুখ [১৯৯৭] ৪. সোয়শা কোটি কবর [২০০৩]

কবি বুলবুল সরওয়ারের কাব্যগ্রন্থ ৫টি যথা: ১. ঝড় আসুক বৃষ্টি আসুক [১৯৮৮] ২. রুবাইয়াত [১৯৯০] ৩. চোখ বুজলেই মন [১৯৯২] ৪. অন্ধনগরী [২০০১] ৫. ডুবেও মরন হায় বিহনে মরন [১৯৯৭]

হাসান আলীমের কাব্যগ্রন্থ ১২টি যথা: ১. শ্বপদ অরণ্যে অগ্নিশিশু [১৯৮৩] ২. নি:সঙ্গ নিলয় [১৯৮৭] ৩. মৃগনীল জোসনা [১৯৯০] ৪. সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ [১৯৯১] ৫. তোমার উপমা [১৯৯৪] ৬. ডানাওয়ালা অট্টালিকা [১৯৯৭] ৭. যে নামে জগত আলো [১৯৯৮] ৮. কাব্য মোজেজা [২০০০] ৯. কোথায় রাখি এ অলংকার [২০০৩] ১০. দ্রাবিড় বাংলায় [২০০৫] ১১. হৃদয়ে রেখেছি যারে [২০০৫] ১২. পান্না সোনা মান্না [২০০৪]

এ কবিদের কাব্যগ্রন্থ তাদের কবিতা সাহিত্য সমাজের বেশ সাড়া এবং আশার আলো জুগিয়েছে বিশ্বাসী কবিদের বিশ্বাস নি:সৃত কবিতা যে ব্যাপক সাড়া ফেলতে পারে অনুজ কবিদের সমসাময়িক কবিদেরও প্রভাবিত করতে পারে- তার প্রমান আজকের বিশ্বাসী কবিদের কাফেলা। এদের কবিতা সাহিত্যে বিশেষত: আধুনিক সাহিত্যে একটি প্রবল ধারা সৃষ্টি করেছে। এ কবিদের উত্তরসুরী নজরুল, ফররুখ, আল মাহমুদ হলেও এদের প্রত্যেকের স্বাত্যন্ত্র রয়েছে এবং চমক রয়েছে। এদের কেউ কেউ, কোন কোন কাব্যগ্রন্থ নিশ্চয়ই সময়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। ইতিহাসে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তবে অনেকের অনেক কাব্যের বেশ কিছু কবিতা বিশেষত্ব অর্জন করতে পারেনি। এদের অনেকেই এখন সৃষ্টিশীলতায় মুখর নেই- বিশেষত: কাব্য জগতে যুথবদ্ধতাও নেই তেমন। এদের সৃষ্টিশীলতা সুপ্রচুর না হলেও অনুল্লেখযোগ্য নয়। বিশ্বাস এদের কেউ কেউ কালোত্তীর্ণ কবি খ্যাতিতে বরিত হবেন। কারণ তাদের কারো কারো লেখায় পরীক্ষা নীরিক্ষা রয়েছে। রয়েছে নতুনত্ব, তত্ত্ব ও বিজ্ঞানময়তী।

লেখক : কবি

www.pathagar.com

ইসলামী জাগরণের কবি মতিউর রহমান মল্লিক

ইকবাল কবীর মোহন

আশির দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। বর্তমানে পেশায় ডাক্তার বন্ধু সোহরাবের মাধ্যমে কয়েকজনের সাথে পরিচয় হলো। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই দুরন্ত জীবনের মাঝেই নতুন আরেক জীবনের গতি পেলাম। খুঁজে পেলাম সত্যসন্ধানী এক সম্পূর্ণ জীবন। তখন সবেমাত্র কলেজে পা বাড়িয়েছি। তারপর থেকে যতই এগিয়েছি চলার পাথেয় হিসেবে দীন ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারিনি। মেহেরবান আল্লাহর দেয়া এই জীবনের সন্ধান সত্যই আমার পরম সৌভাগ্য। ধন্যবাদ স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহকে।

একদিন সকালবেলা। সম্ভবত সকাল দশটা হবে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন টগবগে বালকের এক মিলনমেলা বসেছে এক মেসে। দীন কায়েমের উদ্দীপনা ছড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন কয়েকজন তরুণ নেতা। মনোযোগ সহকারে শুনলাম সেই জাগানিয়া ভাষণ। তারপর ঘোষণা এলো ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনার। অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মিয়া মুহাম্মদ নাসিম। আমার জীবনে শোনা সেরা কণ্ঠে সেরা ইসলামী সঙ্গীত ছিল সেটি। অবাক বিস্ময়ে শুনলাম সেই সঙ্গীতের প্রতিটি কথা ও সুর। মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের লেখা সেই গান 'দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ, রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কুরআনের রাজ' আজও আমার কানে বাজে। এই গানে যে উদ্দীপনা ও সীমাহীন প্রেরণা আমার বুকে তোলপাড় তুলেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এরপর মল্লিক ভাইয়ের লেখা অসংখ্য সঙ্গীত শুনে বুক জুড়িয়েছি, আবেগে আপ্লুত হয়েছি। মল্লিক ভাইয়ের গান 'হাত পেতেছে এই গোনাহগার, তোমারি দরগায় খোদা তোমারি দরগায়, শূন্য হাতে ওগো তুমি, ফিরাইও না হায়, মোরে ফিরাইওনা হায়।' অথবা 'আমাদের পথ কুরআনের পথ এই পথ নির্ভুল, এই পথে আছে আল্লাহ ও তাঁর আখেরী রাসূল।' কোন অনুষ্ঠানে ইসলামী সঙ্গীত গাওয়া হবে যখনই শুনতাম তা শোনার সুযোগ সহজে হাতছাড়া করতাম না। কেননা, মল্লিক ভাইয়ের অসাধারণ গান ও সুরের লহরী আমাকে যারপরনাই প্রেরণা দিত এবং দীনের কাজে উৎসাহ যোগাত। তাঁর সেই অমর গান 'ফুলের ঘ্রাণে অলীর গুঞ্জরণে, ঐ নামেরই গান শুনে মন দেয় যে নীরব সাড়া। নদীর কলকলে, ঢেউয়ের ছলছলে, ঐ নামেরই সুর শোনা যায় হলে আপন হারা।' অথবা 'আমাদের পথ ঈমানের পথ জেহাদের পথ ঠিক, এই পথে মোরা চির নির্ভয়, চিরদিন নির্ভিক,' শুনলে মনপ্রাণ সত্যিই উতলা হয়ে উঠত। তখন থেকেই আমি মল্লিক ভাইয়ের ভক্তে পরিণত হলাম। কিন্তু মল্লিক ভাইকে তখনও দেখিনি। যার গানের আমি অতটা ভক্ত, অনুপ্রাণিত তাঁর জন্য প্রচন্ড আবেগ ও

www.pathagar.com

ভালোবাসা ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। তাই এই মহান কবি, লেখক ও সুরকারের সাথে পরিচিত হবার ব্যাকুলতা আমাকে তাড়িয়ে ফিরছিল। মল্লিক ভাই তখন ঢাকায়। সুদূর কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসেছি কয়েকবার। তবে তাঁর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি কোনভাবেই। দেখতে দেখতে সময় অনেক গড়িয়ে গেল।

১৯৮২ সাল। স্বৈরাচার এরশাদের সামরিক শাসনে দেশ তখন বন্দী। দীনি আন্দোলনে সৃষ্টি হলো এক অজানা সংকট। আমরা হতাশার মধ্যে পড়ে গেলাম। এতে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমি এটা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। তারপরও মনটাকে শক্ত করলাম। এরই মাঝে ঢাকা থেকে সিদ্ধান্ত এলো কেউ একজন কুমিল্লা সফর করবেন। তবে তখনও এই মেহমানের নাম জানতাম না। অবশেষে যখন সেই দিনটি এলো তখন বিস্মিত হলাম। আমরা যেই মেহমানকে রিসিভ করলাম তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় সেই মল্লিক ভাই। মল্লিক ভাইকে প্রথম দেখার সেই প্রচন্ড আবেগ ও হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি আজও আমি স্পষ্ট অনুভব করি। প্রথম দর্শনেই তাঁর চেতনাদীপ্ত কথা, বুদ্ধিপ্রবণ ও কাব্যিক ভাষার মাধুরি এবং নির্মল হাসির ঝিলিক আমাকে আকৃষ্ট করল। তিনি একদিনের ঝটিকা সফরে কুমিল্লায় এসে ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর চালচলন ও প্রতিভার যে দ্যুতি ছড়িয়ে গিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে অনন্য সাধারণ এক অভিজ্ঞতা হিসেবে জাগরুক আছে। তারপর ঢাকায় এসে বহুবার কবি মল্লিক ভাইয়ের সাহচর্যে এসেছি। আমি প্রতিবারই তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথা ও গান শুনে স্তম্ভিত ও অভিভূত হয়েছি। তিনি তাঁর কথা, লেখা, গান, সুর, কবিতা ও গল্পে মানবতাবোধ ও ইসলামী চেতনার যে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে পেরেছেন এমনটা আশির দশকের পর আর কোন কবি ও লেখক পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। বাংলা সাহিত্যের অনন্য কবি ফররুখের পর মতিউর রহমান মল্লিকই হচ্ছেন একমাত্র কবি যিনি ইসলামী বিশ্বাস ও চেতনাকে তাঁর প্রতিটি কথা, গান ও লেখায় সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আজ মল্লিক ভাই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে আমার একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে কথা বলা ও উপলব্ধি শেয়ার করার স্মৃতিকথা। আমার 'রক্তে রাঙা ইরাক' বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সাবেক বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান অতিথি এবং মল্লিক ভাই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে আমার সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাকে ব্যাংকিং চাকুরির পরও ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ এবং বই লেখার বিষয়ে অবাক হয়ে জানতে চান। আমি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলি যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও আপনাদের দোয়ার বদলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আবারো একই প্রশ্ন তুলে বললেন, 'আমি জানি ইকবাল কবীর মোহন একজন পুরোদস্তুর ব্যাংকার। তারপরও দেখি তিনি নিয়মিত ছড়া, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছেন। প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হচ্ছে। তিনি একের পর এক বইও প্রকাশ করছেন। আমি লেখকের মুখেই জানতে চাই তিনি কীভাবে এই অসম্ভব কাজটি করে যাচ্ছেন।' মল্লিক ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সেই ভাষা আজ আর আমার হুবহু মনে নেই। মল্লিক ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা জমেছিল। কিন্তু তাঁর সাথে আমার খুব একটা দেখা-সাক্ষাত হতো না। তবে

www.pathagar.com

মল্লিক ভাইয়ের সাথে যতবারই দেখা হয়েছে অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁর এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং লেখার প্রেরণা পেয়েছি।

মল্লিক ভাই আজ আর নেই। তবে তাঁর অসংখ্য গান, শত শত কবিতা ও গল্প এখন আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর গান, কবিতা ও গল্পে দেশপ্রেম, ইতিহাস ও ইসলামী জাগরণের যে ভাবধারা ও অসাধারণ চেতনার দ্যুতি ছড়িয়ে গেছেন তা এককথায় বিস্ময়কর। মল্লিক ভাই তাঁর লেখনীতে শাশ্বত ইসলামী বিশ্বাসের চেতনাকে অত্যন্ত নান্দনিকতার সাথে বাঙ্ময় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস মল্লিক ভাই যুগ যুগ ধরে তাঁর উদ্দীপনামূলক অসাধারণ লেখা ও গানের জন্য এ দেশের কোটি মানুষের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকবেন।

লেখক : ব্যাংকার, শিশুসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান বাণী, সুর ও বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

ইসলামী গানের প্রতি আমার দুর্বলতা ছোটকাল থেকেই। ১৯৭৭ সাল। বরিশাল মেডিকেল কলেজের ডা. জলিল ভাই আমার হাতে তুলে দিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই লিখিত 'সুর শিহরণ' বইটি। সাথে সুরগুলোও শুনালেন কিছু কিছু। মুগ্ধ হলাম, এরপর ঘটনাচক্রে আমাদের ঢাকা চলে আসা। ১৯৭৮ সাল, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে সাইমুমের প্রথম অনুষ্ঠান দেখা। সেখানে মল্লিক ভাই, তফাজ্জল ভাইকে প্রথম দেখি। অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লেগেছিলো। এরপর সাইমুমের প্রশিক্ষণ ক্লাশে যুক্ত হই। প্রথম দিন গান শিখলাম তফাজ্জল ভাইয়ের কাছে। মল্লিক ভাইকে সেদিন পাইনি, পরের ক্লাসে সাইমুমের সাবেক পরিচালক নোমান আযামী ভাই মল্লিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর থেকেই তার স্নেহে ও ভালোবাসায় এগিয়ে যাওয়া। আমাদের ছিলো বড় এক টিম। অনেক শিক্ষার্থী, মল্লিক ভাই-এর সুনজরে আসার চেষ্টাও ছিলো কারো কারো। একটা সময় পর অনুভব করলাম আমি মল্লিক ভাই-এর স্নেহটা একটু বেশিই পাচ্ছি। এরপর দেখতে দেখতে চলে যায় তিন দশকেরও অধিক সময়, অনেক স্মৃতি অনেক আবেগ। আমার এই লেখা মল্লিক ভাই-এর গান নিয়ে। শুধু শিল্পের জন্যই শিল্প বা কবিতার জন্য কবিতা কিংবা গানের জন্যই কি গান? সে বিষয়ে আলোচনায় যাবো না, কেউ লতাগুল্মের মতো উদ্দেশ্যহীন যাত্রাও করতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে দায়িত্ববোধ বা জবাবদিহিতার প্রশ্ন যখন এসে যায়, ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা যখন প্রাধান্য পায় তখন একজন কলম যোদ্ধার যাত্রা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আর এখানেই তিনি নিজেকে আলাদা করে নেন অন্য সবার থেকে। আর সে কারণেই কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক অনেক লেখক কবি থাকলেও তারা নজরুল হতে পারেননি। পারেননি জাতীয় কবি হতে। একই কথা প্রযোজ্য কবি ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রেও।

কাজী নজরুল ইসলামের সময়কালটা আমাদের প্রায় সবারই জানা। বৃটিশ অবরুদ্ধ এই জনপদ। মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় অভাব। নজরুল বুঝলেন স্বাধীনতার কোন বিকল্প নাই। তিনি মুসলমানদের চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন–

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি

অথবা

তৌফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহান পুনঃ হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সালতানাবাদ দাও সেই বাহু সেই দিল আযাদ

www.pathagar.com

অথবা

বাজিছে দামামা বাঁধর 'আমামা'– শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান।

এই গানগুলো নিয়ে যখন ভাবি তখন বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই চেতনা, অনুভূতি ও বিশ্বাস তিনি কোথা থেকে পেলেন। যখন পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণভাবে তার প্রতিকূলে ছিলো।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম স্থান পশ্চিম বংগের আসানসোলের চুড়ুলিয়া গ্রামে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। যে শহরে নজরুল কিশোর বয়সে চাকুরি করেছে সেই আসানসোলের লোকদের জিজ্ঞাসা করলে কেউ নজরুলকে চিনলো না। চুড়ুলিয়া গ্রামে পৌছার পর দেখলাম শুধু মাত্র ঐ গ্রামের লোকেরাই তাকে চেনে। আমার বিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হলো নজরুল আমাদের জন্যই কাজ করেছে, আর তাই আমরাই তাকে মনে রাখি বা স্মরণ করি। আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় নজরুল শুধু প্রয়োজনই নয় অপরিহার্যও বটে। কাজী নজরুল ইসলামের ধারাবাহিকতায় আরেক সফল কলম যোদ্ধার নাম কবি ফররুখ আহমদ। ৪৭-এ মুসলমানরা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ ভাগে সমর্থন দিয়েছিলেন তা অপূর্ণ রয়ে যাওয়ায় তিনি যেমন পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, ছড়া কবিতা লিখেছেন ঠিক তেমনি ভারতীয় শাসকদের অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কবিতা আর গানে। ফেলানীর ঝুলন্ত লাশ দেখে নতুন প্রজন্ম যেখানে ভারতকে নতুনভাবে চিনতে শুরু করে, যেখানে ফারাক্কা বাঁধের কুপ্রভাবে উত্তরবঙ্গ মরুকরণ সম্পন্ন সেখানে ফররুখ আহমদের দূরদৃষ্টি যে কতো প্রখর তা জানা যায় ''শোন মৃত্যুর তুর্য নিনাদ ফারাক্কা বাঁধ'' এই গান শুনে, যা ফারাক্কা বাঁধ চালুর পূর্বেই কবি লিখে গেছেন। মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশের জন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে প্রচেষ্টা ছিলো তার ধারাবাহিকতা দেখা যায় কবি ফররুখ আহমদের মাঝে।

আজকে ওমর পন্থী পথির দিকে দিকে প্রযোজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দিবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ

কতোখানি শাণিত চেতনা থাকলে কলম থেকে এ জাতীয় কথা বের হয়ে আসে।

নজরুল ফররুখের যোগ্য উত্তরসুরী কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ইসলামী গান কবিতার কথা আসলেই কেউ কেউ প্রান্তিকতার গন্ধ তালাশ করেন। বিষয়টি একেবারেই অবান্তর। ইসলাম কোন স্থান কাল পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়। মানবতার কল্যাণের জন্যই ইসলাম। আলো-বাতাস নদী-নালা প্রকৃতি সব কিছু যেমন সবার জন্য ঠিক তেমনি ইসলামও সবার জন্য। জীবনের যা কিছু ভালো তা সবই ইসলাম ধারণ করে আর খারাপগুলো বর্জন করতে বলে তাও মানুষের কল্যাণের জন্যই। সে অর্থে আল্লাহ রাসূলের প্রশংসা সূচক হামদ-না'ত যেমন ইসলামী গান ঠিক তেমনি বৃহৎ অর্থে মানুষের যাবতীয় কল্যাণের জন্য রচিত সবগানই ইসলামী গান। আর তাই কবি নজরুল, ফররুখের গানের মাঝে যেমন আল্লাহ রাসূলের প্রশংসা মূলক হামদ-না'ত দেখা যায় ঠিক তেমনি মানবতার জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য রয়েছে অনেক অনেক রচনা। নজরুল-ফররুখের যোগ্য উত্তরসুরী হিসাবে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলোও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বক্তব্যে স্বতন্ত্র। এক কথায় মানবতার কল্যাণের

www.pathagar.com

জন্যই রচিত কবি মল্লিকের যাবতীয় গান। আমার কাছে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানের কিছু দিক বিশেষভাবে এসেছে যা এখানে তুলে ধরতে চাই–

ইসলামের মূল শিক্ষার দিকে আহবান

ইসলামী গান বলতেই একধরনের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রশংসার বাণীর সমষ্টিকেই বুঝাতো। বিভিন্ন গীতিকার কবির লেখায় তা প্রকাশ পেয়েছে বার বার। আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমেও হামদ-না'ত বা ভক্তিমূলক গানকেই ইসলামী গান হিসাবে ধরে নেয়া হয়। কবি মল্লিক এক্ষেত্রে ভিন্নতা এনেছেন। ইসলামের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা ও শিক্ষাকে গানের মাধ্যমে তুলে ধরায় তিনি সফল হয়েছেন। তার কয়েক হাজার গান কবিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি কখনো মানবতার জন্য, সামাজিক সম্প্রীতি ভালোবাসার জন্য, মানুষ হিসাবে দায়িত্ব কর্তব্যের কথা লিখেছেন, আবার কখনো লিখেছেন জীবন ও মানুষের সীমাবদ্ধতা, সুন্দর ব্যবহার আচরণ, সততা নৈতিকতা নিয়ে। একটি গানে কখনো শুধুমাত্র একটি বিষয় এনেছেন কখনো এনেছেন বহু বিষয়। ছোট এই পরিসরে সবগুলো গানের কথা লিখা সম্ভব নয়। তার প্রতিটি লেখার মূল লক্ষ্য এক; মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া। ছোট ছোট নদী শাখা নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় কবি মল্লিকের প্রতিটি গানের আহ্বানই মূল সেই লক্ষ্য পানে ধাবিত।

শির্‌ক মুক্ত

ইসলামী গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক পরিচিত লেখকের গানের মাঝেও শিরক চলে এসেছে। রচয়িতার অজ্ঞতা বা সাবধানতার অভাব যে কোন কারণেই হোক না কেন এটা ইসলামী গানের ক্ষেত্রে বেশ দৃশ্যমান।

তৌহিদেরই মুরশিদ আমার
মুহাম্মদের নাম
অথচ লেখা উচিত ছিলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা।

অথবা–

নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে তারি নূরের রওশনী

এক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার কলমকে কোনো বিভ্রান্তির উপত্যকায় বিচরণ করাননি।

সহজ বোধ্যতা

শব্দ চয়নে কবি মল্লিকের স্বাতন্ত্র্য বেশ লক্ষণীয়। সে সব গান মানুষের হৃদয় ছুয়ে যায় যেগুলোর বাণী সহজবোধ্য বা সরল।

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙীন পরিচয়

এ ধরনের অনেক জনপ্রিয় গানই সহজ সরল ভাষা ব্যবহারের কারণে জনপ্রিয় হয়েছে।

www.pathagar.com

উপমা বৈচিত্র্য

গানকে গীতি কবিতাও বলা হয়। একটি গান তখনই শ্রোতাদের হৃদয় ছুয়ে যায় যখন সেখানে সাবলিল উপমার ব্যবহার থাকে। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রায় সব গানেই উপমা বৈচিত্র্য চোখে পড়বে।

টিক টিক টিক যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে
কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে

সৌদি আরবে একবার মল্লিক ভাই-এর সাথে আমার সফর ছিল। সেখানে বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই গানটি তিনি গেয়েছিলেন। দর্শকরা দারুণভাবে গ্রহণ করেন গানটি। দেশেও এই গানটি বেশ জনপ্রিয়। গ্রামীন ফোনের রিংব্যাক টোনেও গানটি শোনা যায়।

একদিন মনে আছে স্টুডিওতে বসে কবি মতিউর রহমান মল্লিক লিখিত একটি না'ত রেকর্ড করছিলাম। তার বাণীটি এমন–

আমিও কি তব উম্মত নহি
হিয়া পেরেশান তোমার বিরহে
অনেক আকাশ তোমাতে হারাই
অনেক বাতাস দু'হাত বাড়াই

আমার চোখ দিয়ে অজান্তেই পানি গড়িয়ে পড়লো। রাসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসার কত চমৎকার বহি:প্রকাশ, বুকের ভিতর লুকায়িত আবেগ বা ভালোবাসা কত চমৎকার উপমা দিয়ে করলেন। এরকম অনেক অনেক উপমা সমৃদ্ধ গান তিনি রচনা করে গেছেন।

সময় উপযোগিতা

কবি মল্লিকের গানের একটা বিশেষ দিক হলো সময় উপযোগিতা। সমকালীন বিষয়গুলো তার গানে খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গানটি রচনার পর তা আবার ঐ সময় অতিক্রান্ত করে ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণেও বেশ কার্যকর দেখা যায়।

ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাওগো মেহেরবান
বুকের ভেতর ব্যথার নদী বইছে অবিরাম'

আমার জানা আছে কোন পরিস্থিতিতে তিনি এ গানটি লিখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলো যে কোন শ্রোতার জন্যই গানটি প্রিয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য রাখে।

বাণী ও সুর বৈচিত্র্য

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই-এর গানের বাণীগুলোতে যেমন নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায় ঠিক সুরের ক্ষেত্রেও তিনি ভিন্ন মাত্রা এনেছেন।

চলো চলো চল মুজাহিদ
পথ যে এখনো বাকী
ভোল ভোল ব্যথা ভোলো
মুছে ফেলো ঐ আখি

www.pathagar.com

অথবা –

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে
কেনো বেছে নিলে এই পথ

এ ধরনের অনেক গান আছে যেগুলো প্রচলিত ধারার গান থেকে ভিন্ন মাত্রায় ব্যঞ্জনা এনেছে। আজও সে গানগুলো হৃদয় ছুয়ে যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক প্রতিযোগিতায় দেখছি ছাত্র-ছাত্রীরা মল্লিক ভাই-এর গান গেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

নতুন শ্রোতা তৈরি

মানুষের রুচি বা পছন্দের ভিন্নতার কারণেই গানের ক্ষেত্রেও কারো নজরুলের গান পছন্দ, কারো বা রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক অথবা ফোক, ব্যান্ড ইত্যাদি অনেক রুচির শ্রোতাই দেখা যায়। কারো আবার কম্পিউটারে টিউন করা গান পছন্দ। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অন্যতম সফলতা তিনি শুধু গানের একটা নতুন ভুবনই তৈরি করেননি, তৈরি করতে পেরেছেন একদল শ্রোতা। এদের সংখ্যা অনেক। আজ ইসলামী গানের যে বাজার তৈরি হয়েছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব কবি মল্লিকের। আজ ইসলামী গান প্রচলিত গানের মাঝেও একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। ইসলামী গানের অডিও ভিডিও এলবাম নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে, গড়ে উঠেছে প্রকাশনা সংস্থা। সবমিলে এটা কবি মল্লিকের এক অনবদ্য অবদান।

গীতি কবিতা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অনেক গানের পাশাপাশি অনেক কবিতাও আছে। মজার ব্যাপার হলো এসব কবিতাগুলো হাতে নিয়ে কোন সুরকার যদি সুর দিতে চান তাহলে অনায়াসেই তা করতে পারবেন। বাণী ছন্দ উপমা এতো সাবলীল যে সুরারোপ হলে তা আরোপিত কিছু মনে হয় না। আমার মনে পড়ে ''তুমি কি এখন স্বপ্ন ভংগ কেউ'' নাতিদীর্ঘ এই কবিতাটির বক্তব্য আমাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিলো যে আমার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আমি তাতে সুর দেয়ার চেষ্টা করলাম। অল্প সময়েই সুরটা হয়ে গেলো। একজন কবির এটা অনেক বড় দক্ষতা যে তার লেখাকে বিভিন্ন মাধ্যমেই ব্যবহার করা যায়।

সুমধুর কণ্ঠ

যিনি গান লিখেন তিনি নিজে সুর সাধারণত কমই দেন আর নিজ কণ্ঠে তার ধারণ খুব কম দেখা যায়। কবি মল্লিক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কলম যেমন ছিলো শাণিত ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তাকে মধুর একটা কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মিডিয়াতে যে ধরনের কণ্ঠ আমরা সবাই সাধারণভাবে শুনে অভ্যস্ত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কণ্ঠ ছিলো তার। একধরনের মায়াময় পরিবেশ তৈরি করতো। শ্রোতাদের হৃদয় ছুয়ে যেতো তার কণ্ঠ। তিনি নিজে খুব যে বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তা নয় তবে যে কয়টি এলবাম আছে তার ব্যাপক কাটতি সে সত্যতারই প্রমাণ বহন করে।

আন্তর্জাতিক গানের অন্বেষা

মল্লিক ভাই-এর সামনে বিদেশী কোনো গান বাজলেই খেয়াল করে শুনতেন। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগতো সে সব গানের সাবলিল অনুবাদ তিনি সহজেই করে ফেলতেন। অনেক আরবী, ফার্সি, উর্দু গানের সরল অনুবাদ করে শিল্পীদের কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন তিনি।

www.pathagar.com

মাত্রা ও ছন্দ সচেতন

অনেক বড় মাপের কবিদেরও দেখেছি গান লিখার অনুরোধ করলে তারা হয়তো লিখেছেন কিন্তু কোথায় যেনো কিছু একটার কমতি। মল্লিক ভাই যখন কবিতা লিখেছেন তখন তা যেমন খাঁটি কবিতা হয়েছে ঠিক গানের ক্ষেত্রেও হয়েছে শতভাগ গান। ছন্দ মাত্রার ব্যাপারে ছিলো তার অসাধারণ দক্ষতা। কোন গান কি কথামালায় সাজাবেন তার ফরমেটটা তিনি ঠিকভাইে করতেন। একজন সাধারণ শ্রোতা হয়তো এগুলো বুঝবেন না বা খেয়ালও করবেন না কিন্তু তার অজান্তে গানটি ভালো লাগার কারণ হচ্ছে মাত্রা ও ছন্দ সচেতনতা।

শেষ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করতেন, চাইতেন না খুব বেশি প্রকাশ পেতে। আমার মনে পরে তিনি জীবনে সর্বশেষ সম্মাননা পদক পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে। ঐ একই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ। মল্লিক ভাই তখন অসুস্থ এবং ব্যাংককে চিকিৎসাধীন। মান্নান সৈয়দ স্যার অনুষ্ঠানে বললেন আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি আমার ছাত্র মল্লিক পুরস্কার পেয়েছে তাই। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন ''মল্লিক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।''

আজ মান্নান সৈয়দ স্যারও নেই। মল্লিক ভাইও নেই। মানুষের জীবন এমনই হয়। মল্লিক ভাই আমাদের মাঝে না থাকলেও তার সৃষ্টি কর্ম আছে, আছে তার হাতে তৈরি শতশত গীতিকার সুরকার শিল্পী। আমি জানি মতিউর রহমান মল্লিকের যথাযথ মূল্যায়নে আমার সামর্থ্য সীমিত। কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে কবি মল্লিকের যথাযথ মূল্যায়ন একদিন হবে। গবেষকরা তার লেখা থেকে সংগ্রহ করবে নতুন নতুন উপাদান। মহান আল্লাহ কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই-এর যাবতীয় কাজ কবুল করুন। তার খেদমতে আলোকিত করুন নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষাভাষী সফল জনতাকে। আমীন।

লেখক : অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সংগঠক ও কণ্ঠশিল্পী।

www.pathagar.com

শিল্পী-কবি মতিউর রহমান মল্লিক

শরীফ আবদুল গোফরান

তোমরা কবি-গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিকের নাম অবশ্যই শুনেছো। আর না শোনারও কথা নয়। কারণ তিনি তো তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের অনেক ভালোবাসতেন। পত্রিকার পাতায় পাতায় ছন্দে ছন্দে তোমাদের জন্য কতো গান-কবিতাই না লিখেছেন। বাংলাসাহিত্যে বিশেষ করে শিশুতোষ সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে ছিলো তার বিচরণ। তিনি তোমাদের মতো ছোট্ট কুঁড়িদের কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন দেখো-

ফুলকুঁড়িদের মাঝে আমার থাকতে লাগে ভালো
ফুলকুঁড়িরাই জ্বালছে দেশে জ্ঞান-গরীমার আলো।
তারা তো নয় কাগজের ফুল মেকী ফুলের কুঁড়ি।
আসল ফুলের মেলা বসায় সারাটা দেশ জুড়ি।
আশার আলো লুটছে তারা অনেক অনেক পড়ে
পৃথিবীকে গড়ছে তারা নিজকে আগে গড়ে।
তাদের বড়ো ভালোবাসি বড়োই আপন ভাবি
তারাই কভু তুলে নেবে দেশ চালাবার চাবি।
সকল মিথ্যা উৎপাটনে সত্য অবিচল
ফুলকুঁড়িরাই তাড়িয়ে দেবে সকল অমঙ্গল।

তা হলে বুঝতেই পারছো। তিনি তোমাদেরকে কতো ভালোবাসতেন। সেই প্রিয় মানুষটির কথাই তোমাদেরকে বলছিলাম। কবি মতিউর রহমান মল্লিক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন জানো? বলছি শোন। ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ বাগেরহাট জেলার বারুইপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী কায়েম উদ্দিন মল্লিক আর মাতা আছিয়া খাতুন।

গ্রামের পাঠশালা থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি মাদরাসা থেকে ফাযিল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এ বিএ অনার্স পড়তেন। কর্মজীবনে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক, মাসিক কলম পত্রিকার সম্পাদক এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সচিব ছিলেন। তিনি একাধারে ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, গান লিখে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন, একজন হাস্যরসিক। তার মন ছিল নরম। গাল্পিক মন। শিশু মনের অধিকারী এই কবি শিশুদের হাসির জগতে আকর্ষণ করেছেন। তিনি কখনো নির্মল আনন্দ বিতরণ করেছেন, কখনো বা নীতি, উপদেশপূর্ণ ভালো ভালো কথা

www.pathagar.com

গীতিকাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে দৃপ্ত করেছেন। যেমন-

এইতো সেদিন রাত বারোটায় দেখি
হায়! হায়! হায়! চৌরাস্তায় একী!
পিচ্ছি ম্যালা, পনরো ষোল আর
যুবকতো নয় নাঙ্গা তলোয়ার
সমান তালে মারছে রঙের গোলা
ঠায় দাঁড়িয়ে হাসছে ক'জন ভোলা।

অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাসাহিত্যের একজন অন্যতম গীতিকবি। তার কবিতায়, গানে রয়েছে ছন্দ, শিল্প, সুষমা, ভাবের সুঠাম বিন্যাস আর নিখুঁত কারুকাজ। তার রচিত প্রতিটি লেখায় ধ্বনিত হয় একটি ম্যাসেজ যা বড়মাপের একজন কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার লেখায় ছোটদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। তিনি নতুন নতুন শব্দ ও ভাষার ঝংকারে রস-রচনা লিখেছেন অনেক। মন ও মেজাজে চঞ্চল এই লেখক সমাজ বা জাতির জন্য মূলত লেখনী ধারণ করলেও তার শিশুতোষ রচনাবলী স্পন্দিত হয়েছে। শিশুসাহিত্যে তিনি ছিলেন আলোর অভিসারী, রঙিন সকাল প্রত্যাশী মানবতাবাদী। যেমন-কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে তার শিশুতোষ একটি লেখা-

বুকে তার সাহস ছিলো বাঘের মতো
প্রাণে তার ফুটতো গোলাপ ডাগর ডাগর
মনে তার লক্ষ-নিযুত তারা জ্বলতো
চোখে তার স্বপ্ন ছিলো সাগর সাগর।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন অপূর্ব প্রাণশক্তির প্রতীক। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। সে প্রেম প্রকৃতির জন্যে, মানুষের জন্যে, দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জন্যে, মানবতার জন্যে। তার লেখায় ছিলো আল্লাহর প্রেম, রাসূলের প্রেম। শিশু রচনায় মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন শিশু মনস্তত্ত্ববিদ এবং শিশুবন্ধু। তিনি শিশুদের আদর করতে করতে বলতেন-

পড়ো এবং পড়ো
যে পড়ে সে বড়ো
লেখার জন্য পড়ো
শেখার জন্য পড়ো।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক গ্রামেই লালিত পালিত এবং গ্রাম্য সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি তাকে মুগ্ধ কবি-আত্মার অধিকারী করেছে। বাংলার প্রাকৃতিক রূপ, গাঁয়ের সরল মানুষের প্রেম-প্রীতি, ঝগড়া-বিসংবাদ, আনন্দ-বিলাপ, ক্রীড়া স্ফূর্তি সবকিছুকে তিনি মমতার দৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে চক্ষুষ্মান করেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এই ঐতিহ্য ধারার অনুসারী। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের শিশুতোষ রচনায় তিনি এসব অনুসরণ অনুকরণ করলেও স্বীয় কর্মের প্রভাবে তিনি উত্তরসূরী হয়েও এ পথে এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশু সাহিত্য সাধনায় তিনি লোকজীবনের উপাদান ও

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের যথার্থ প্রয়োগে ছিলেন কুশলী। প্রচলিত গান, গজল ও লোকসাহিত্য সংগ্রহ করতে করতে তিনি বাংলাসাহিত্যে ইসলামী ধারার গান, কবিতা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তার লেখা ছড়া-কবিতা যেমনি শিশুদের আনন্দ দিয়েছেন,তেমনি তার লেখা অসংখ্য হামদ-নাত এবং আধুনিক ইসলামী গান শ্রোতাদের মন জয় করেছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সংগীতকে আধুনিক ভাবধারায় একমাত্র মতিউর রহমান মল্লিকই উজ্জীবিত করছেন।

যেমন-

পাখি তুই কখন এসে বলে গেলি
মোহাম্মদের নাম,
যে নাম শুনে পৃথিবীকে
ভালো বাসিলাম।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছোট-বড় সবার কবি। তিনি সবার জন্য লিখেছেন। অনেক অনেক লেখা তার। সে তুলনায় প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র সামান্য কিছু গান-কবিতা। তার অসংখ্য লেখা এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। তার লেখা প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের সাথে তোমাদের পরিচয় করে দিচ্ছি।

কাব্য : আবর্তিত তৃণলতা (১৯৮৭), অনবরত বৃক্ষের গান (২০০১), তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, চিত্রল প্রজাপতি, নিষণ্ন পাখির নীড়ে।

কিশোর কবিতা : রঙিন মেঘের পালকি (২০০২)।

গান : ঝংকার (১৯৭৮), যত গান গেয়েছি।

প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ।

সম্পাদনা : পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরে, প্রত্যয়ের গান।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন-সবুজ মিতালী সংঘ সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক, কলমসেনা সাহিত্য পদক, লক্ষ্মীপুর সংসদ সাহিত্য পদক, রাঙামাটি পরিষদ সাহিত্য পদক, খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠী সাহিত্য পদক, সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ সাহিত্য পুরস্কার (বাগেরহাট), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সাহিত্য পুরস্কার (বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, প্যারিস, ফ্রান্স), বায়তুশ শরফ সাহিত্য পুরস্কার (চট্টগ্রাম), বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ পুরস্কার, কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ও বাংলা সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন।

এই বড়ো মানুষটি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। ২০১০ সালের ১২ আগস্ট রাত সাড়ে বারোটায় তিনি আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি তার গানে বলেছেন-

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়।...

www.pathagar.com

অনবদ্য গানের সুরেলা পাখি

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিশ্বাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এক নামেই পরিচিত। কোটিভক্তকে অশ্রুজলে ভিজিয়ে তিনি পরপারে চলে গেছেন গত ১১ আগষ্ট দিবাগত মধ্যরাত্রিতে অর্থাৎ ১২ আগষ্ট ২০১০। ১৯৫৬ সালের ১ মার্চ বাগেরহাটের বাড়ইপাড়া থেকে যে শিশুর পথচলা শুরু হয়েছিল তা প্রভূর দরবারে পৌঁছে গেল মাত্র ৫৪ বছরের ব্যবধানে। আমরাও কে কখন সেই ডাকে সাড়া দেব তা মালিকই ভালো জানেন। এ নিবন্ধে কবি মল্লিকের সঙ্গীতবলয়কে নিয়ে সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনার প্রয়াস চালিয়েছি।

জীবন পরিক্রমার ভাঁজে ভাঁজে আবেগ অনুভূতির স্ফুরণই মূলত গান। ফুল-পাখিদের উচ্ছাস, নদীর ছলাৎ ছলাৎ বয়ে চলা এবং প্রকৃতির মনোহর রূপময়তার ছন্দই সঙ্গীতের আবহ। এককথায় সমকালের সমগীতই সংগীত; যা খেয়ালে কিংবা বেখেয়ালে সকল মানুষের হৃদয়বাঁশির সুরের মুর্চ্ছনায় উচ্চকিত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এর পথ চলা। পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত এর মায়াবী দেহে রঙ-রূপের বৈচিত্রময়তা এনে দেয়। ফলে সংগীত হয়ে ওঠে পবিত্রময়তার অপরূপ সৌন্দর্য কিংবা রুচিহীনতার নোংরা ফানুস।

এক

সংগীতের পথপরিক্রমা অদ্ভূত ছন্দের। 'শোনেন সবে নবীজীর ঐ হকীকত/ কেয়সা ছিল বেলালেরই মহব্বত; উড়িয়া যায়রে জোড় কবুতর মা ফাতেমা কান্দ্যা কয়/ আজ বুঝি কারবালার আগুন লেগেছে মোর কলিজায়' কিংবা 'এবারের মতন ফিরে যাও আজরাইল মিনতি করিয়া কই তোমারে/ আসমান জমিন চেহারা তোমার আজাবের ডান্ডা হাতেতে তোমার' ইত্যাদি গানগুলো এক সময় গজল নামে গাঁও গেরামের ওয়াজ মাহফিলে গাওয়া হত এবং গ্রামের সহজ সরল মানুষ বিশেষত গ্রামীণ ধর্মপ্রাণ মহিলাগণ দু'চোখের পানি ছেড়ে হৃদয় উজার করে এসব গান শুনতেন। শহুরে ওয়াজ মাহফিলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হাম্‌দ-নাতগুলো গাওয়ার চর্চা থাকলেও এগুলোকেও গজল নামে আখ্যা দেয়া হত এবং পূর্বোক্ত গানগুলোকেও গাওয়া হত গজল হিসেবেই। তবে শিতি এলাকার মাহফিলে (শহর-গ্রাম উভয়স্থানে) আল্লামা ইকবাল, রুমী, গালিব কিংবা শেখ সাদীর উর্দু ফার্সি গানের পাশাপাশি আরবী গানেরও প্রচলন লক্ষ্য করা যেত। তবে যাই গাওয়া হোক না কেন তাকে অবশ্যই 'গজল' নামে আখ্যায়িত করা ছিল বাধ্যতামূলক। কেননা সে সময় গান মানেই অশ্লীল কিছু এবং তা মসজিদ, মাদরাসা, ওয়াজ মাহফিল কিংবা মিলাদ মাহফিলে গাওয়া নাজায়েজ মনে করা হতো। যদিও উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীতে ঐতিহ্য ধারার চর্চা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই।

www.pathagar.com

শিল্পীসম্রাট আব্বাস উদ্দীন, আব্দুল আলীম, নীনা হামিদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠে ঐতিহ্য ধারার গান উচ্চারিত হলেও অনেক মুসলিম পরিবারে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখা যায়নি; বিশেষত ধর্মীয় মঞ্চে এগুলোকে না জায়েজ মনে করা হতো। এমনকি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যবাহী প্রেমময় হামদ-নাতগুলোও সর্বজনগ্রাহ্য ছিলনা। এমন সঙ্কটময় সময়েও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের একটি অংশ গানের এ ধারাকে বিশ্বাসের সহায়ক হিসেবে ধারণ করে। আলিম-উলামা শ্রেণী ক্রমশ বিভিন্ন মাহফিলে আরবি ফারসি কবিতার পাশাপাশি নজরুলের গান-কবিতাও কোটেশন হিসেবে কিংবা বক্তৃতার অলংকার হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকেন। ফলে পঞ্চাশের দশকের পর থেকেই এসব গান-কবিতা অনেক পরিবারে গ্রহণযোগ্য এবং অনেক রণশীল পরিবারেও সহনশীল হয়ে ওঠে। এমন বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশে সত্তর দশকের শেষ দিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নেতৃত্বে নতুন আঙ্গিকে ঐতিহ্য ধারার গানচর্চা শুরু হয়। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর সাংগঠনিক অবয়বে এ ধারা নতুন রসে সঞ্জিবীত হয়ে ওঠে। তফাজ্জল হোসাইন খান, আবুল কাশেম, তারিক মনোয়ার, হাসান আখতার, সাইফুল্লাহ মানছুর, সালমান আযামীসহ এক ঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী এ যাত্রায় সার্থক কাণ্ডারীর পরিচয় দেন। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী ঢাকা থেকে সংস্কৃতির এ বিশ্বাসী ধারায় যে নতুন আবহ সৃষ্টি করেছিল তা বিভিন্ন নামে এখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের হৃদয় অংগনে বিশুদ্ধ বিনোদনের খোরাক হিসেবে সমাদৃত। বিশেষত চট্টগ্রামের পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী, বগুড়ার সমন্বয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহীর প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠী, বিকল্প সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, খুলনার টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী, বরিশালের হেরাররশ্মি শিল্পীগোষ্ঠীসহ দুইশতাধিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্তমানে এ ধারার সংস্কৃতিকে লালন করে এগিয়ে চলেছে। এসবের পথচলায় মূলনায়ক হিসেবে কাজ করেছেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

দুই

কবি মতিউর রহমান মল্লিক কবি হিসেবে যেমন সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি সফল গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, সংগঠক এমনকি বিশ্বাসী সংস্কৃতির সমকালীন যাত্রায় সাহসী কাণ্ডারীও তিনি। ফররুখ আহমদ, আবদুল লতিফ, আজিজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, ফজল এ খোদা, সাবির আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা প্রমুখ গীতিকারগণ ঐতিহ্যধারার সঙ্গীত অংগনকে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে দিলেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর মতিউর রহমান মল্লিকই হামদ-নাত ও দেশজ অনুসঙ্গ নিয়ে ঐতিহ্যবাদী গানের সবচেয়ে সফল ও স্বার্থক গীতিকার এ কথা সন্দোতীতভাবেই বলা যায়। তাঁর গান শুধুমাত্র পবিত্রময়তার অপরুপ শোভাই নয়, বরং তা যেন গানফুলের সুগন্ধি মৌ।

বর্তমান ঐতিহ্যবাহী দেশজ অনুসঙ্গসমেত প্রচলিত ইসলামী সঙ্গীতের ভূবনে মতিউর রহমান মল্লিক একটি জনপ্রিয় নাম। তিন দশকের অধিককাল ধরে তিনি এ অঙ্গনে নতুন নতুন গান উপহার দিয়ে বিশ্বাসী শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় গান মানুষের মুখে মুখে।

ঈমানের দাবী যদি কুরবানী হয় / সে দাবী পূরণে আমি তৈরি থাকি যেন

www.pathagar.com

ওগো দয়াময় আমার প্রভূ দয়াময়;
কিংবা, আল্লাহর প্রশংসায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন এভাবে-
তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর / না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর
সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন / ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর
না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর।
অথবা, মুমিন কখনো মনভাঙ্গা হলে তিনি তাঁকে চাঙ্গা করেছেন এভাবে-
ভেঙ্গে যায় সবকিছু ভাঙ্গেনা তো মুমিনের মন
দীন কায়েমের কাজে কাটে তার সকল সময়
কাটে কার প্রতিটি ক্ষণ।
কিংবা
চলো চলো চলো মুজাহিদ পথ যে এখনো বাকী
ভোল ভোল ব্যথা ভোল মুছে ফেলো ঐ আখি।
আসুক কান্তি শত বেদনা শপথ তোমার কভু ভুলনা
সময় হলে দিও আযান তাওহীদের হে প্রিয় সাকী।

'পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় / মরন একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়; একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকেনা / যতই আসুক বাধাঁ যতই আসুক বিপদ / ভেঙে পড়েনা; কোন সাহসে চাও নেভাতে অগ্নিগিরি বলো/ চোখ রাঙিয়ে যায় কি রোখা জোয়ার টলোমলো; মাফ করে দাও এই পাপীরে / হে দয়াময় মেহেরবান, অনুতাপের অশ্রু আমার কবুল কর মহিয়ান; কিংবা টিকটিক টিকটিক যে ঘড়িটা বাজে ঠিকঠিক বাজে/ কেউকি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে; প্রভৃতি ছাড়াও তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় গান রয়েছে।

শিশুদের গান লিখতে গিয়ে তিনি নিজেকেও শিশু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এমন অনেক গান রয়েছে যা শিশুকিশোরকে শুধু আদর্শ জীবন গঠনেই উজ্জীবিত করেনা বরং সেগুলো দুষ্টোমি মাখা মিষ্টি বিনোদনও এনে দেয়। তাঁর গান দুষ্টোমিমাখা অভিমানী শাসনে শিশুদের মনকে সজাগ করে করে অবলীলায়।
খুব সকালে উঠলো না যে / জাগলো না ঘুম থেকে
কেউ দিওনা তার কপোলে / একটুও চুম এঁকে।
মাজলো না দাঁত অলসতায় / মুখ ধুলোনা কোন কথায়
লজ্জা দিও সবাই তাকে / আস্ত হুতুম ডেকে।
তবে একটা বিষয় ভীষণভাবে লনীয় যে, শিশুদের সাথে দুষ্টোমির সময়ও কিন্তু কবি মল্লিক প্রকৃতিকে ভোলেননি। এমনকি উপমা উৎপ্রোতেও মুন্সিয়ানা বজায় রেখেছেন, তবে তা অবশ্যই শিশুদের হজমযোগ্য-
ডাকলো দোয়েল টুনি টোনা / জলদি ওঠো খোকন সোনা
নইলে আগে উঠবে সুরুজ /আলোর কুসুম মেখে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কলমে এক অসাধারণ বৈচিত্রতেজ লনীয়। তাঁর কবিতায় গীতলতার স্বাভাবিক আবহ চোখে পড়লেও গান ও কবিতার ভাঁজে ভাঁজে পার্থক্যের দেয়াল খুব শক্ত। কাব্যের শব্দগাঁথুনিতে গীতলতার দোলা থাকলেও তা গানের শব্দভংগি থেকে

www.pathagar.com

পুরোপুরি ভিন্ন স্বাদের। এখানেই কবি মল্লিক এবং গীতিকার মল্লিকের এক অসাধারণ বৈচিত্রঘ্রাণ ভেসে আসে। কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। প্রতীতি ১ এবং প্রতীতি ২ তাঁর স্বকণ্ঠে গাওয়া অডিও এ্যালবাম। বিশ্বাসী চেতনাকে শাণিত করার প্রয়াসে নির্মিত এ এ্যালবাম দীর্ঘ দুই দশকের অধিককাল একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। এখনো তার সেই এ্যালবামের সুবাস বিশুদ্ধ সঙ্গীত অঙ্গনের বাইবেল বলা চলে। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু শতাধিক এ্যালবামে ছড়িয়ে থাকা তাঁর হাজারো গানের ভাষা, সুর-কণ্ঠ এবং প্রতীকের মোহনীয় ব্যবহার তৃষিত হৃদয়কে আজো তৃপ্ত করে তোলে। তাঁর সঙ্গীত বলয়কে ঘিরে সচেতনভাবেই মন্তব্য করা যায়- 'মতিউর রহমান মল্লিক শুধুমাত্র একজন গীতিকার-সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালকই নন বরং তিনি ছিলেন পবিত্রময়তার অপরুপ শোভায় সুশোভিত গানের জগতে একজন অনবদ্য গানের সুরেলা পাখি।'

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;

www.pathagar.com

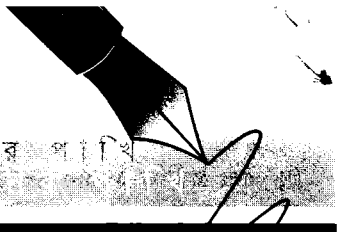

"কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে প্রথম ও শেষ দেখা"

এডভোকেট আনসার উদ্দিন হেলাল

আমার যতদুর মনে পড়ে। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৬৪ সালে। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আব্দুল মালেক ভায়ের শাহাদাত বরনের পর ইসলামী সংঘের প্রতিটি কর্মীর জিহাদের চেতনা দারুণভাবে উদ্বেলিত করে। ছাত্র সমাজের মধ্যে ইসলামের মৌল দাওয়াত পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংঘের শাখা গঠনের জন্য সকলে সচেষ্ট হন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বাগের হাট জেলার অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারুই পাড়া ফাজিল মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্রবৃন্দ ও ঐ গ্রামেরই কতিপয় কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিত্ব ঐ মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ছাত্র সংঘের একটি শাখা গঠনের জন্য আমি ও খুলনার জেলা দ্বায়িত্বশীল মতিউর রহমান খাঁন ঐ মাদ্রাসায় উপস্থিত হই। সেখানে আসরের নামাজ আদায়ের পর পশ্চিম-ত্রিশ জন ছাত্রের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিশেষ অতিথী হিসাবে আমার বক্তব্যের পর প্রধান অতিথী হিসাবে মতিউর রহমান খাঁন সাহেব যখন বক্তব্য শুরু করেন। ঠিক তখনই আব্দুল কাইয়ুম নামক এক তাগড়া যুবক ও আরো কিছু লোক এসে আমাদের সভায় চরাও হয়। মতিউর রহমান মল্লিক ও মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেব ভাগনে মোশারফ হোসেন খাঁন উপস্থিতদের মধ্যে বয়ে অনেক ছোট হওয়া সত্বেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ঐ অপ্রীতিকর অবস্থার মোকাবেলা করে উক্ত সভা পরিচালনায় সহযোগীতা করেন। পরে আমরা জানতে পারি যে উক্ত আব্দুল কাইয়ুম মতিউর রহমান মল্লিকের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এবং তিনি আওয়ামী লীগের একজন দু:সাহসিক কর্মী। মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে এখানেই আমার প্রথম পরিচয়। মল্লিকের বড় ভাই কবির সাহেব ছিলেন একজন নিবেদিত বামপন্থি ব্যক্তি। তিনি স্থানীয় মূলঘর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। তিনিও একজন সাহিত্যিক ও কবি। মতিউর রহমান মল্লিকের খুব শৈশবেই পিতৃ বিয়োগ ঘটে। সেকারনে তিনি বড় ভাইদের স্নেহে লালিত-পালিত হলেও পরবর্তীতে ছাত্র সংঘের সক্রিয় কর্মী হওয়ার পর বড় ভাইদের ভ্রাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি একদিকে যেমন ভাবুক হিসাবে সমাজে পরিচিত হন। অন্যদিকে একজন কবি, সাহিত্যিক ও গায়ক হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেন। তার গ্রাম বারুই পাড়া বহু পুরাতন সমবৃদ্ধ একটি জনপদ।ব্রিটিশ আমলের ধনাঢ্য হিন্দুদের বড় বড় দালান কোঠা। ঘাট বাঁধানো বিশাল দিঘী। পুকুর আজও সেই সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে চলছে। গ্রামটিতে স্থানীয় মুসলমানেরা একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন। নাম রাখা হয় বারুইপাড়া ফাজিল

www.pathagar.com

মাদ্রাসা। এই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, বাজার, ডাকঘর সবকিছুই এই গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে চলছে। এই গ্রামের নাম অনুসারেই ঐখানকার ইউনিয়নের নাম বারুইপাড়া ইউনিয়ন করা হয়।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতে পাড়ি জমালে ঐ খানের স্থানীয়রা যেমন- মল্লিক, সর্দার, হালদার, শেখ পরিবারের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা এসে ঐ খালি স্থান পূরণ করে। এই সমৃদ্ধির জন্যই গ্রামে অনেক সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে। মতিউর রহমান মল্লিক ছোট বেলায়ই ঐ এলাকার সাহিত্য সংসদ গড়ে তোলেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশ গ্রহণে করেন। তার ঐ গ্রামের সর্দার পরিবার আমার মায়ের মামা বাড়ি ও মোল্লা পরিবার আমার বড় ভাই এর মামা শশুর বাড়ি হওয়ায় শৈশব থেকেই ঐ গ্রামে আমার যাতায়াত ছিল। এরই সুবাদে ঐ গ্রামের অনেক লোকের সাথেই আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বারুইপাড়া ফাজিল মাদ্রাসার বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রথমদিকে শ্রতা ও পরবর্তীতে বহুবার বক্তা হিসাবে বক্তব্য দিয়ার সুবাদে মল্লিকের সাথে আমার একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সুবাদে মল্লিক আমার গ্রামের বাড়ি, শহরের বাড়ি এমনকি আমার শশুর বাড়িতেও নিয়মিত যাতায়াত করত। আর এজন্যই তার অনুপস্থিতি আমার পরিবারের সবাই গভীরভাবে অনুভব করি।

মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একজন স্বভাব কবি। মাঠে, ঘাটে, হাঁটে, পথে, প্রান্তরে, শহরে, বন্দরে, যেখানেই যখন তিনি গিয়েছেন, যে অবস্থায় থেকেছেন সেই অবস্থায়ই তিনি কবিতা, গান, রচনা করেছেন। তিনি গান রচনা করে নিজেই সুর করে গেয়ে শুনিয়েছেন। তার প্রতিটি গানের ও কবিতার মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহর জমিনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার আহ্বান।

তিনি ছিলেন বাঁধন হারা, কেমন যেন ছন্নছাড়া অথচ অতি বিনয়ি, ভদ্র, অনুগত, সরল-সোজা এবং ত্যাগি একজন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন তার সিদ্ধান্তে অটল ও কর্তব্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন নির্মহ, নির্লোভ, ত্যাগি ব্যক্তি। তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য কখনোই ভাবেননি। কলম, পত্রিকা, কলম, বি.আই.সি কত দিল বা পৃথিবী তাকে কত দিল তিনি তা ভাবেন্নি। সংসারে তার টানা পড়েন যতই থাকুকনা কেন, তিনি কোন কর্তৃপক্ষের কাছে বা কারো কাছে কোন অভিযোগ বা অনুযোগ করেননি।

মতিউর রহমান মল্লিক একাত্তরের পর বাগেরহাট, খুলনা মহকুমা ও জেলার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্র জনতার সামনে যখন দিনের মুক্ত আহ্বানের পথ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন তার কলমের আঁচড়ে বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে ততবেশী জোরে এবং হকের নাকরা বেজেই দেশ থেকে দেশান্তরে। তিনি দেশে ও দেশের বাইরে কবিতা, গান, গজল, ছড়া, প্রবন্ধ, গল্প, রচনা করেছেন। এছাড়াও অসংখ্য সাহিত্য সভায় তিনি আলোচনার মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি শুধু কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, আলোচকই ছিলেন না বরং ছিলেন একজন পাকা সংগঠকও। বিপরীত উচ্চারণ, সাইমুম, টাইফুন সহ দেশের স্থানীয়, জাতীয়ভাবে, এমনকি বাইরেও অনেক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। আর এই সংগঠনের অনেকগুলির পরিচালক ও ছিলেন তিনি নিজেই।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ, ইবনে সিনা হাসপাতালে। যখন তার ডায়ালিসিস করা হচ্ছিল। আমি ও আমার সেজ ছেলে মোঃ তানভীর ঢাকায় তাকে দেখতে যাই। আমরা সেখানে গিয়ে জানতে পারি তার ডায়ালিসিস হয়েছে। আমি আগে কখনো ডায়ালিসিস চিকিৎসা সরাসরি দেখিনি। কিন্তু জানতাম যে, এই অবস্থায় রোগীর সাথে সাধারণত কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমার পরিচয় পাওয়ার পর আমাকে সেখানে যেতে দেওয়া হলো। আমি গিয়ে তাকে সালাম প্রদান করলে তিনি অত্যন্ত আবেগ জড়িত কণ্ঠে উত্তর প্রদান করে আমাকে তার পাশে বসার জন্য বলেন। আমার হাতখানা তার বুকের ওপর অনেক কথা বলেন। আমি তার শরীরে লাগানো যন্ত্রগুলি দেখছিলাম ও মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনছিলাম। তার অত্যন্ত আবেগ জড়িত কিন্তু স্বাভাবিক ভাষায় বলা কথাগুলো আমি প্রাণ ভরে শুনছিলাম। কথার ফাঁকে তিনি তানভীরের লেখা-পড়ার খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তানভীর ইঅ Hons (Eng) তার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করেছে। পাশাপাশি জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও সেরা বক্তা হয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে তানভীরকে কাছে ডেকে তার বুকের ওপর মাথা নিয়ে অনেক দোয়া এবং পরে তার বুক পকেট থেকে পাঁচশত টাকার একটি নোট বের করে তাকে নিতে বাধ্য করেন। আমি তার এধরনের ব্যবহারে যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনি হতবাকও হলাম। আমি তার চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে তিনি বলেন

'আমার উচ্চতর চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দ্বায়িত্ব মীর কাশেম আলী ভাইকে দেওয়া হয়েছে। তিনি তো একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষ। টাকা পয়সা তার কাছে তেমন সমস্যা নয়। তবে সরকারী অসহযোগীতা এপথে বড় একটা বাঁধা এর পরেও আল্লাহর ইচ্ছা সবচেয়ে বড়। তাঁর পক্ষ থেকে বাইরে যাওয়ার ফয়সালা আসলেই সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই।"

আমি সাহিত্যিকের প্রতিটি কথার মধ্যে সাহিত্য খুঁজে পাচ্ছিলাম। পাচ্ছিলাম হৃদয়ে ছোঁয়া। আর বার বার মনে হচ্ছিল হয়ত এটাই তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। জানিনা আল্লাহর ফয়াসালা কি? আমি তার খাওয়া দাওয়ার খোঁজ-খবর নিতে লাগলে তিনি বলেন "ভাত তেমন খেতে পারি না। আলো চালের জন্ডি খুব পছন্দের। এটাই একবার করে খাই। বাইরের ফল তেমন একটা পছন্দের নয়, দেশীয় ফল আমলকি, জলপাই, পানি ফল ইত্যাদি তার বেশি প্রিয়। কিন্তু ঢাকার বাজারে এগুলো পাওয়া খুবই কষ্টের। এসব ফল বিক্রেতা বাজারের সামনের দিকে কোন জায়গা পায়না, বসে মূল বাজারের বাইরে। এছাড়া শিং মাছের ঝোল পছন্দ করি। কিন্তু তাও পাওয়া কষ্টের। টাকা-পয়সা সমস্যা নয়, সমস্যা এগুলো সংগ্রহ করা।"

আমি ব্যাথা ভরা হৃদয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকায় একটি পুরানো বাজারে ঢুকে মল্লিকের পছন্দের ঐ জিনিস গুলি সংগ্রহ করে হাসপাতালে এসে তার খেদমতে নিয়জিত তার কন্যার কাছে জিনিস গুলি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে, আল্লাহর কাছে তাকে সোপর্দ করে চলে আসি।

লেখক : আইনজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

www.pathagar.com

নাসির হেলাল

বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামী গানের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের পর যে নামটি স্বভাবতই উচ্চারিত সে নামটি আশির দশকের প্রধানতম কবি মতিউর রহমান মল্লিকের। মল্লিকের অনেক গানই সাধারণ্যে কাজী নজরুল ইসলামের গান হিসেবে পরিচিত। বর্তমান সময়ে বাদ্যবিহীন ইসলামী গান-জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়েছেন কবি, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক মতিউর রহমান মল্লিক। কবি মল্লিকের স্বকণ্ঠে উচ্চারিত গান যারা শুনেছেন, তারা বলতে পারবেন তিনি কতটা দরজা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মনটিও ছিল আকাশের মত উদার।

১৯৮৬ সালের কথা-তখন আমি ঝিনাইদহের মহেশপুর হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। মল্লিক ভাইয়ের লেখা একটা চিঠি পেলাম। খামের ওপরে আমার নামের পাশে 'গবেষক' শব্দটি ব্রাকেটের মধ্যে লেখা। মল্লিক ভাইয়ের নাম আগে থেকেই জানতাম-তাছাড়া ১৯৮১ সাল থেকে তাঁর সাথে পরিচয়ও ছিল। তবুও মল্লিক ভাইয়ের নিজের হাতে লেখা 'গবেষক' শব্দটি আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত ও অভিভূত করে। ওই চিঠিতে মল্লিক ভাই আমার লেখক নাম পরিবর্তন করার জন্যে বলেছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক লেখকের একটি সাহিত্য পদবাচ্য সুন্দর নাম থাকা প্রয়োজন। সে মতে ফেরত ডাকে ৩/৪ টি নামের প্রস্তাব মল্লিক ভাইয়ের কাছে পাঠাই। তার ভেতর থেকে তিনি নাসির হেলাল নামটি পছন্দ করেন। সেই থেকে আমি 'নাসির হেলাল' নামে পরিচিত।

মাসিক কলম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ওই সময় মল্লিক ভাই 'মুনসী মেহেরউল্লা'র ওপর প্রবন্ধ লেখার জন্য বলেন। সাথে সাথে বলেন যদি মুন্সী মেহেরউল্লার কোন অপ্রকাশিত পাণ্ডলিপি উদ্ধার করতে পারেন তো আপনার জন্য একটি বড় কাজ হবে। সে মোতাবেক অনেক চেষ্টা তদবিরের পর মেহেরউল্লা রচিত অপ্রকাশিত পাণ্ডলিপি 'মানব জীবনের কর্তব্য' তাঁর কনিষ্ঠপুত্র মুন্সী মোখলেসুর রহমানের (বর্তমানে মরহুম) কাছ থেকে উদ্ধার করি। 'মেহেরউল্লা'র ওপর লেখালেখি আগে থেকেই করতাম, কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় এর আরও গভীরে প্রবেশ করি। এর ফলে বর্তমান প্রজন্মের সামনে মুন্সী মেহেরউল্লাকে নতুন করে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

নানা কারণে নানা সময়ে নানা স্থানে এ মহান দরবেশ পুরুষটির সাথে মেশার সুযোগ হয়েছে। তাতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি এমন সংস্কৃতিবান, উদার, বন্ধুবৎসল এবং ঈমানদার মানুষ লাখেও একজন জন্মগ্রহণ করেন কিনা সন্দেহ। মল্লিকের তুলনা মল্লিক নিজেই। এমন মাটির মানুষ সমাজে বিরল। নিরহঙ্কার এ মানুষটির একটাই মাত্র কামনা

www.pathagar.com

ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা। আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক অংগনের কর্মী বাহিনীর ভূমিকা অগ্রগণ্য হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করতেন। আর সে কারণেই তিনি নানাভাবে এ অংগনকে চাংগা রাখার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু। ছাত্র জীবনে তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলেনের পাশাপাশি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন-তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এক সময় তিনি বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য গোষ্ঠীর পরিচালকও ছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঐতিহ্য সংসদেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এই ঐতিহ্য সংসদের ব্যানারে অনেকগুলো জাতীয় প্রোগ্রাম বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে উন্মুক্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতিউর রহমান মল্লিক মূলত কবি ও গীতিকার। আশির দশকে বাংলা কাব্য-আন্দোলন যে ঐতিহ্যিক দিকে বাঁক নিয়েছে, তার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনিই। তিনি বড়মাপের মৌলিক একজন কবি ছিলেন। অনেকের ধারণা কবি মল্লিক যদি শুধুমাত্র কবিতা, গান ইত্যাদি রচনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকতেন তাহলে কবি ফররুখের চেয়ে বড় না হোক অন্তত ফররুখের মাপের একজন কবি জাতি উপহার পেত। মতিউর রহমান মল্লিকের মধ্যে সেই মেধা, মনন ও শিল্পসত্তা উপস্থিত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর মেধাকে নানা বিষয়ে ব্যয় করেছেন, যে কারণে কবিতার ক্ষেত্রে আকাশ ছুঁতে পারার সামার্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তবে অবশ্যই তিনি বড় কবিদের একজন।

১৯৯০ সালের কথা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রথম এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল মান্নান তালিব অনিবার্য কারণ বশত সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালে দায়িত্ব এসে পড়ে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কাঁধে। কেন্দ্র তখন খুব ছোট একটি সংগঠন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলা শুরু করেছে কেবল। মগবাজার ওয়ারলেস-এর ডাক্তারের গলির-১৭৬ নং বাড়িতে তখন বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিস। এরই একটি রুমে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের অফিস ছিল। অফিস সরঞ্জামের মধ্যে ছিল একটা বাঁশের তৈরি ছোট র‍্যাক, ছোট একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর কিছু ফাইলপত্র। প্রতিদিন না হলেও প্রায়ই বিকালে মল্লিক ভাই কেন্দ্রের অফিসে আসতেন। ওই সময় কেন্দ্রের হয়ে যারা কাজ করতেন তারা হলেন, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম (মরহুম), মাহবুবুল হক, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, গোলাম মোহাম্মদ (মরহুম), শিল্পী আবুল কাশেম, তৌহিদুর রহমান, মুর্শিদ উল আলম এবং আমি সহ কয়েকজন।

আমি এবং তৌহিদুর রহমান যেহেতু বাংলা সাহিত্য পরিষদে কর্মরত ছিলাম সেহেতু সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের অনেক কাজ এমনিতেই আমাদের করতে হত। সেই সূত্রে কেন্দ্রের রুমটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়ও আমাদের ওপর ছিল। একদিন দেখি মল্লিক ভাই অফিসে ঢুকে কোন অভিযোগ বা উচ্চ বাচ্য না করেই ঝাড়ু হাতে রুমটির ঝাড় পোচ শুরু করেছেন। বুঝলাম দায়িত্বে অবহেলা করে ফেলেছি। সেদিন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিন্তু এমন সাহসও হয়নি ছুটে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ঝাড়ুটা নিয়ে নেই এবং কাজ শুরু করি।

মাসিক কলম পত্রিকার দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন মল্লিক ভাই। এ দায়িত্বটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিশীলিতভাবে পালন করতেন তিনি। লেখাগুলো কম্পোজে যাওয়ার

www.pathagar.com

আগে তিনি এতটাই যত্ন সহকারে দেখতেন যে কম্পজিটরের তা কম্পোজ করতে কোন অসুবিধাই হতো না। তা ছাড়া লেখা কাটা ছেড়া করে প্রকৃত লেখা তৈরিতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ।

মহম্মদপুরের গজনবী রোডে ছিল প্রত্যাশা প্রাঙ্গনের অফিস। এর দায়িত্বে মল্লিক ভাই থাকার কারণে কবি সাহিত্যিকরাও মৌমাছির মত সেখানে গুনগুন করতো। তাঁর ডাকে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার ও কবিতা পাঠের আসরে প্রায়ই যেতে হত। আমাদের মত দরিদ্র লেখকদের ব্যাপারটি তিনি সর্বদাই মাথায় রাখতেন।

প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে প্রায়ই বিভিন্ন কারণে কবি সাহিত্যিকদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হত। এসব অনুষ্ঠানেও মল্লিক ভাই আমার মতো সামান্য মানুষকে ডেকে পাঠাতেন।

মল্লিক ভাই সব সময় হৈ চৈ করে আনন্দ করতে ভালবাসতেন। হয়তো কারো একটি বই প্রকাশ হয়েছে। তার একটি কপি মল্লিক ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়া হল। তিনি আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন-এমন কি স্থান কাল পাত্রও ভুলে গেলেন। একটি উদাহরণ দেই– কবি গোলাম মোহাম্মদ (বর্তমানে মরহুম)-এর শিল্পকোণ-এ বসে আছি আমি, মল্লিক ভাই ও গোলাম মোহাম্মদ ভাই। এমন সময় জনৈক লেখক সদ্য প্রকাশিত একটি বইয়ের কপি মল্লিক ভাইকে দিলেন। মল্লিক ভাই বইটি পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন, এখনই এখানে এ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসব হয়ে যাক। মল্লিক ভাইয়ের কথা শুনে আমি তো অবাক। ৪/৫ জন লোক নিয়ে প্রকাশনা উৎসব। কিন্তু মল্লিক ভাই নাচার-পাশের হোটেল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পুরী-চা এসে গেল। মল্লিক ভাইয়ের সভাপতিত্বে আমরা কেউ প্রধান অতিথি, কেউ আলোচক বনে গেলাম। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত হলেন। জমজমাট প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেল। তাৎক্ষণিকভাবে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি লিখে কয়েকটি পত্রিকায় পাঠানো হলো। পরদিন যথারীতি প্রকাশনা উৎসবের খবরও প্রকাশিত হল।

টাকা পয়সা খরচ ও আয়ের ব্যাপারে মল্লিক ভাই অসম্ভব সৎ মানুষ ছিলেন। যখন তিনি কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন তখন দেখেছি তিনি ব্যক্তিগত টাকা পয়সা এক পকেটে রাখতেন এবং কেন্দ্রের টাকা পয়সা অন্য পকেটে রাখতেন। কেন্দ্রের খরচের বিষয়টা তিনি অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। লেন-দেন যাই হোক তিনি তা ডায়রীতে লিখে রাখতেন এবং এটা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস ছিল।

একেবারেই অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী মল্লিক ভাইয়ের পোশাক-আষাক ছিল নিতান্তই সাধারণ। পোশাকের মধ্যে তিনি পাঞ্জাবী ও প্যান্ট বেশি পছন্দ করতেন। খাওয়া দাওয়াও করতেন সাধারণ।

মেহমানদারীর ক্ষেত্রে মল্লিক ভাই ছিলেন অনন্য সাধারণ একজন মানুষ। বিভিন্ন সময়ে তাঁর কলম অফিসে, প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে, তাঁর নিজের বাসা যেখানেই গেছি আপ্যায়নের কমতি কখনো দেখিনি। যশোর থেকে যখন ঢাকায় এসে বি.আই.সির এলিফ্যান্ট রোডের অফিসে যেতাম তখন হোটেলে নিয়ে অনেক সময় লাঞ্চ পর্যন্ত করিয়েছেন। এখন ওই কথা মনে পড়লে লজ্জা লাগে। মল্লিক ভাই তখন কত টাকা ইনকাম করতেন? আর আমি নির্লজ্জের মত- তাঁর ওই সামান্য আয়ে ভাগ বসাতাম। এই হলেন মল্লিক ভাই।

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোহাম্মদ মারা গেলে মল্লিক ভাইসহ আমরা বেশ কয়েকজন লাশের সাথে গোলাম মোহাম্মদ-এর গ্রামের বাড়ি মহম্মদপুর গিয়েছিলাম। মৃত্যুর আগের রাতে সারারাত মল্লিক ভাই মৃত্যু পথযাত্রী গোলাম মোহাম্মদের শিয়রে ছিলেন। মাগুরার মহম্মদপুরে লাশ নিয়ে গেলে সেখানে এক বেদনা বিধূর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গ্রাম্য মানুষেরা রাত ১১ টা পর্যন্ত লাশের অপেক্ষায় ছিলেন। অপেক্ষমান হাজারো মানুষের উদ্দেশ্যে মতিউর রহমান মল্লিক ও সাইফুল্লাহ মানছুর ভাই বক্তব্য দেন। মল্লিক ভাইয়ের বক্তব্য শুনে উপস্থিত সব মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মল্লিক ভাই অসুস্থ হওয়ার প্রথম দিকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, আবেদুর রহমান ও আমি মল্লিক ভাইয়ের আদাবরের বাসায় তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর অসুস্থতার মাত্রা আমরা আগেই অবগত হয়েছিলাম। আমরা জেনেছিলাম মল্লিক ভাইকে রোগের ভয়বহতা সম্বন্ধে সব বলা হয়নি। আমরাও কথাবার্তা সেই মাপে বলবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম-যাতে অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর রোগের ভয়াবহতা প্রকাশ না পায়।

আমরা জানি তিনি মারাত্মক অসুস্থ। দু'টো কিডনিই তাঁর ড্যামেজ। তবু তিনি ওই অসুস্থ শরীর নিয়েই আমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করলেন। এমন কি আমার হাতে ক্রাচ দেখে (ওই সময় আমার বাম পায়ের পাতার একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল) বললেন, 'কি ব্যাপার পা তিনটে কেন? গবেষক যদি খোঁড়া হয় তো গবেষণার অবস্থা কী হবে?' বলেই জোরে হেসে উঠলেন।

ইসলামী গানের কথা উঠলে সর্বাগ্রে যে নামটি উচ্চারিত হয় সেটি কাজী নজরুল ইসলামের। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে নজরুল ইসলামের কয়েক হাজার গানের মধ্যে ইসলামী গানের সংখ্যা হাতে গোনা। অবশ্য তাঁর ইসলামী গানগুলো অসম্ভব জনপ্রিয়। কবি ফররুখ আহমদও বেশ কিছু ইসলামী গান রচনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি যত গান রচনা করেছেন তার সবই ইসলামী গান এবং তাঁর রচিত গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান রয়েছে যা বিপুলভাবে জননন্দিত। মানের বিচার কাল করবে। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে ইসলামী গানের ক্ষেত্রে তিনিই যে এগিয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মল্লিক ভাইকে একদিন ইবনে সিনা হাসপাতালে একাই দেখতে গেলাম। তখনও তিনি সংজ্ঞাহীন হননি। নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে দেখি একজন যুবক মল্লিক ভাইয়ের মাথার কাছে বসে মাথা টিপে দিচ্ছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে খালি টুলে বসতে ইংগিত করলেন। এরপর যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওনাকে চিনো কিনা? ছেলেটিকে কোন উত্তর দিতে না দিয়েই তিনি আমার নামের সাথে নানা বিশেষণ লাগিয়ে নামটি বললেন। ছেলেটি এবার বললেন, মল্লিক ভাই, আমি নাসির হেলাল ভাইকে আগে থেকেই চিনি। তখন মল্লিক ভাই বেহেশতী হাসি ছড়িয়ে বললেন, বড় মানুষদের সবাই চিনে।

এসব বাৎচিতের মধ্যে আমি একটু অশ্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার এ মুহূর্তে কি করা উচিৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এহেন বিপদ থেকে মল্লিক ভাই-ই আমাকে উদ্ধার করলেন-তিনি শোয়া অবস্থায় পাশের থেকে আপেল এগিয়ে দিয়ে বললেন, খান। খেতে

www.pathagar.com

খেতে অনেক কথা হল-অবশ্য বেশির ভাগ কথা উনিই বলেছেন, একজন ভালো শ্রোতা হিসেবে আমি শুনেছি।

অনেক আগেকার কথা-মল্লিক ভাই একবার টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন ওনাকে যক্ষা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বেশ সময় ধরে তিনি ওই হাসপাতালে ছিলেন। ওখানে কয়েকদিন দেখতে গিয়েছিলাম। মল্লিক ভাই ওই সময় ডাক্তারের পরামর্শে নাকের ওপর দিয়ে একটি পরিষ্কার রুমাল বেঁধে রাখতেন। যাতে হাঁচি কাশির সাথে ওই রোগের জীবাণু অন্যকে সংক্রামিত না করে।

হাসপাতালে থাকার সুবাদে ওই সময় ওখানকার এক দঙ্গল কাক এর সাথে মল্লিক ভাইয়ের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। উনি তাদের দুবেলা খাবার খাওয়াতেন। কাকগুলো নির্দিষ্ট সময়ে এসে খাবার খেয়ে আবার চলে যেত। এ সময় মল্লিক ভাই প্রচুর পড়াশুনা করতেন। বহু বইয়ের সমাবেশ ছিল তাঁর বেড এর পাশে।

মল্লিক ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে ওই সময় পত্রিকায় লেখা হয়েছিল। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত ভাইয়েরা এতে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমি মল্লিক ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম-চিকিৎসার জন্য কোন সাহায্য পাওয়া গেল কিনা। মল্লিক ভাই হেসে বললেন, 'আরে মিয়া রীতিমত বিপদের মধ্যে আছি। এত বিপুল সাড়া যে, যা প্রয়োজন নেই। এখন বন্ধ করা দরকার।'

তিনি জীবদ্দশায় নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। অগণন মানুষের ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন। মানুষ মল্লিক ছিলেন তুলনাহীন। হাবশী ক্রীতদাস হযরত বিল্লাল (রা.)-এর মত কালো না হলেও মল্লিক ভাইয়ের গায়ের রং কালোই ছিল। কিন্তু এই কালো মানুষটির হৃদয়টি ছিল একেবারেই ফক্‌ফকে সাদা আর একজন মুমিন মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সাহাবী বেলাল (রা.) অনুসারী।

মল্লিক ভাইয়ের ইন্তেকালের খবর পেয়েছিলাম মহম্মদপুরের কোন এক কলেজের অধ্যাপিকা ফাতেমাতুজজোহরা আপার কাছ থেকে। সেদিন সেহ্‌রী খাওয়া কেবল শেষ করেছি-এমন সময় মুঠো ফোনে এ খবর।

মল্লিক ভাই আজ নেই। আমরা আছি। আমাদের দায়িত্ব তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সমাপ্ত করা। সাথে সাথে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা। আমরা মহান, রাব্বুল আলামীনের কাছে তাই মল্লিক ভাইয়ের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁকে যেনো বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান জান্নাতুল ফেরদৌস দান করা হয়। আর তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

লেখক : গবেষক এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

খানজাহানের দেশে কবি মতিউর রহমান মল্লিক গড়ে গেলেন অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার

শেখ মিজানুর রহমান

এক

গানের পাখি কবি মতিউর রহমান মল্লিক

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন মিল্লাতের গৌরব, দুর্যোগের রাহবার। অন্ধকারের আমানিশায় হেরার গুহা থেকে উৎসারিত আলোকিত রাজপথে সত্যের মশালবাহী জিন্দাদিল মুজাহিদের নাম। জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে দিশার ধ্রুবতারা। 'As the stars that are starring in the time of our darkness:' জাতির বধির কর্ণে কানফাটা চিৎকার দিয়ে যিনি গান শুনিয়ে দিলেন " রসুলুল্লাহর উম্মত আমি এক খোদার বান্দা বাতিলের উৎখাতে আমার হয়েছে পয়দা। আশ্রাফুল মাখলুকাত আমি খলিফা আল্লার তাগুতের উচ্ছেদ পয়দায়েশ আমার"। কবিকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার গাওয়া শ্রেষ্ঠ গান কোনটি? তিনি বললেন, তুমিই বল। আমি বললাম 'চলো চলো চলো মুজাহিদ পথ যে এখনও বাকী। ভোল ভোল ব্যথা ভোল মুছে ফেলো ঐ আখি'। মল্লিক ভাই কিছু না বলে গেয়ে উঠলেন " রসুলুল্লাহর উম্মত আমি অর্থাৎ ওপরের গানের কলি, তিনি বললেন এই গানে আমার মহান সৃষ্টিকর্তার একাত্ববাদ তথা তাওহীদের স্বীকৃতি রয়েছে। তবে তুমি যে গানটির কথা বললে, তারও একটি স্মৃতি আছে। এরপর আর কিছুই বললেন না। আমি অন্য একজন দায়িত্বশীল থেকে জেনেছি যে, বাগেরহাটের প্রত্যন্ত এলাকায় তিনি বাগের হাটের কৃতি সন্তান মুজাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে সাংগঠনিক সফরে গিয়েছিলেন। সাথে টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পায়ে হেটে গেলেন। নদীও সাঁতরিয়ে পার হয়েছিলেন ক্ষুধায় কবি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, জ্ঞান ফিরে এলে সফরের সাথী মুজাহিদ ভাইকে প্রথমতঃ উদ্দেশ্য করে তিনি গেয়ে উঠেন "চলো চলো চলো" মুজাহিদ, পথ যে এখনও বাকি। সত্যের পথে মুক্তির পথে অনাগত মুজাহিদের জন্য কবির এ বেদনার ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন। কবিতা ও গানে তাওহীদের এমন স্বীকৃতি দেশের সহিত্য অঙ্গনে আর নেই। কবি শুধু কবিতাই লেখেননি, আল্লার জমিনে আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ঘুরে ফিরেছেন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। যা আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়।

দুই

খানজাহানের দেশে যোগ্য উত্তরসূরী

জীবন-মরণের এই স্রোত ধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসি। কিন্তু এই অখন্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিৎ দু'একটি জীবনের সন্ধান মেলে যা সব বিষয়ে সাধারণ থেকে অসাধারণ স্বতন্ত্র। মহাকালের তুলনায় মানুষের জীবনকাল অতি সামান্য; বলতে গেলে সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পানি। এই স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের মধ্যেও চরিত্র, আদর্শ,

www.pathagar.com

মহানুভবতা এবং মানবকল্যাণকামী ব্যক্তিরা স্মরণীয়, অনুকরণীয় এমন কিছু রেখে যান যা অনুজদের জন্য অনুপ্রেরণার মাইল ফলক হয়ে থাকে চিরদিন। কবির জন্ম যেখানে সেই জনপদে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য একদা এসেছিলেন কর্মবীর খানজাহান আলী। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তারই সার্থক উত্তরসূরী কেননা ইসলামে উত্তরসূরীর পরিচয় হয় কেবল মাত্র কাজের মাধ্যমে।

তিন

প্রথম দেখার স্মৃতি ভুলবোনা কোন দিন

১৯৭৮ সালের কথা বিভিন্ন মাহফিলে একটি ইসলামী সংগীত আমাকে দারুণভাবে আড়োলিত করতো। তাহলো- "মুসলিম আমি সংগ্রামী চির রণবীর, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানিনা নারায়ে তাকবীর" যশোর থেকে 'ঝংকার' নামে একটি বইও কিনেছিলাম বইটির লেখক কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তখন থেকে মল্লিক ভাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আমার হৃদয় ছুয়ে যায়। ৮১ সালের জাতীয় কর্মী সম্মেলনে তাকে দেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। ১৯৮৩ সালের শুরুর দিকে একদিন। তখন আমরা খুলনা মহানগরীর সাথী। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার জন্য সেক্রেটারী জেনারেল সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ভাইয়ের সাথে মল্লিক ভাইও খুলনায় আসেন। দৌলতপুর বাজার মসজিদে এক সাথী বৈঠকে তিনি দারস-ই কুরআন পেশ করলেন। এমন দার্‌স আমি আর শুনিনি। দার্‌স শোনার সাথে আমি তাকিয়ে শুধু দেখেছিলাম আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন মল্লিক ভাইকে। সাথী বেঠকের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, সমস্যা বেশ জটিল। এমতাবস্থায় মল্লিক ভাই সাথী বৈঠকে গান গেয়েছিলেন 'যা কিছু করতে চাও করতে পার, অনুরোধ শুধু এই ঘর ভেঙ্গোনা'। এই গানটি শেষ হতে না হতেই আমাদের অনুরোধে আরো একটি গান গাইলেন " সংগঠনকে ভালবাসি আমি, সংগঠনকে ভালবাসি এই জীবনকে গড়বো বলে বারে বারে তার কাছে আসি। এই গানের পরে সাথীরা হু,হু করে কেঁদে উঠল। অনেক্ষণ ধরে আমরা কেঁদেছিলাম। এতেই সমাধান হয়ে গেল সমস্যার। অর্থাৎ মল্লিক ভাইয়ের গান দিয়ে বড় একটি সমস্যা মিটে গেল বৈঠক শেষে মল্লিক ভাইয়ের সাথে পরিচিত হলাম, তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই স্নেহের উষ্ণতা আজো আমাকে আপ্লুত করে। তারপর যখনই ঢাকায় এসেছি মল্লিক ভাইকে না দেখে আর যাইনি।

চার

সাদামাঠা জীবনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

১৯৮৮ সালের কথা মল্লিক ভাই তখন ইসলামীক সেন্টারে চাকুরী করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে শিবিরের একটি শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত কাজে মল্লিক ভাইয়ের বাসায় গেলাম। আজিমপুরে বাসা। ছোট ছোট দু'টি কামরা, নিচে কাঁচা, একখানা চৌকি, বাঁশের চটা দিয়ে তৈরী একটি সেল্‌ফে, অনেক বই। আসবাব পত্র বলতে এই। নেই সোপা, নেই চেয়ার, খাটে তোষক পর্যন্ত নেই। অতি সাধারণভাবে জীবন-যাপন। নিজে পরতেন খদ্দর পাঞ্জাবী, পাজামা। এতটা আর্থিক কষ্টে থাকার পরও কেউ তার অফিসে গেলে মেহমানদারী না করে ছাড়তেন না। ১৯৯৩ সালে মল্লিক ভাই তখন মাদারটেকের শেষ প্রান্তে দু'কামরার ছোট একটি বাসায় থাকেন। সেখান থেকে কাঁটাবন অনেক দুর। তিনি হেটেই অফিস করতেন। একদিন একটি অনুষ্ঠানে মল্লিক ভাই প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠান শুরুর ৫মিনিট

www.pathagar.com

বাকী। প্রধান অতিথি মল্লিক ভাই তখন ও আসেননি। মোবাইলের যুগ তখনও শুরু হয়নি। হঠাৎ দেখি মল্লিক ভাই এসেছেন, ঘামে পাঞ্জাবী পাজামা ভিজে টপ টপ পানি পড়ছে অর্থাৎ উনি মাদার টেক থেকে হেঁটে এসেছেন। এই দুরত্ব প্রায় ৮-১০ কিলোমিটার।

পাঁচ

একটা স্মৃতি কেবলই বাড়ায় কষ্ট আমার

মল্লিক ভাই তখন মাদারটেকে থাকেন। ঈদের আগে কেন্দ্রীয় সভাপতির সিদ্ধান্তক্রমে আড়ং থেকে একটি ভালো পাঞ্জাবী-পাজামা এবং কটি কিনে আমি ও খুলনার গোলাম কুদ্দুস ভাই মল্লিক ভাইয়ের বাসায় গেলাম। বাসাটি মাদারটেকের শেষ প্রান্তে। অনেক খোঁজাখুজির পর বাসাটি পেয়ে গেলাম। উপহার সামগ্রী মল্লিক ভাইকে দিলাম, উনি বললেন এত দামী পোশাকে আমাকে মানায় না। আমরা জোর করেই পরিয়ে দিলাম পাঞ্জাবী ও কটি। অনেক্ষণ কথাবার্তা সেরে আমরা বিদায় নিতে যাচ্ছি এমন সময় মল্লিক ভাই বললেন, তোমরা একটু বসো। মল্লিক ভাই ভেতরে গেলেন, কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। দেখি একমুঠো চাল নিয়ে এসেছেন, আমাদের দু'জনের হাতে চাল দিলেন এবং বললেন বাসায় তোমাদের মেহমানদারীর মতো কিছু নেই। তোমার ভাবী খুবই অসুস্থ। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এটা খেয়ে নাও। কোন বাসায় গেলে মেহমানকে কিছু না খাইয়ে বিদায় দেয়া আল্লার রাসুলের সুন্নতের খেলাপ। আমরা সেই চাল আর পানিতে অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলাম। যখন ফিরে আসছি তখন মনে এই ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল যে, আজ হয়তো মল্লিক ভাই ও বাচ্চারা না খেয়েই রাত কাঁটাবেন।

ছয়

কাজে একনিষ্ঠ মল্লিক ভাই অনুকরণীয় আদর্শ

১৯৯১ সালের কথা মল্লিক ভাইয়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠল ঐতিহ্য সংসদ। সিরাতুন্নবী (স:) উপলক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমিতে নাতে রসুল সন্ধ্যা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই প্রথম মল্লিক ভাইয়ের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনুষ্ঠানে রেডিও টিভির স্বনামধন্য শিল্পী ও দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত শিল্পীরা যে, নাতে রসুল পেশ করেন, তা উপস্থিত সকলের প্রাণ ছুয়ে যায়। সব মিলে অনুষ্ঠান দারুণভাবে সফল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অনুষ্ঠান শেষে মল্লিক ভাইকে সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। মল্লিক ভাই সভাপতির বক্তব্য রাখবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। অনেক অনুরোধের পর দু'টি কথা বললেন। এতে করে আমার মনে হয়েছিল মল্লিক ভাই কাজের সফলতার জন্য শুধু মহান রাব্বুল আলামীনের রেজামন্দি হাসিল করতে চাইতেন। মানুষ তার জন্য প্রশংসা করুক তা তিনি কখনও চাইতেন না। ঢাকার বাইরের শিল্পীদের আসা-যাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীদের সম্মানী তো দুরের কথা ভাড়া পর্যন্ত দিতে পারছেন না। এমতাবস্থায় আমাকে বললেন কোথাও থেকে ঋণ করে তাদের যাবার ব্যবস্থা কর। পরের মাসে মল্লিক ভাই টাকা দিয়ে দিলেন। নির্ঘাত এই ঋণ শোধ করেছিলেন তিনি বেতন পেয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে ঐতিহ্য সংসদের উদ্যোগে বিশাল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

সাত

মল্লিক ভাই আমাদের ক্ষমা করে দিও

মল্লিক ভাইয়ের শ্রেষ্ঠতম একটি গানের কলি যা তিনি প্রমান করে ছাড়লেন। তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে যক্ষ্মা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় শরীরের প্রতি অযত্ন অবহেলার জন্য এমনটি হয়েছে। নিজের কথা তিনি কাউকে বলতে চাইতেন না। কিডনি বিকল হলে দীর্ঘদিন বিছানায় কাটিয়েছেন। ***মল্লিক ভাইয়ের মেয়ে জুম্মি নাহদিয়ার কথায় " যতটুকু পাথর হলে একটা মানুষ তিলে তিলে নিজের ঝাঝরা হয়ে যাওয়া সহ্য করতে পারে, অমানুষিক যন্ত্রণা হয়েছে শরীরের ভেতর কিন্তু কাতরাতে দেখিনি একদিনও। খুব বেশী কষ্ট হলে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকেছে অথবা চোখ বুঁজে থেকেছেন কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেছেন ধৈর্য ধারণের দোয়া। কিন্তু কারো কাছে কোন সাহায্য চাননি। অথবা কষ্টের কথা বলেননি"***। মহান প্রভূর করুণায় যার জীবনধন্য তিনি কারো সাহায্য নিবেন কেন? তিনি শুধু দিয়েই গেলেন নিলেন না কিছুই। স্মৃতিচারণের লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহত হয়ে একবার, ব্রেনটিউমার অপারেশন হয়ে দ্বিতীয়বার দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলো। মল্লিক ভাই শত ব্যস্ততার মাঝে প্রায়ই আমাকে দেখতে আসতেন, সান্ত্বনা দিতেন, হাতে টাকাও গুজে দিতেন পছন্দ মতো পথ্য খাওয়ার জন্য। হায়! আফসোস আমি মল্লিক ভাইয়ের জন্য এতটা করতে পারিনি। মল্লিক ভাই আদালতে আখেরাতে আমাকে মাফ করে দিও।

আট

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

কিডনি রোগে ডায়ালাইসিস করে অনেকে বছরের পর বছর বেঁচে থাকেন। কিন্তু মল্লিক ভাই খুব কম সময়েই চলে গেলেন মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে। তিনি নির্ভর করতেন শুধু মহান রাব্বুল আলামিনের উপর। কারো কাছে সাহায্য চাইতেন না, ঠিক মৃত্যুর পূর্বেও তা প্রমাণ করে গেলেন। মল্লিক ভাইকে দীর্ঘদিন স্কয়ার হাসপাতালে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। তা মনে হয় মাসের সেরা মাস রমজানুল মোবারকের জন্যই ছিল এ অপেক্ষা। ঠিক রহমত মাগফেরাত ও নাজাতের এই রমজানের রহমত অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি চলে গেলেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়। মল্লিক ভাই সৌভাগ্যেবানদের একজন। হায়! আফসোস এই সৌভাগ্যেবান মানুষের কফিনটি জানাজার পরে যখন বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে দর্শনার্থীদের শেষ দেখার জন্য রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ মাইকে ঘোষণা করলেন ১ মিনিটের মধ্যে কফিন সরাতে হবে। চিনল না বায়তুল মোকাররমের কর্তৃপক্ষ, চিনল না আল্লাহর প্রিয় অতিথিকে, চিনল না বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির পুরোধা মহান এই কবিকে। অত:পর মনের অজান্তেই গেয়ে উঠলাম মল্লিক ভাইয়েরই একটি গানের কলি "জানি আরো বেশী বেঁচে আছো ওগো সংগ্রামী"।

লেখক : সাবেক সদস্য, কেন্দ্রীয় ইতিহাস ঐতিহ্যবিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

মু: আমিনুল ইসলাম

মতিউর রহমান মল্লিক। কবে কোন দিন তার সাথে আমার পরিচয় দিনক্ষণ মনে নেই। আমি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে খুলনা শহরে যাই। মাথা গোজার ঠাঁই নেই। বি.এল কলেজের অধ্যাপক সাইদুজ্জামান সাহেবের মেসে উঠি। তিনি আমাকে যত্ন করে তার বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিন মাসের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হলাম। কাকে কোথায় দায়িত্বশীল করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ হলো। মরহুম মাওলানা শামসুল হক আমাদের নেতা। বাগেরহাট মহকুমার (বর্তমানে জেলা) দায়িত্ব দেয়ার প্রশ্নে মতিউর রহমান মল্লিকের নামটি প্রস্তাব করা হয়। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল তার সাথে যোগাযোগ করার। খুলনা টু বাগেরহাট ট্রেনে উঠে ফকিরহাট নেমে পায়ে হেঁটে বারুইপাড়া রওয়ানা হলাম। মল্লিক ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে দেখি মল্লিক ভাই একদল লোকের সাথে অন্যগ্রামে হা-ডু-ডু খেলতে যাচ্ছে। আমাকে দেখে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেসে সালাম দিলেন। তখন তার পায়ে কোন জুতা বা স্যান্ডেল ছিল না। খালি পায়ে তিনি যাচ্ছেন। আমার আসার কারণ জিজ্ঞাস করলেন। আমি উত্তরে বললাম, আন্দোলনের কাজে আপনাকে খুলনা যেতে হবে। তিনি কোন প্রশ্ন না করে বন্ধুদেরকে বিদায় দিয়ে আমাকে বললেন চলুন। সে অবস্থায় আমার সাথে খুলনা চলে আসলেন। মরহুম শামসুল হক ভাই তাকে বাগেরহাটে কাজ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

তখন বাগেরহাট শহরে মুফতি আবদুস সাত্তার সাহেব এক মাদরাসার অধ্যক্ষ। তার সাথে পরামর্শ করে মল্লিক ভাইয়ের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। তিনি ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছানো শুরু করে দিলেন। অভাব আর দৈন্য তখন আমাদের সকলের পিছনে লেগে থাকতো। কখনো খেয়ে, কখনো না খেয়ে আমরা জীবন যাপন করতাম। আন্দোলনের কাজের জন্য একটা গোলপাতার ঘর ভাড়া নেয়া হলো। বাগেরহাট সরকারি স্কুলের বেশ কিছু ছাত্র ইতিমধ্যে আমাদের আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করে নিয়েছে। একদিন তাদের সকলকে ঐ গোলপাতার ঘরটিতে একত্রিত করা হলো। হাফেজ সুলতানের দায়িত্ব ছিল সরকারি স্কুলে কাজ করা। নাসের ভাই প্রধান অতিথি। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চললো। নাসের ভাইয়ের বক্তব্য উপস্থিত সকলকে বিমোহিত করল। সেই থেকে শুরু হলো বাগেটহাটে ইসলামী আন্দোলনের কাজ।

আমি মাঝে মাঝে মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে বাগেরহাট যেতাম। একদিন দুপুর বেলা মল্লিক ভাই আমার সামনে প্লেটে কিছু ভাত তার উপর আধাসিদ্ধ একটি ডিম দিয়ে আমাকে বললেন, আমিন ভাই আপনি খেতে থাকেন, আমি গোসল করে পরে খাব। এই কথা বলে তিনি গোসল করতে চলে গেলেন, আমি রান্না ঘরে গিয়ে ভাতের হাড়ির মুখ উঠিয়ে দেখি পাতিলের তলায় ক'টা ভাত সাথে দুটো ঢেঁড়স সিদ্ধ। অর্থাৎ মল্লিক ভাই তাই

www.pathagar.com

দিয়ে খাবেন। এ অবস্থায় আমি ভাত খেলাম না, তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আসলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি খাননি কেন জবাবে আমি বললাম, আপনার অপেক্ষায় আছি। একসাথে খাব। তিনি আমার কথায় হতচকিত হয়ে গেলেন। পরে যা ছিল তাই দিয়ে দুজনে একসাথেই খেলাম।

সংগঠনের কাজে বাগেরহাট থেকে কচুয়া মাঝখানে মাধবকাঠি সফরের সিদ্ধান্ত নিলাম। দূরত্ব একুশ মাইল। অর্থের অভাবে হেঁটে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই ভাই রওয়ানা হলাম সকাল আটটায় বাগেরহাট থেকে। মাধবকাঠি পৌঁছলাম এগারটার দিকে। সেখানে সংগঠন কায়েম করে কচুয়া রওয়ানা হলাম। কচুয়া পৌঁছলাম বিকাল চারটায়। সেখানে দয়িত্বশীল আমিনুল ইসলাম আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে কর্মসূচি শেষ করে বাগেরহাট রওয়ানা হলাম। আবার হাঁটা, শরীর আর চলে না। সাইবোর্ড নামক জায়গায় এসে একটা ভ্যান পেলাম। ভ্যানটিতে আরো কিছু যাত্রী নিয়ে বাগেরহাট যাচ্ছিল। আমরা দুজন কোন মতে ভ্যানে উঠে বসলাম। ভ্যান চলছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থা দুজনেরই। কিছুক্ষণ পর দেখি মল্লিক ভাই দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত দশটায় গোলপাতার ঘরে এসে পৌঁছলাম। এত রাত, খাবার ব্যবস্থা করা গেল না। না খেয়েই ঐ রাতে ঘুমিয়ে থাকলাম।

মল্লিক ভাইয়ের সাথে একবার সফরে গেলাম রামপাল। প্রচন্ড বৃষ্টি। গ্রোগ্রামস্থলে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। তাও আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাঁচা রাস্তা। হাঁটু পরিমাণ কাদা। কিছুই দেখা যায় না। আমাদেরকে তো প্রোগ্রামস্থলে যেতেই হবে। মল্লিক ভাইয়ের রাস্তাঘাট চেনা ছিল। তিনি আমাকে বললেন আপনি শুধু আমার শার্ট ধরে রাখবেন। আর আমার সাথে সাথে পা বাড়াতে থাকবেন। এভাবে এক মাইলেরও বেশি রাস্তা হেঁটে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। যাদের আসার কথা ছিল সবাই ছিলেন। কাজ শেষ করে পরের দিন সকালে যার যার কর্মস্থলে আমরা চলে গেলাম।

একদিন রাতে আমরা একটা বাড়িতে একত্রিত হলাম। লোক মোট আটজন। মশারী একটা। রাতে ঘুমাবার কি উপায়? মল্লিক ভাই পরামর্শ দিলেন- মশারীটা মাঝখানে টানাতে। আর চতুর্দিক থেকে আটটা মাথা মশারীর ভিতর ঢুকাতে বললেন। শরীরের বাকী অংশটুকু অন্য কাপড় দিয়ে ঢাকা হলো। এভাবে সে রাতে ঘুমিয়েছি আমরা।

মল্লিক ভাই এক ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কষ্ট করতে পারতেন, না খেয়ে থাকতে পারতেন। নিজের অভাবের কথা কাউকে কখনো বলতেন না। পরের জন্য নিজের সব কিছু উজাড় করে দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড অভিমানী। আন্দোলনের দুর্দিনে একসাথে তিন বছর কাটিয়েছি। ১৯৭৬ সালে আমি ডিগ্রি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর মূলত মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাত ছাড়া মল্লিক ভাইকে নিয়ে এক সাথে থাকার ব্যবস্থা হয়নি।

আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি- হে আল্লাহ তুমি তাঁকে (মল্লিক ভাইকে) মাফ করে দাও, তাকে রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল কর। তার গুনাহসমূহকে পানি ও শিলা রাশি দ্বারা ধৌত করে দাও। তার গুনাহসমূহ এভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি দান কর। তাকে তার আহলের চেয়ে উত্তম আহল দান কর। তাকে তার সংগীর চেয়ে উত্তম সংগী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তার কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে হেফাজত কর। আমীন।

লেখক : সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক--- কিছু টুকরো স্মৃতি

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রিয় একটি নাম। একটি প্রতিষ্ঠান। একটি আন্দোলন। হাজারো হৃদয়ে তিনি অতি কাছের; অতি আপনজন। আমার মত লাখো মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। মল্লিক ভাইয়ের ভক্ত আমি ছোট বেলা থেকেই। আমাদের এলাকার একটি দোকানে তাঁর গানের ক্যাসেট বাজত। তাঁর গান শোনার জন্য অনেক দুর থেকে হেঁটে উক্ত দোকানে যেতাম আর তন্ময় হয়ে শুনতাম। আজও তাঁর গান শুনে আবেগ তাড়িত হই। নানা সংকটকালে তাঁর গান শুনে কর্মপ্রেরণা লাভ করি। তিনি হৃদয় দিয়ে গান রচনা ও পরিবেশন করতেন। তাই তাঁর গান সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর গানের প্রতিটি কলি, প্রতিটি শব্দে বিরাট যাদুকরী প্রভাব রয়েছে।

মল্লিক ভাইকে দেখার জন্য আমি ছোট বেলা থেকে উদগ্রীব ছিলাম। ১৯৮৪ সালে সম্ভবত তাঁর সাথে প্রথম দেখা হয়। একটি সম্মেলনে তিনি অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। সেই দিন তিনি দুটি গান পরিবেশন করেন। গান দু'টি হচ্ছে...

১. সংগঠনকে ভালবাসি আমি সংগঠনকে ভালবাসি/
   এই জীবনকে গড়ব বলে বারে বারে তার কাছে আসি
২. এই বুক ভাঙতে চাও ভাঙতে পার/
   অনুরোধ শুধু এই ঘর ভেঙোনা

মনের আবেগ মিশানো তাঁর গান শোনার সময় উপস্থিত সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে উঠে। আমিও নিজকে সংবরণ করতে পারিনি। মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় দীর্ঘক্ষণ।

ঢাকায় থাকতে মাঝে মধ্যে মল্লিক ভাইর সাথে দেখা করতে যেতাম। লন্ডনে আসার পর বাংলাদেশে গেলে মল্লিক ভাইর সাথে দেখা করতে প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে ছুটে যেতাম। ভবিষ্যতে হয়তবা প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে যাওয়া হবে। কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা করার প্রত্যাশা নিয়ে আর কখনও যাওয়া হবেনা। কখনও প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে গেলেও আদর মাখা কণ্ঠে পাশে বসতে বলবেন না। মল্লিক ভাইয়ের সাথে যখনই দেখা করতে যেতাম তখন তিনি তাঁর চেনা-জানা প্রায় সকলের ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিতেন। তাদের কাছে সালাম পৌঁছাতেন। এভাবে ব্যক্তিগত খোঁজ খবর আমরা অনেক সময় রাখিনা। আমি মল্লিক ভাইকে কাছ থেকে যত দেখেছি তত বেশী তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছি। কিন্তু অনেকেই আছেন যাদের কথা শুনলে ভাল লাগে। কিন্তু তাঁদের কাছে গেলে সেই ভালবাসা আর স্থায়ী হয়না। কারণ শোনা ও

www.pathagar.com

বাস্তবতার মাঝে অনেক ফারাক থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মল্লিক ভাই ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে যতবার গিয়েছি প্রত্যেকবারই নতুন প্রেরণা লাভ করেছি।

মল্লিক ভাইয়ের পরিচয় শুধু একজন কবি ও গায়ক নন। তিনি ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ। তিনি শুধু তাঁর গানের জন্য সওয়াব পাবেন না। ইসলামী আন্দোলন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যারাই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বা নতুন ধারায় গান ও কবিতা চর্চা করেছেন, সকলের নেক আমলেরও সওয়াব পাবেন। এই দিক থেকে চিন্তা করলে মল্লিক ভাইয়ের জন্য আমার ঈর্ষা হয়। তিনি মরেও অমর। পৃথিবীতে যতদিন বাংলা ভাষী এবং ঈমানদার মানুষ থাকবে ততদিন মল্লিক ভাইয়ের হামদ-নাত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি শুধু গান রচনা করেন নি বরং গানের কথার বাস্তব মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

মল্লিক ভাই শুধু গান গেয়েই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন নি তাঁর জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। সাদা- সিধে জীবন যাপনকারী এই মানুষটি অসাধারণ প্রভাব ফেলেছেন অনেকের জীবনে। তিনি অপচয় পছন্দ করতেননা। খাওয়ার ক্ষেত্রে - কথার ক্ষেত্রে এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় যেন না হয় সেদিকে সব সময় তাঁর দৃষ্টি ছিল। আমরা অনেককে দেখি ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে খুবই কৃচ্ছতা সাধন করেন কিন্তু সামষ্টিক ফান্ড থেকে খরচ করতে দ্বিধা করেন না। মল্লিক ভাই এই ক্ষেত্রে অনুকরনীয় অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময় একটি প্রোগ্রামে তাঁকে দাওয়াত দিতে প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে যাই। তিনি প্রোগ্রামে যেতে সম্মত হন। আমি তাঁর জন্য ঢাকা-ঝিনাইদহ এসি বাসের টিকেট করার কথা বলতেই আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন--আমি সাধারণত নন এসি গাড়ীতে চলাচল করি। এসি গাড়ীতে বেশী পয়সা খরচ করে আমি যাব না। অনেক অনুরোধ করেও তাঁর জন্য এসি গাড়ীতে টিকেট করতে পারলামনা। আমরা অনেক সময় ব্যক্তিগত পয়সা খরচ করতে সতর্ক থাকি কিন্তু জাতীয় বা সামষ্টিক ফান্ড থেকে অর্থ খরচ করার সময় অর্থ অপচয় হয় কীনা সে চিন্তা করিনা। কিন্তু মল্লিক ভাই সামষ্টিক অর্থ খরচে আরও বেশী সতর্ক ছিলেন।

মল্লিক ভাই ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। কখনও নিজের নাম প্রচার হউক তা চাইতেন না। ২০০৪ সালে ইউরোপে একটি কনফারেন্সে আসার জন্য আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু তিনি সব সময় নিজেকে ফোকাস করা পছন্দ করতেননা। তিনি অন্য ভাইকে আনার জন্য প্রস্তাব করেন। অথচ অনেকেই আছেন যাঁরা বিদেশে আসার সুযোগ খুঁজেন।

মল্লিক ভাইর মেহমানদারীর কথা ভুলবার মত নয়। যখনই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি কিছু না খাইয়ে বিদায় দিতেননা। অনেক সময় জোর করে দুপুর এর খাবার খাইয়ে বিদায় দিতেন। এমনকি কঠিন অসুস্থতার সময়ও আতিথেয়তার প্রতি তাঁর নজর ছিল।

মল্লিক ভাই আল্লাহর ফায়সালার প্রতি ছিলেন সদা সন্তুষ্ট। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ইবনে সিনা হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে স্বাভাবিকভাবে আবেগ তাড়িত হই। কিন্তু তিনি একটি বারের জন্যও অসুস্থতার কারণে অনুযোগের সুরে কোন কথা বলেননি। সকলের কাছে দু'আ চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন, ক্বালবে সালীমের অধিকারী।

www.pathagar.com

মল্লিক ভাই আমার মত অনেকর অভিভাবক ছিলেন। আমি ঢাকা থাকতে অনেক সময় তাঁর কাছে ছুটে যেতাম পরামর্শের জন্য। তিনি মনোযোগ সহকারে কথা শুনতেন এবং পরামর্শ দিতেন। লেখা-লেখির ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা যোগাতেন। আমার প্রথম বইটির শিরোনাম তিনিই দিয়েছেন। আর যখনই দেখা করতে যেতাম তখনই লেখার জন্য নতুন নতুন শিরোনাম ঠিক করে দিতেন।

মল্লিক ভাই সব সময় হাসি খুশী থাকতেন এবং মাঝে মধ্যে রসাত্মকবোধক কথা ও গল্প বলতেন। তবে তাঁর হাসি-রসেও অনেক শেখার বিষয় থাকত। মল্লিক ভাই একদিন বললেন, তিনি বাসে ভ্রমনের সময় এক ফকির ভিক্ষা করছিল এই গান গেয়ে ---হাত পেতেছি এই গোনাহগার প্রভু তোমারি দরবারে/ হাতে ফিরাইওনা আর...

মল্লিক ভাই সহজ, সরল, নিরহংকার মানুষ। তিনি অনুপম চরিত্র ও যাদুকরী প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর হাজারো ভক্ত রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকেই মনে করেন তিনি - মল্লিক ভাইর অতি কাছের। মল্লিক ভাই তাঁকে মহব্বত করেন। এইভাবে একজন মানুষ হাজারো মানুষের মন-মনন জয় করা এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে সমানভাবে স্থান করে নেয়া সহজ ব্যাপার নয়। মল্লিক ভাই তাঁর ভক্তদের অকৃত্রিম স্নেহ পরশে রাখতেন। আর ভক্তরাও তাঁকে হৃদয় উজাড় করে শ্রদ্ধা করত এবং ভালবাসত ।

মল্লিক ভাই নির্লোভ ছিলেন। অনেকেই বলেন, তিনি নিংস্বার্থ ছিলেন। আমি মনে করি তিনি সবচেয়ে বেশী স্বার্থবাদী ছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালাকে খুশী করা এবং খুশী রাখার স্বার্থে তিনি দুনিয়ার মোহ ও অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছেন। তাই আল্লাহ প্রেমিক এই মানুষটিকে আল্লাহ পাক পবিত্রতম রমযান মাসের সুচনা লগ্নেই তাঁর কাছে নিয়ে যান।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় মল্লিক ভাই এখন তোমার কাছে। তুমি তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ কর। হে মুনীব! তুমি তাঁর মানবিক সকল ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দাও। আমরা যেন আমরণ নেক আমল করে তোমার সন্তুষ্টির পথে চলতে পারি সেই তাওফিক দান কর। হে মুনীব আমরা তোমাকে জান্নাতে আমাদের প্রিয় মল্লিক ভাই'সহ প্রাণভরে দেখতে চাই। আমাদেরকে নফসে মুতমায়িন্নার অধিকারী বানাও।

লেখকঃ সংগঠক, গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা

www.pathagar.com

না ফেরার দেশেই চলে গেলেন তিনি

শাহ আলম বাদশা

মতিউর রহমান মল্লিক চলে গেছেন না ফেরার দেশে। যেখানে তার মতো সৎ আস্তিক মানুষ ছাড়াও স্রষ্টার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ নাস্তিকরাও প্রতিনিয়তই যাচ্ছেন সব ছেড়ে চিরতরে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সবাই যেতেই থাকবেন যেতে বাধ্য। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। তবে সেই অদৃশ্য জগতে কার কী পরিনতি হচ্ছে- বিশ্বাসের আয়না ব্যতীত তা জানার বা দেখার অন্য কোনো উপায় আমাদের বিজ্ঞানীদের হাতেও নেই। শুধু এটুকু আন্দাজ করা যায় যে, তার মতো আস্তিক ভালো মানুষেরা দুনিয়ায়ও যেমন সম্মানিত হয়ে থাকেন, আলাদা মর্যাদা পেয়ে থাকেন তাদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের দরুন; তেমনই নাস্তিক-পাপীরাও পরকালে যে সুখে থাকবেন না, তা আশা করা যায়।

তাই পরকালের মতো বিশাল ও চিরস্থায়ী জগতে মল্লিকের ভাইর মতো সজ্জন কবি-গীতিকার যে সুখেই আছেনড়তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

লেখার জগতে তার সাথে পরিচয়

লেখালেখির জগতে আমার পদার্পণ ১৯৭৭ সালে মানে জাতীয় পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা প্রকাশ পায় এসময়। ছাত্রাবস্থায় সাংবাদিকতা আর সাহিত্যচর্চার সুবাদে সেসময় হাতেগোণা কিছ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাই ছিলো আমাদের লেখনীর ভরসাস্থল যেমন- দৈনিক আজাদ, সংগ্রাম, সংবাদ, ইত্তেফাক, রাজশাহীর দৈনিক বার্তা, অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা ছাড়াও সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, জাহানে নও, কিশোরবাংলা, মাসিক শিশু, ফুলকুড়ি, কিশোরকণ্ঠ এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের চারবিভাগের চার মাসিক ঢাকার সবুজপাতা, রাজশাহীর ময়ুরপঙ্ক্ষী, চট্টগ্রামের সাম্পান ও খুলনার সপ্তডিঙ্গা ইত্যাদি।

পরবর্তীতে দৈনিক জনতা, অধুনালুপ্ত দৈনিক দেশ, নব অভিযান ছাড়াও মাসিক কলম, ঢাকা ডাইজেস্ট, মাসিক ডাইজেস্ট ইত্যাদি পত্রিকায় আমি ছিলাম সব্যসাচী লেখক। আমি বাছবিচারহীনভাবেই সব পত্রিকায়ই লিখতাম। এসময় বিশেষত দৈনিক সংগ্রাম, আজাদ, জাহানে নও, সোনারবাংলাকে লেখক তৈরির কারখানা বলেই মনে হতো আমার। কারণ মল্লিক ভাইর মতোই এখনকার অনেক ডান-বামপন্থী প্রতিষ্ঠিত লেখকই এসব পত্রিকায় লিখে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন-যাদের নাম বললে অনেকেই চমকে উঠবেন এবং বিস্মিত হবেন যে, এরা সর্বপ্রথম সংগ্রাম, সোনার বাংলা আর জাহানে নও-এ লিখেই আজ এতোদূর এসেছেন!

তবে আমি সব পত্রিকায় লিখলেও ডানপন্থী পত্রিকাগুলোতেই শুধু মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা কবিতা, ছড়া ও গান দেখতাম। তিনি শক্তিমান লেখক তথা কবি ও গীতিকার ছিলেন, এটা নিঃসন্দেহ। আমার মনে হয় সত্য-সুন্দর ও ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি কবি

www.pathagar.com

ফররুখ আহমেদের সার্থক উত্তরসুরী ও অনুসারী ছিলেন। আর এদেশে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটানো ও বিকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান অতুলনীয়। সাধারণ সাহিত্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি নতুন একটি ইসলামী ধারা সৃষ্টিতে তার বিশাল ভূমিকা অনস্বীকার্য। আগের দিনে আমরা আল্লাহ নবীর নামে লিখিত গানকে হামদ/নাত বা গজল নামেই চিনতাম এবং গাইতামও গজল নামেই। কিন্তু গীতিকার ও কবি মল্লিক ইসলামী গান বা সংগীত নামের এই নতুন ধারাটি চালু করেন, যাকে এখন আর কেউ গজল বলে ঠাট্টা করার সুযোগও পান না। তাই এখন আর কেউ গজল গায় না ইসলামী সংগীত গায়।

কলম সম্পাদক মল্লিক

মল্লিক ভাইকে আমি চেহারায় চিনতাম না, শুধু লেখায় চিমতাম। আমার লেখার পাশাপাশি প্রায়ই তার লেখা পড়তাম বিভিন্ন পত্রিকায়। সুদূর মফস্বল লালমনিরহাট থেকে আমি লিখতাম পত্রিকায় আর লেখা পাঠাতাম একমাত্র ডাকেই। ঢাকায় আসার সুযোগ ছিলো না আমার। কাজেই তাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি আমার। তার সাথে কোনোদিন পত্র যোগাযোগও হয়নি। অথচ আমাকে না চিনেই তিনি তার সম্পাদিত মাসিক কলম পত্রিকায় আমার লেখা নিয়মিত ছাপাতেন। অর্থাৎ তিনি সম্পাদক হিসেবে খুব নিরপেক্ষ যোগ্য ছিলেন এবং নতুন লেখকদেরও অগ্রাধিকার দিতেন। তার পত্রিকায় দেশের নামী-দামী কবিসাহিত্যিকরাও লিখতেন এবং কলমকে তিনি পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত একটা পত্রিকায় রুপান্তরিত করেন।

সাহিত্যআড্ডায় কবি মল্লিক

আমি একজন মন্ত্রীর পিআরও হিসেবে ঢাকায় বদলী হয়ে আসি ২০০২ সালে। লেখালেখির সুবাদে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকা অফিস ও সাহিত্য আসরে যাতায়াত শুরু করি। এসময়ই কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত-পরিচয় হয় আমার। সদা হাস্যোজ্জ্বল, মৃদু ও মিষ্টভাষী মল্লিক ভাইকে ভালোই লাগতো। এভাবেই মাঝে মাঝেই তার সাথে বিভিন্ন আড্ডায় দেখা হতো। এমনকি তিনি আমাকে কখনো-সখনো আলোচক ও প্রধান অতিথি হিসেবেও তার সাহিত্য আসরে আমন্ত্রন জানাতেন এবং সুযোগ থাকলে আমিও সাড়া দিতাম।

মৃত্যুশয্যায় মল্লিক ভাই

সাধামাটা চালচলন, অমায়িক ব্যবহার, নিরহংকার এই মানুষটির মায়াভরা মুখ দেখলে যে কেউ ভালবাসতে বা শ্রদ্ধা করতে চাইবে আমার মতোই। তিনি অসুস্থ এবং হাসপাতালে ভর্তি শোনার পর শত ইচ্ছে থাকলেও আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে যেতে পারিনি কাজের ব্যস্ততায়, এটাই আমার বড় দুঃখ থেকে গেছে। মাঝে মাঝেই তাই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়! তবে হাসপাতালে ভর্তির আগেও অসুস্থ মল্লিক ভাইয়ের সাথে বেশ ক'বার দেখা হয়েছে এবং আমার বড়মেয়ের মুখে তার অসুস্থতার বিশদ খবরাখবরও জেনেছি তার মেয়ে আমার মেয়ের ক্লাসফ্রেন্ড হওয়া সুবাদে। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তিনি তার হাজারো গান-কবিতার মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন একজন ঐতিহাসিক ও কীর্তিমান পুরুষ হিসেবে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, আমিন!!

www.pathagar.com

তিনি গেছেন অপারের সুন্দর জীবনে

হারুন ইবনে শাহাদাত

দিন তারিখ মনে নেই। পৌষ মাসের কোন এক স্নিগ্ধ সকাল। ময়মসিংহ শহরের উত্তর দিক। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মনদ। সেই নদের চরে পিকনিকের আয়োজন করেছে ময়মনসিংহ শহরেরই একটি সংগঠন। আমার সবচেয়ে প্রিয় মামা আবুল মনসুর আয়োজক কমিটির একজন। মামার চিঠি পেয়ে টাংগাইল থেকে ব্রহ্মপুত্রের চরে গিয়ে হাজির হয়েছি। শীতকালে বাংলাদেশের নদনদীগুলো শান্ত থাকে। ব্রহ্মপুত্রও সেদিন ছিল শান্ত। চরের মাঝে মাঝে সবুজ ঘাস, কাশঝাড়, এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে বাড়িঘর। বাড়ির পাশে লেবুর বাগান। লেবুপাতার গন্ধে মনটা ভরে উঠছিল। পিকনিক পার্টির মাইকে গান বাজছে-

'তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর / না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর
সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন / ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর
না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর।'

গানের আর্কষণে মনটা আটকে গেল। কারণ এ গান আগে কোনদিন শুনিনি। গানের কথা, সুর, শিল্পী সবই আমার কাছে নতুন। এর সুরের ইন্দ্রজালে আমার মন প্রাণ হারিয়েছে গেছে। সম্মোহিত হয়ে চলে গেছি গানের উৎসস্থল মাইকের কাছে। ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজানো গান মাইকের সাহায্যে সম্প্রচার করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জানতে চাইলাম, 'কে গাইছে এ গান?' মাইকের কাছে বসা একজন উত্তর দিলেন, 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'এ গানের গীতিকার কে?' তিনি বললেন, 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক।' আবার প্রশ্ন করলাম, 'সুরকার কে?' উত্তরের কোন পরিবর্তন হলো না, উত্তরদাতা আগের মতোই শান্তগলায় বললেন, 'কবি মতিউর রহমান মল্লিক।' আমি আমার মনের প্রতিটি কোণা তন্ন তন্ন করে খোঁজলাম। কিন্তু এ নামের কোন কবির নাম আগে শুনেছি বলে মনে হলো না। কিন্তু এ কথা সেদিন কাউকে বলতে পারিনি। নিজেকে নিজেই তিরস্কার করেছি, এই বলে- 'এমন একজন প্রতিভাবান কবিকে আমি চিনতে পারছি না। সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে আমি এতটা অজ্ঞ।

পিকনিক থেকে ফিরে আসার পর খোঁজতে শুরু করলাম মতিউর রহমান মল্লিকের গান। তিনি কে কোথায় থাকেন জানার আগ্রহ মিটাতে তার বই খোঁজতে লাগলাম। কিন্তু তখনো তার তেমন কোন বই প্রকাশিত হয়নি। অনেক কষ্টে 'প্রত্যয়ের গান' নামে প্রকাশিত একটি বই সংগ্রহ করতে পারলাম। কিন্তু এ বইতে শুধু তার নয় আরো অন্যান্য কবি এবং গীতিকবিদের গানও সংকলিত হয়েছে। এর অনেক পর হাতে পেলাম তার একক গানের

www.pathagar.com

সংকলন ' ঝংকার' ও 'যত গান গেয়েছি।' বই হাতে পাওয়ার পরই জানলাম, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ বাগেরহাট জেলার রায়পাড়া উপজেলার বরোইপাড়া গ্রামে। তার পিতা মুন্সী কায়েমউদ্দিন মল্লিক, মাতা আছিয়া খাতুন। কবি মতিউর রহমান মল্লিক গান, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন প্রচুর। চিত্রল প্রজাপতি, আবর্তিত স্বর্ণলতা, অনবরত বৃক্ষের গান, নিষন্ন পাখির নীড়ে তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জন্য অন্তরে ভালবাসা বাসা বেঁধেছিল, সেই কোন এক অজানা পৌষের সকালে। তখন আমি স্কুলছাত্র। এ ভালবাসার মানুষটির ভালবাসা কোনদিন পাবো, সেদিন হয়তো তা ভাবিনি। প্রথম যেদিন দেখা হলো আমার ভালবাসার কবি প্রিয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে, সেদিনই তিনি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার বাঁধনে বাঁধলেন আমায়। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনাকে দেখতে অনেকটা মাইকেল মধুসূধন দত্তের মতো লাগে। কবিতা লিখলে আপনিও তাঁর মতো বড় কবি হবেন। পত্রপত্রিকায় আমার কোন লেখা বের হলে তিনি বলতেন, আপনার লেখার আমি একজন ভক্তপাঠক। বিশেষ করে গদ্য। তরুণদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তার এ অভিব্যক্তি হয় তো এ ভালবাসারই প্রকাশ। নবীন লেখকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তিনি ' প্রত্যাশা প্রাঙ্গন' 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র' ঘিরে একটি বলয় গড়ে তুলেছিলেন। 'বিপরীত উচ্চারণ' এর ব্যানারে প্রতি মাসে শিশুকিশোর ও নবীন লেখকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতেন। প্রশিক্ষক হিসেবে মাঝে মাঝে আমাকে ডাকতেন। এ আয়োজন ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। তিনি প্রশিক্ষকদের নাম উল্লেখ করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালবেসেছিলেন। তারাও তাকে ভালবাসে। পার্থিব ভালবাসার এ বন্ধন মুক্ত হয়ে, মহান আল্লাহরাব্বুল আলামীনের ভালবাসার আহবানে গত ১২ আগস্ট দিবাগত রাতে তিনি চলে গেছেন অপারের সুন্দর জীবনে। মহান কবির এ শূণ্যতায় আজ শুধু মনে পড়ছে তার লেখা কবিতার এই পংক্তিমালা,

'তোমাকে এখানে সমবেত দরকার
বিরহের মতো প্রতি নিঃশ্বাসে টানে
রুগ্ন জনতা, অসুস্থ চরাচর-
অনুভব করে
নতুন অভিজ্ঞানে।' (চিত্রল প্রজাপতি)

লেখক: সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক।
ই-মেইল: hiharun@hotmail.com

www.pathagar.com

আমার সাংস্কৃতিক পিতা মতিউর রহমান মল্লিক

আমিরুল মোমেনীন মানিক

১.

টমাস আলভা অ্যাডিসনের প্রথম শিক্ষক বা ওস্তাদকে ছিলেন? বলতে পারবেন? শেক্সপিয়র কার কাছ থেকে শিখেছিলেন সাহিত্যের নামতা? সঠিক উত্তর হলো-প্রকৃতির কাছ থেকে। একটি বিখ্যাত কবিতার চারটি চরণ সবারই জানা-বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর/সবার আমি ছাত্র/নানান জিনিস নানানভাবে/ শিখছি দিবারাত্র।

বাজনাবিহীন ইসলামী সংগীতের স্বপ্নদ্রষ্টা মতিউর রহমান মল্লিকে কোন ওস্তাদ ছিলো না। এ ধারার রোডম্যাপ তিনি নিজেই তৈরী করেছিলেন। সেই ধারা প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাদারিত্বের রুপে না দাঁড়ালেও বিপুল সংখ্যক তরুণকে স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন। মল্লিকের স্বপ্নে অনুরণিত হয়ে অজপাড়াগাঁতেও গড়ে উঠে শিল্পীগোষ্ঠী।

২.

সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছি। হঠাৎ শুনলাম বন্ধুদের অনেকে শিক্ষা সফরে গেছে।দু'দিন পর দেখা হলো তাদের সাথে।

-কি ব্যাপার আমাকে তো বললে না, একা একা শিক্ষা সফর করে এলে?

-তোমাকে খবর দিতে পারিনি। মতিউর রহমান মল্লিক নামে এক কবি এসেছিলেন, অসাধারণ! তার গান ও কবিতা শুনে সবাই আপ্লুত হয়ে গেছি।

মল্লিককে জানার অনিন্দ্য আগ্রহ শুরু হয় সেই থেকে। সেই আগ্রহেই পরবর্তিতে নতুন কিছুতে জড়িয়ে পড়া। নতুন চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া।

তখন মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন আমাদের নায়ক। তাঁর মতো হবার স্বপ্ন দেখতো আমার মতো অসংখ্য তরুণ। মল্লিক তাঁর কর্মতৎপরতা আর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কারণে আমাদের কাছে নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মননে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম অনেকে।

যে কোন আদর্শের একজন বাস্তব সাংস্কৃতিক পুরুষ দরকার হয়। কমিউনিজমের নায়ক চে-গুয়েভারা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন জীবন্ত কিংবদন্তীই ছিলেন। হাজারো তরুণকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন বলে কিউবাতে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিলো। এ দেশের আধুনিক ও ইসলাম পছন্দ তরুণদের কাছে মল্লিক ছিলেন অনেকটা সেরকম।

মতিউর রহমান মল্লিক এখন নেই। কিন্তু দিন যত যাবে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে, তাকে নিয়ে নতুন গবেষণা ও মূল্যায়ন বাড়বে। আমাদের প্রয়োজনেই তিনি বারবার আলোচিত হবেন, পঠিত হবেন। আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের গুণ পেয়েছিলেন মল্লিক।

www.pathagar.com

একাধারে অনেক প্রতিভার আধার। এ ধরনের প্রতিভা নজরুলের পর বাম আদর্শবাদীদের মধ্যেও খুব একটা পাওয়া যায়নি। সে দিক দিয়ে এ দেশের ইসলামিস্টরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। আমাদের মতো তরুণ, যারা মাদ্রাসা নয়, আধুনিক শিায় শিতি, তারা কেনইবা এই বলয়ভুক্ত হবেন? এ প্রশ্নটা যৌক্তিক। মল্লিক সেই আদশেরু সঙ্গে ইট-সুরকির শক্ত সেতু তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই সেতু আমরা পার হতে পেরেছিলাম নি:সঙ্কোচে। পরবর্তিতে নিজেকে আখেরাতবাদী করার পেছনে এটিই জোরালো ভূমিকা পালন করেছে।

৩.

মতিউর রহমান মল্লিকের সঙ্গে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক অথবা আত্নীয়তার বন্ধন নেই। কিন্তু তিনি আমার পরম আত্নীয়, আমার চেতনার নিশানবরদার।

২০০১ থেকে ২০০৫। এই ৫ বছর অসম্ভব সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিলো তাঁর সাথে। একেবারে তৃণমুল থেকে হাত ধরে তুলে এনেছিলেন। কোন বলয়ে পরিচিত হবার শুরুতে যে সহযোগিতাটা জরুরী হয়, তা তিনি নি:স্বার্থভাবে করেছেন। তাকে ভাই বলে ডাকতাম। এই সম্বোধনে যেনো প্রাণ খুঁজে পেতাম। ব্যক্তিগতভাবে দারুণ ভালোবাসতেন আমাকে। এ ধরনের স্নেহ-ভালোবাসা-আন্তরিকতা অন্যকোন শিল্পী-সংগঠক পেয়েছেন বলে মনে হয়না। অনেক গভীর সেই ভালোবাসা। একজন পিতা যেমন করে ভালোবাসেন তাঁর সন্তানকে, এর ব্যতিক্রম ছিলনা। সেই সৌভাগ্যটুকু হয়েছিলো খুব এবং খুব কাছ থেকে তাঁর ভেতরটা দেখার এই সুযোগ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমার ভীতকে শক্ত করেছিলো। অনেক অব্যক্ত বিষয় তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, যা কখনোই অন্যকে বলেননি। ব্যক্তিগত বেশ কিছু বিষয় আমাকে বলেও গেছেন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলেই সেগুলো প্রকাশিত হয়নি। হবেওনা কোনদিন। তাঁর চেতনাপ্রবাহী শেকড়ের খানিকটা স্পর্শতো পেয়েছিই। সংগীতে বাজনাবিহীন নতুন ধারা সৃষ্টির মূল ও নিগূঢ় রহস্য, এর কার্যকারিতা এবং মেয়াদ-উর্ত্তীণের বিষয়ে খোলাখুলি অনেক কিছু বলেছেন আমাকে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার বিস্তৃত অনেক প্রান্তরে তাঁর সাথে সহযোগী হবার ভাগ্য হয়েছে।এ জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত নানা অনুভূতির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি।

মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গে সম্পকেরু এই গভীরতার কারণে অনেকে ভাবতেন বা প্রত্যাশা করতেন বা সন্দেহ করতেন যে, এর পেছনে নতুন কোন সম্পর্ক তৈরীর উদ্দেশ্য রয়েছে। আসলে তারা শুধু ঘনিষ্ঠতার উপরিভাগটুকু দেখেছেন, তার অতল খুঁজে দেখেননি। একটি সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরবর্তি পর্বে নেতৃত্ব দিতে কিছু লোক খুঁজেছিলেন তিনি। এর মধ্যে হয়ত আমাকেও রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে মল্লিক ভাই তিন সন্তানের জনক। কিন্তু একথা নি:সন্দেহে, নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে চাই, তিনি আমার সাংস্কৃতিক পিতা। এ ধরনের অনেক সাংস্কৃতিক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন তিনি। কিন্তু, ক'জনেই তা উপলব্ধি করে? নিজেকে মল্লিকের সাংস্কৃতিক পুত্র হিসেবে খুব জোরালো আর দৃঢ়ভাবেই দাবি করছি। পুত্র হিসেবে পিতার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়বদ্ধতাও শক্তভাবে অনুভব করি।

৪.

মল্লিক ভাইয়ের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে ২০০৬ সালে। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র থেকে বৈশাখী টেলিভিশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেই। তখনও দিগন্ত টেলিভিশন তৈরীর খসড়া তৈরী হয়নি। এতেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। তিনি চেয়েছিলেন, আমি সংস্কৃতিকেন্দ্রেই থেকে যাই। টেলিভিশনের মতো বৃহত্তর আঙ্গিনায় নিজেকে পরকালবাদী রাখতে পারবো কি না, এ নিয়ে

www.pathagar.com

শঙ্কা ছিলো তার মধ্যে।

কিন্তু আমি ছিলাম অটল। কারণ, আমার ক্যারিয়ার আর ভবিষ্যতটা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। দৃষ্টিটা তখন ৫ বছর এগিয়ে ছিলো। তাই, মল্লিক ভাইয়ের অসন্তুষ্টির পরও দৃঢ় ছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তা অবশ্য পরবর্তিতে তিনি বিস্ময়ের সাথে ল্য করেছেন। কিন্তু প্রথম প্রেম ভেঙ্গে গেলে সেটি জোড়া নিলেও আগের মতো হয়না। ঠিক তেমনি হয়েছে। যদিও মল্লিক ভাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ব্যারোমিটার কখনই নিচে নামেনি।

৫.

মল্লিক ভাই আমাকে প্রথম চাকুরী দিয়েছিলেন। ছ'হাজার টাকা বেতনে । রাজধানীর স্বার্থপর সময়ে তিনি যে দরদ দেখাতেন শিল্পীদের প্রতি তা এক কথায় অসাধারণ! সারাজীবন এই ঋণ মনে থাকবে। মাঝেসাঝে তিনি বক্তৃতায় উদাহরণ হিসেবে আমার নাম টেনে আনতেন। একজন সাধারণ শিল্পী হিসেবে এটা পরমপ্রাপ্তি। আমাকে সন্তুষ্ট করার প্রশ্নই আসেনা, এটা তিনি করতেন, তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে।মল্লিক ভাই আমাকে নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত করেছিলেন।আমার ক্যারিয়ারে তাঁর অসংখ্য অবদান কখনোই ভুলে যাবার মতো নয়। এখন সপ্তাহে দু'তিন দিন ব্যাংকে যাই অথবা এটিএম বুথে নিজের একাউন্ট চেক করি। ফ্ল্যাট বা গাড়ী কেনার টাকা হলো কি না? এসবের জন্যে বাড়তি আয়ের চিন্তা করি। কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের মধ্যে অর্থ আয়ের কোন চিন্তা বা ফ্যাট,গাড়ী, বাড়ী করার কোন চিন্তা কখনোই ছিলোনা বা নিজের সুনাম বিক্রি করে বাণিজ্য করার স্বভাবও দেখিনি। যা পেতেন, দু' হাতে খরচ করতেন। এখন এ ধরনের সাংস্কৃতিক নেতা পাওয়া দু:সাধ্য। আমি নিজেই তাঁর এই গুণগুলো ধারণ করতো পারবো না।

মল্লিক ভাইয়ের মধ্যে কাজের সম্মান পাবার একটা দাবি সব সময়ই ছিলো। এজন্যে তিনি অভিমানও করতেন। সবমিলিয়ে প্রকৃতির কাছে শিখে শিখে বেড়ে উঠা একজন প্রকৃত শিল্পী ও কবি ছিলেন আমাদের মল্লিক ভাই, আমার সাংস্কৃতিক পিতা।

৬.

পশ্চিমবঙ্গের প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নাম অনেকেরই শুনে থাকার কথা।কমিউনিজমের তুখোড় ও একনিষ্ট প্রচারক। খালি গলায় করতল বাজিয়ে গান গেয়ে মাতিয়ে তোলেন মানুষকে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্টেজ শো প্রথম দেখার পর মল্লিক ভাইয়ের প্রতি অজান্তেই স্যালুট দিয়েছিলাম।

তাঁর বাজনাবিহীন গানের ধারার ভিত যে কত শক্ত এবং শেকড়ের সেটা নতুন করে উপলব্ধি হয়েছিলো। প্রত্যাশা, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক এই ধারা। যৌক্তিক প্রয়োজনে সময়ের সাথে তাল মেলাতে এ ধারাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবার চেষ্টাও করা যেতে পারে? মতিউর রহমান মল্লিকের সাংস্কৃতিক পুত্ররা তা কি পারবে? তবে, কেউ কেউ তৈরী হচ্ছি। অপেক্ষা করুন, প্লিজ, আবেগী ও অগভীর সমালোচনা করে বৃহত্তর বিপ্লবকে ধ্বংস করবেন না।

লেখক : টেলিভিশন সাংবাদিক

www.pathagar.com

মল্লিক ভাই ঃ অজস্র স্মৃতির নীরব মিছিল

মুহাম্মাদ হায়দার আলী

পীরে আজম হযরত খাজা খাঁনজাহান আলী (রহঃ) এর পুণ্য স্মৃতিধণ্য বাগেরহাটে ১৯৫৬ সালের ১ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ২০১১ সালের ২ আগষ্ট রমজানের প্রথম প্রহরে এ মায়াময় পৃথিবী ছেড়ে চলেও গেলেন তিনি। রেখে গেলেন এই নাতিদীর্ঘ জীবনে অজস্র স্মৃতিরাজি। দিগন্ত ব্যপি ঘন তমসার বুকে তৌহিদী সংস্কৃতির যে আলো তিনি জ্বেলে গেছেন তা দ্বীপ্যমান থাকবে অনন্তকাল। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সংস্কৃতির রূপায়নে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী রেঁনেসার কবি ফররুখ আহম্মদ যে ধারার সূচনা করে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন তাদেরই অনুজ অনুগামী।

আমার জীবনে আমি ২৫টি বছর তার সাহচর্যে সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ লাভে ধণ্য হয়েছি। এই সময়ের অজস্র স্মৃতিরা আজ নীরব মিছিল হয়ে, আমাকেও অনুপ্রানিত করে একটি সুন্দর স্বপ্নীল আগামীর পানে এগিয়ে যেতে।

১৯৮৫ সাল। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। পরিচয় হতেই পরম স্নেহে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। আমি তা আজও অনুভব করি।

১৯৮৮ সাল। দাখিল পরীক্ষা দিয়ে অলস সময় কাটাচ্ছি। মল্লিক ভাই বাড়িতে এলেন। ইতোমধ্যে মল্লিক ভাইয়ের সাথে বেশ ঘনিষ্ট হয়েছি। এ সুবাদে মল্লিক ভাই আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। গ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা হাটছি। হাটতে হাটতে মল্লিক ভাই বললেন এ-কথা, সে-কথা, কত কথা। মল্লিক ভাই তার পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে যা'ছেন। আর নাম ধরে ধরে অথবা সম্পর্কের যথাযথ সম্বোধনে খোজ খবর নিচ্ছেন কার কি অবস্থা। বিভিন্ন গ্রামের গলিপথগুলো ছিল মল্লিক ভাইয়ের মুখস্ত। অথচ তখনও আমি অন্য একসাথে হবে গ্রামের গলিপথ গুলো চিনতাম না। গ্রামের মানুষের প্রতি তার মমতা ও ভালোবাসা দেখে আমি অভিভুত হলাম, অনুপ্রানিত হলাম।

১৯৯০ সাল। এবার আমি আলিম ফলপ্রার্থী। মল্লিক ভাই বাড়িতে এলেন। আবারও সুযোগ হল ঘুরে বেড়ানোর। বর্ষাকাল। গ্রামের অধিকাংশ রাস্তাঘাট কাঁচা। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে পায়ের জুতা হাতে নিয়ে আমরা হাটছি। হাটছিতো হাটছি। আমাদের বাড়ী থেকে সকালের নাস্তা সেরে আমরা বেরিয়েছি। হাটতে হাটতে সোতাল, বারুইপাড়া, পাইকপাড়া, কোমরপুর, জাড়িয়া, সাতশৈয়ার ভেতর দিয়ে একেবারে পিলজংগ মল্লিক ভাইয়ের ছোট বেলার বন্ধু মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। এই সব গ্রামের

www.pathagar.com

উপর দিয়ে যেতে যেতে মল্লিক ভাই স্মৃতি চারণ করছিলেন তার শৈশব কৈশর আর যৌবনের হাঁসি কান্নায় মিশে থাকা রঙ্গিন স্বপ্নের দিনগুলি। মল্লিক ভাইয়ের সাথে এ-রকম হাজারও স্মৃতি আজ আমাকে তাড়িত করে ফেলে।

জন্মভূমির মাটি ও মানুষের প্রতি মল্লিক ভাইয়ের নিবিড় প্রেম ও প্রগাঢ় ভালোবাসার চিত্র দেখা যায় তার বাগেরহাটের সারাবেলা কবিতায়-

এখনও শটিবন আমাকে কাঁদায়
কাওডিম গাছের পাতায় আমার মন পড়ে থাকে
ধোপাকোলার বিহ্বলতায় হঠাৎ আমি দীর্ঘ হয়ে উঠি
সোনার ভিটের ছায়ায় বাড়তে থাকে
আমার শৈশবের সোনালী বয়স
এবং এখনও বাঁশ বাগানের সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডাকতে থাকে।
- - - - - - -
আমাকে জড়িয়ে আছে, পুবের ঢলের হাওয়া
শাপলা ফুলের বাড়াবাড়ি, কচুরিপানার আনুগত্য
গলা-সমান ধানের ক্ষেতের স্বাধীনতা
কালো ফিঙের দাপট, মাছরাঙার অনুধ্যান
ঝাঁক-ঝাঁক শাদা-শাদা বকের নিয়মিত তপস্যা।

আমার বাম চোখে সোতাল, কাটাখালী, বাগদিয়া, লাউপালা
এবং ঠিক বাম হাতে মরিচের ক্ষেত, মুলোর ভুই, আলু-কপির খামার
এবং ক্রমাগত ফসলের জমি।
আমার ডান চোখে কাঁঠালতলা, পাইকপাড়া, কোমরপুর, মশিদপুর,
এবং আমার ডান হাতে লিচুর নিষ্ক, কাঁঠালের নিষ্কাশ, বাতাবির বিক্ষেপ
এবং পাতাবাহারের অসংখ্য প্রজাপতি
তাছাড়া ভৈরব নদের শিল্পকলা আমার সমাহৃত আত্মা হয়ে আছে।

তারপর ভোররাত্রের ফকিরহাট, শেষ সকালের মোংলাপোর্ট
ভরদুপুরের মোরেলগঞ্জ, মধ্যরাতের শরণখোলা
এবং তারও পরের দিন উদ্ভিন্ন কচুয়ার ঔদার্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আজও আমি চলে যাই স্বপ্ন তাড়িত চিতলমারি
অথবা মোল্লাহাটের সুর্যাস্ত পর্যন্ত।
অথচ এখন আমি কেবলই অদৃষ্টের পাতা উলটাতে থাকি।
- - - - - - -
তবুও ভালোবেসে যাই, ভালোবেসে যাই, ভালোবেসে যাই
বাগেরহাটের সারাবেলা, বাগেরহাটের সমস্ত সময়।

এই কবিতায় মল্লিক ভাইয়ের যে জীবনঘনিষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে তার সাথে আমি ও আপ্লুত হই। একাকার হয়ে যাই সেসব মহেন্দ্রক্ষনের মাঝে। কারণ এসব জায়গায় মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গ-সান্নিধ্যে জড়িয়ে আছে আমার অজস্র স্মৃতিরা।

www.pathagar.com

১৯৯২ সাল। মল্লিক ভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় হাফেজ আব্দুর রশিদ ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগেরহাটে খাঁনজাহান শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। মল্লিক ভাই আমাকে ডেকে বললেন- দক্ষিণ বঙ্গ তথা গোটা বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ হলেন হযরত খাঁন জাহান আলী (রহঃ)। খাঁনজাহান আলী (রহঃ) কে নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং খাঁনজাহান শিল্পীগোষ্ঠী এই দক্ষিণ বঙ্গ থেকে বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ। আজকের এ-লেখায় খাঁনজাহান শিল্পীগোষ্ঠীর বর্তমান কর্ণধার এবং পৃষ্ঠপোষকতা যারা করছেন তাদেরকে মল্লিক ভাইয়ের স্বপ্নে পুরণে আরো বেশী যত্নশীল হওয়ার অনুরোধ জানাই।

১৯৯৪ সাল। বাগেরহাট সরকারী পি.সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে পড়া লেখার তাগিদেই আমাকে বাগেরহাট ছাড়তে হয়। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্সে ভর্তি হই। ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষা সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ সরকার ভাই আমাকে বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক নিযুক্ত করেন। মল্লিক ভাই এ-খবরটি শুনে এতবেশী আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তা আজ ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। মল্লিক ভাইতো আমাকে দক্ষিন বঙ্গের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা অভিধায় অভিসিক্ত করে রীতিমত হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে অভিজ্ঞতার পুঁজি সঞ্চয় করে তোমাকেই দক্ষিণ বঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নিতে হবে।

১৯৯৭ সাল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসি বাগেরহাট। তখনও কর্মজীবন বলতে কিছু নেই আমার। ভবঘুরে আমি। বাড়ীতে এসে মল্লিক ভাইয়ের নিজ গ্রাম বারুইপাড়াতে খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠীর নামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করলাম। অল্পদিনের ব্যবধানে ছোট বড় ৫০ এর অধিক কণ্ঠশিল্পী ও অভিনয়শিল্পী যোগাড় হল। এ বছর মল্লিক ভাই জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হলেন। মল্লিক ভাইয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রথম সাংস্কৃতিক উৎসবে তাকে গাজী ইমাম উদ্দীন স্মৃতি পদক প্রদান করা হয়। তারপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উৎসব হতো। প্রত্যেকটি উৎসবে মল্লিক ভাই বাংলাদেশের খ্যাতিমান গুণীজনদের মধ্য থেকে দু'একজনকে নিয়ে আসতেন। মল্লিক ভাই আমার কাছে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রতিবছর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের কাউকে না কাউকে নিয়ে আসবেন। অত্র জনপদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিয়ে মল্লিক ভাইয়ের লালিত স্বপ্ন ছিল এইসব গুণী মানুষের আগমনে তারাও জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। এ-বিষয়ে আমি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা "প্রেক্ষণ" মতিউর রহমান মল্লিক স্মরণ সংখ্যার একটি লেখায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি। মল্লিক ভাইয়ের এই স্বপ্ন স্বাধ পূরণে সমাজের স্বার্থান্বেষী পরশ্রীকাতর মানুষরূপী ঘৃণ্য ইতর শ্রেণীর একটি কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে আমাদের ষষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসবটি স্থগিত হয়ে যায়। মল্লিক ভাই মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন এ কষ্টটা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন। এ বিষয়টি এখানেই স্থগিত রেখে দৃষ্টি ফেরাই অন্য কোথাও।

www.pathagar.com

মল্লিক ভাইয়ের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে সফরসঙ্গী হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাকে যতবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ততবার নতুন নতুন ভাবে আমি উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত হয়েছি। শুধু আমার বেলায় নয় মল্লিক ভাইয়ের সান্নিধ্যে যারা যখন যেভাবে এসেছেন তাদের সকলের ক্ষেত্রে এ-কথাটা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

মল্লিক ভাইকে পরিমাপ করার মত শক্তি বা যোগ্যতা কোনটাই আমার নেই। কবি আল-মাহমুদ ভাই মল্লিক ভাই সম্পর্কে অল্প কথায় সারগর্ভ একটি মূল্যায়ন করেছিলেন। সে বিষয়টি তুলে ধরে আজকের এ-লেখার যবনিকা টানবো। আল-মাহমুদ ভাইয়ের সে লেখাটি দৈনিক নয়া দিগন্তের পাতায় "লিখতে চাই শিখতে চাই এর মধ্যেই বাঁচতে চাই" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। একবার রাজশাহী ভ্রমনে তার সাথী ছিলেন মল্লিক ভাই। মল্লিক ভাই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

"সব সময় মল্লিকের কাছ থেকে আমি কবিদের জন্য অনেক শিক্ষনীয় হাদীস এবং ইসলামের দিক নির্দেশনা শ্রবণ করে থাকি। তার অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্য তিনি তার নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু আমার প্রতি তার গভীর ভালবাসা এবং প্রেমমূলক আচরণ আমাকে বশীভূত করে রেখেছে। যে কোন বিষয় ধর্মের দ্বীপ্তিতে তিনি এমনভাবে আলোকপাত করেন যে, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

বলা যায় হাঁ করে গিলতে থাকি। আমি এ-কথা বলিনা যে, মতিউর রহমান মল্লিকের মতো লোকদের কোন মূল্যায়ন হলো না; বরং সব সময় ভাবি মূল্যায়ন করতে যে দাঁড়িপাল্লা লাগে সেটা টান করে কিংবা উঁচু করে ধরার মত বান্দা কোথায় পাওয়া যাবে। জ্ঞান হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের বিষয়। তিনি যাকে তা দান করেন তার চেহারাটা একটু অন্য রকম থাকে। সম্ভবত সেই চেহারা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মতই নিস্পৃহ, অহংকারহীন বিনয়ী হবে হয়তো। এই সফরে তিনি আমাদের সাথে ছিলেন এবং মাঝে মধ্যে তার মুখ নিঃসৃত অমৃত ধারা আমরা শ্রবণেন্দ্রীয়ে গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য বোধ করেছি। পৃথিবীতে জ্ঞানীরা কখন কী বেশ ধারণ করে বাঁচেন তা আমার মতন সামান্য কবি বলতে পারবে না।"

মূলতঃ মল্লিক ভাই তার সারাটি জীবনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তৌহিদের চেতনায় বিশ্বাসী কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকর, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি এককথায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে একটি মজবুত প্লাটফর্ম গড়ে তুলে বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের পথকে তরান্বিত করার স্বপ্ন দেখতেন।

মল্লিক ভাইকে দেখেছি কবিদের মেলায়, দেখেছি গুণীদের সমাবেশে, দুঃখীদের দুঃখ মোচনে, ব্যথিতের দুয়ারে, রুগ্নের শয্যাপাশে। কোথায় দেখিনি তাকে? পরিবার পরিজন পরিবৃত, পরিতৃপ্ত। সকলের পরিচর্যায় প্রসারিত, হাঁসি, ঠাট্টায়, রসিকতায় মধ্যমনি। কখনও গানের ভুবনে মুখর পাখি, কখনও সুললিত কোরানের মধুময় মোহময় শুদ্ধ উচ্চারণে আল্লাহ প্রেমে বিগলিত হৃদয়।

স্মৃতির জানালা খুলে অশ্রুসিক্ত চোখে দেখি জীবনের শেষ পর্ব তার। ইবনে সিনা হাসপাতালের ৫০৮ নং কক্ষ। নিদারুণ ব্যাধি নিয়ে শুয়ে আছেন মল্লিক ভাই। দু'টি কিডনীই

www.pathagar.com

বিকল তার। তবুও দু'টি ঠোটে তার চিরচেনা সেই হাসি লেগে আছে। আমি বেদনা ক্লিষ্ট চিত্তে বার বার দেখে নিলাম তাকে। তখনও বুঝতে পারিনি মল্লিক ভাই আমাদের মাঝে আর বেশিদিন নেই।

মল্লিক ভাই চলে গেলেন। সবই আজ স্মৃতি হয়ে গেছে। ঐ তো দ্যাখো মল্লিক ভাই চুপিসারে এসে স্মৃতির মিছিলে শামিল হয়েছেন। সে মিছিল নীরবে সামনে এগিয়ে চলেছে। সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ সাহেব ১৬টি শব্দের কবিতায় সে মিছিলের শ্লোগান লিখে দিয়েছেন-

গতির জগতের,
মাটির মল্লিক নেই।
আলোর মল্লিক আছে
স্থির জগতে,
আলোর সে পাখি
আলমে আরওয়ার গাছে।

লেখক : অপ্যাপক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক

www.pathagar.com

আল্লাহর সৈনিকদের চেতনার দিশারী কবি মতিউর রহমান মল্লিক

শেখ আবু সাঈদ

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় / মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙ্গীন পরিচয়/ মিছে এই স্নেহ প্রিতী বন্ধন /মিছে মায়া ভালোবাসা ক্রন্দন / মিছে এই দুদিনের অভিনয়। পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে এত প্রানবন্ত উচ্চারন যার তিনি মতিউর রহমান মল্লিক। বাংলাদেশের সাহিত্য পরিসরে যে ক,জন অন্তরাল পরায়ন কবি আছেন এদের মধ্যে মতিউর রহমান মল্লিকের রচনা আমাকে স্পর্শ করে বেশী। কোলাহল বিমুখ এই সব কবিদের কাব্য প্রতিভাই আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি। বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ এ উক্তি গুলো করেছিলেন যার সম্পর্কে তিনি আবর্তিত তৃণলতার কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক। বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের মৃত কায়েম উদ্দিন মুন্সি ও মাতা আছিয়া বেগমের ছোট পুত্র। তার বড় ভাই কবি আহমদ আলী মল্লিক। পারিবারিকভাবেই তিনি সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ঝুকে পড়েন অতি প্রত্যুষে। কৈশোরেই তার গান এ এলাকার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র জীবনে সরকারী পি.সি. কলেজ থেকে এইচ. এস. সি, পাশ করেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসাধারন মেধার অধিকারী। পিসি কলেজের অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিক সাহেবের বিদায় কালে তার লেখা 'তুমি আমাদের গুরু ছিলে 'কবিতা শুনে সবাই বলে ছিল যোগ্য উত্তরসুরী রেখে গেলেন। তিনি শুধু কবি হিসেবেই পরিচিত নন বরং সুরকার ও গীতিকার হিসাবেও তার রয়েছে সুখ্যাতি। একজন সংবাদ কর্মী একজন সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কাজের ক্ষেত্রে কোনটাকে ছোট মনে করতেন না। এবং নিজেকে সাদামাটা হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তিনি প্রুফ দেখতেন । এসময় কবি আসাদ বিন হাফিজের বাসায় গিয়ে তার শিশু সন্তানকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, বাগেরহাটের মানুষ আমি ভাই, প্রুফ দেখার চাকরী করি, প্রুফ দেখে খাই। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ আবর্তীত তৃণলতা' আর গানের বই ঝংকার' এবং সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নিষন্ন পাখির নীড়ে'। কবি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কিছু প্রোগামে এক সময় নিয়মিত আলোচক হিসেবে হাজির হতেন। বাংলাদেশের মসজিদের মিনারে মিনারে এমন কি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে যে সব ইসলামী সংগীত আমরা শুনতে পাই এর বেশিরভাগই তাঁর লেখা এবং সুরকার তিনি নিজেই। বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী সংগীত শিল্পী গোষ্ঠী সাইমুম এর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সারা দেশের আনাচে কানাচে এবং দেশের বাইরে গড়ে ওঠা অগনিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক তিনি। ইসলামী গানের যে সব অডিও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি প্রকাশিত হচ্ছে

www.pathagar.com

তার প্রায় সবটাতেই কোন না কোনভাবে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। কবিতা আর গানের কারনে তিনি যুক্তরাজ্য, ইটালী, ভারত, সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। বিখ্যাত পপ সঙ্গিত বিশারদ নও মুসলিম ইউসুফ ইসলাম, ভারতের ড. ইসলামুল হক সহ পৃথিবির অসংখ্য বরেন্য মানুষের সাথে তার সখ্যতা ছিল। তিনি দেশের সকল জেলা এমনকি দেশের আনাচে কানাচে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন সাংস্কৃতিক আন্দোল কে বিকশিত করার জন্য। প্রচার বিমুখ এই মানুষটি গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে সৃজনশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু কখনও নিজেকে জাহির করার জন্য কোন উদ্যোগ ছিলনা তাঁর। কাজ করেছেন আড়ালে আবডালে। দেশে বিদেশে গড়ে উঠেছে তাঁর এক বিশাল পরিধি। কবির অসুস্থতার খবর বাংলাদেশের প্রায় সব কটি বড় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। টিভিচ্যানেল গুলোও সম্প্রচার করেছে তার অসুস্থতার খবর। দেশে এবং দেশের বাইরে তার জন্য অসংখ্য দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবির প্রতি সাধারন মানুষদের বিশেষ করে ধর্মপ্রান এবং দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিক ব্যক্তিদের ভালোবাসা যে কত গভীর তা মাত্র একটি বিষয়েই অনুমেয়। কবির দুটি কিডনিই অকেজো। তারজন্য কিডনি প্রয়োজন, পত্রিকায় এমন খবর বের হবার পর। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও একটা কিডনি ক্রয় করা সম্ভব হয় না। সেখানে স্বেচ্ছায় কিডনী দানে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য কবি প্রেমিক সাধারণ মানুষ। তার রক্তের গ্রুপ ব্যতিক্রমী হওয়ায় সকলের সাথে এ্যাডজাষ্টমেন্ট হয়নি। অবশেষে সিলেটের এক টেক্সি চালকের এবং সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠির একজন শিল্পির কিডনির সাথে মিল পাওয়া যায় । তারাও স্বেচ্ছায় কিডনি দানে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আর যাদের কিডনির সাথে মিল না হওয়ায় কিডনি নেওয়া সম্ভব হয়নি তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিডনি দানের ব্যর্থতায়। একজন মানুষের প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে নিজের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দিয়ে তাকে বাচাবার জন্য আবেগ আপ্লুত হয়ে অন্যরা এগিয়ে আসে। কবির চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমান টাকা তার ভক্তরাই সংগ্রহ করেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মৃত্যু বাংলাদেশের সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক অসামান্য তি যা কখনোই পুষিয়ে ওঠার নয়। তবে তিনি বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বাংলাভাষাভাষী মানুষ যেখানেই আছে সেখানে সংস্কৃতিবান মানুষের মাঝে তার লিখনি এবং গানের মাধ্যমে পৌছে গেছেন। নজরুলের পরে বাংলায় এত বেশি ইসলামী গান আর কোন কবি লিখেছেন বলে জানা যায়নি। প্রতিটি মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। তার পরেও খুলনা – বাগেরহাটের মানুষ হিসেবে তিনি এ অঞ্চলের যে কোন মানুষের সমস্যায় ঝাপিয়ে পড়েছেন সদা সর্বদা। তার সাথে কারো একবার সাাত হলে তিনি তাকে আপন করে নিতেন। একজন সংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে তিনি আমাকেও ভালো বাসতেন নিজের আপন ভাইয়ের মত। পূর্বেই বলেছি ,ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। সারা জীবন শুধু মানুষকে দিয়ে গেছেন। নিজের জন্য কোনদিন তার কোন চাহিদা ছিল না। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাইতেন। সদা সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালনে তিনি থাকতেন অবিচল। মনে হতো লোকটা একেবারেই সাধারণ। সমাজের কুটিলতা জটিলতা কিছু বোঝেননা, কিন্তু সবই তিনি বুঝতেন বরং অগ্রীম বুঝতেন। তবে সব সময় এড়িয়ে যেতেন, না বোঝার ভান করে। কারন তিনি নিজের কোন লাভ-লোকশান হিসেব করতেন না। তাকে সবাই ঠকাত তিনিও ইচ্ছা করে ঠকতেন। এবং এটা তার কাছে কোন অনুতাপ বা পরিতাপের বিষয় ছিলনা। ছাত্র জীবনে ট্রেনের টিকেট কাটা হয়নি সে কথা

www.pathagar.com

মনে করে কর্মজীবনে একাধিক টিকেট কেটে ছিড়ে ফেলতেন বলতেন পূর্বের বাকী আদায় করছি। রিক্সা চালককে টাকা দিয়ে খুচরা টাকা ফিরিয়ে নিতেন না। মল্লিক ভাইয়ের অফিসে গেলে দেখা যেত নিয়মিত মেহমান আছে। তাদের থাকা খাওয়ার সব খরচই তার। মনে হতো দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের সমস্যাগ্রস্ত- কবি সাহিত্যিকদের আশ্রয়স্থল মল্লিক এর অফিস বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র। সরকার এবং কবির ভক্তরা তার রচনা সমগ্র প্রকাশ করে কবিকে সঠিক মূল্যায়ন করবেন সে প্রত্যাশাই দেশবাসীর। মল্লিক পৃথিবীর সংস্কৃতিবান এবং বড় মানুষদের কাতারে আজীবন বেচে থাকবে তার স্মৃতি রবে অটুট অম্লান।

লেখক: কবির একজন অনুজ প্রতিম সংবাদ কর্মী, সম্পাদক সাপ্তাহিক খানজাহান।

www.pathagar.com

'মল্লিক' আমার জীবনে ত্যাগের উৎস

মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন

'কবি মতিউর রহমান' দক্ষিন বঙ্গের তথা বাগেরহাটের সদর থানার বারুইপাড়ার মল্লিক পরিবারে জন্মগ্রহন করার কারনে আমরা সবাই তাকে মল্লিক ভাই বলে সম্বোধন করতাম। ছোট বড় সবাই তাকে আমাদের মল্লিক ভাই বলে জানতেন ও চিনতেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ছাত্র জীবন থেকে তিনি সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করার পর থেকে আপন ভাইয়েরা এমনকি আত্মীয় সজনের অনেকেই তার সাথে রুঢ় আচরন করতেন। তাকে অবহেলা করার নজির আমাদের অনেকের জানা আছে। অথচ যারা তার সাথে একান্তভাবে উঠা বসা চলা ফেরা করেছেন একান্তভাবে যারা তার জীবনের ত্যাগ ও কোরবানী দেখেছেন তার মধ্যে আমিও কাছের থেকে যথেষ্ট ইতিহাস জানা থাকলেও একটি সফরের ঘটনা পেশ করতে ইচ্ছা পোষন করছি। ৯০ এর দশকে ফকির হাটের পাইক পাড়া প্রাইমারী স্কুলে তফসীর মাহফিলে রাকীক বিন সাইদী, মল্লিক ভাই ও আমি তিন জন মেহমান। বয়সে মল্লিক ভাই আমার থেকে প্রায় ১২/১৪ বছর বড়, জ্ঞানে আমি তাকে গুরু মনে করতাম। বাদ মাগরীব মাহফিলে আমি আলোচনা করব। আমার পরে মল্লিক ভাই, তারপর রাকীক বিন সাঈদী বয়ান করবেন। এ কথা জানার পর তিনি আমাদেরকে বলেন তোমরা মুয়াজ্জজ উলামা আমার বয়ান তোমদের পরে শোভা পায় না বলতেই তিনি জোর প্রচেষ্টায় মঞ্চে চলে গেলেন এবং চমৎকার তেলোয়াতের মাধ্যমে বয়ান শুরু করলেন। তারপর আমি মঞ্চে গেলাম বয়ান করলাম সর্বশেষ রাকীক বীন সাঈদী বয়ানের মাধ্যমে মাহফিল শেষ করলাম। আজ তার দুজনেই ও পারে পাড়ি দিয়েছেন আমার সেদিনের বিশ্বাস রয়েছে যে মল্লিক ভাই ছোটদের মর্যাদা দিয়ে নিজের মহত্বের দৃষ্টান্তপেশ করে গেছেন।

অপর এক সফরে উৎকুল নিজ গ্রামে শ্রীঘাট পাশ্বের গ্রামে ২টা বার্ষিক মাহফিলের শেষে একত্রে নাইট কোচে সম্ভবত হানিফ পরিবহনে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করি। যশোর এসে রাত প্রায় ২টার সময় কাউন্টারে একটু বিরতিতে নামা মাত্রই কন কনে শীতে খুনখুনে বৃদ্ধা এসে বললেন বাবা আমাকে কিছু সাহায্য দাও। মল্লিক ভাই পকেটে হাত দিয়ে টাকা পয়সা যা ছিল দেখলাম মুঠ ভরে সব মনে হয় দিয়ে দিলেন।

সত্যি বিষয়টি তাই প্রমান হলো। সকালে যখন গাবতলী নামলাম তখন আমি উত্তরা যাবো আর মল্লিক ভাই আদাবর তার বাসায় যাবেন। মল্লিক ভাই বললেন, মোশাররফ তোমার কাছে টাকা আছে? থাকলে ২০/৩০ টাকা দাও ,বেবী ভাড়া দিতে হবে। তখন গাবতলী থেকে আদাবর ভাড়াও ২০/২৫ টাকা হবে। বুড়ি মহিলাকে রাত্রে সত্যি বেবী ভাড়া বা রাহা খরচ না রেখে পকেট উজার করে দিয়ে দিলেন। এমন মহৎ ব্যক্তি মুসলিক উম্মাহর মধ্যে কয়জন খুজে পাওয়া যায়। তাই বলছি মল্লিক শুধু আমার নয় গোটা মুসলিমের জন্য ত্যাগের উৎস।

লেখক : প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসা।

www.pathagar.com

স্মৃতির মনিকোঠায় মতিউর রহমান মল্লিক

মাওলানা আব্দুল লতিফ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক পীর খানজাহান আলী (রহঃ) এর জন্মভূমি বাগেরহাট জেলার কৃতি সন্তান। কে জানত এই শিশুটি ১৯৫৪ সালে অনগ্রসর পল্লী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে সে যৌবনে সারা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক ও ইসলামী সঙ্গীতের সম্রাটরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে যে সৃজনশীল প্রতিভা দান করেছিলেন সে ক্ষমতাবলে তিনি আজ বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনে সিপাহসালারের মর্যাদায় ইসলামী সমাজ গড়ার উৎসাহী তৌহিদী জনতার স্মৃতির মনিকোঠায় জাগরুক হয়ে আছেন। তার স্মৃতি ভুলবার নয়। চিরদিন তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে আমার জীবনের বহু স্মৃতি নাড়া দিচ্ছে। সেগুলো সব একত্রিত করলে একখানা পুস্তকে পরিনত হবে। তাই সংক্ষেপে দু'চারটি স্মৃতিচারণ করতে চাই।

প্রথম পরিচয়ঃ

১৯৭৪ সালের কোন এক শুভক্ষণে বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত কচুয়া উপজেলার আমিন দুদুর (কবির অত্যন্ত প্রিয় নাম) বাড়িতে একটি প্রোগ্রামের দাওয়াত দিলেন আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মাহবুবুর রহমান সরদার। তখন তিনি বাগেরহাট পি.সি কলেজের মল্লিক ভাইয়ের সাথে এইচ.এস.সি শ্রেণীতে পড়েন। আর আমি তখন বাগেরহাট জেলার মাধবকাঠি আহামাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আলিম শ্রেণীর ছাত্র। উক্ত প্রোগ্রামে আমার সঙ্গী হলেন, আমার সহপাঠি মোঃ আলতাফ হোসাইন এবং মল্লিক ভাই এর এক সহপাঠি মোঃ আলী আকবর। প্রোগ্রাম হবে বাদ মাগরিব। আমরা যথা সময়ে পৌঁছে দেখি আমিন দুদুর বাড়িতে দুজন মেহমান ইতিপূর্বে এসে পৌছিয়েছেন। এ দুজনকেই অত্যন্ত সুন্দর নূরানী চেহারা ও হাস্য উজ্বল মনে হলো। একজন খুলনা থেকে আগমন করেছেন। পীর বংশের খ্যাতিমান আলেম মাওলানা আঃ হামিদ। অপর জন বাগেরহাট থেকে এসেছেন। বাগেরহাট সদর থানার বারইপাড়া গ্রামে তার বাড়ী। নাম তার কবি মতিউর রহমান মল্লিক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সালাম দিয়ে মুসাফাহা সেরে যেভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মনে হলো আমার বড় অভিভাবক। তিনি যেন অনেক আগে ভাগে আমাকে চিনেন। অথচ কেবলমাত্র পরিচয়। তার নিজস্ব স্বভাবে আমাকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আপন করে নিলেন। আমিন দুদুর পরিচালনায় প্রোগ্রাম শুরু হলো। দারসুল কুরআন পেশ করবেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক। মনে মনে ভাবলাম কলেজ পড়ুয়া লোক কুরআনের দরস পেশ করবেন, সে আবার ছোট জামা পরিহিত কিস্তি টুপি মাথায় এতো মানায় না। কারন আমি আলিম পরিবারের লালিত-পালিত বিধায় ছোট জামা

www.pathagar.com

এবং খাট দাড়ির ব্যাপারে একটু আপত্তি ছিল। কেননা আলিম শ্রেণীতে পড়া সত্ত্বেও আমি মনে করতাম ইসলাম হচ্ছে, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জামা এবং দাড়ি টুপির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাহোক কবি মতিউর রহমান মল্লিক যখন সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন, তখন আমার ধারণা পরিবর্তন হতে লাগল। তিনি অত্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে দারসুল কুরআন পেশ করলেন। আমি জীবনে বহু ওয়াজ-মাহফিল শুনেছি, কিন্তু এমন সুন্দর কুরআনের দরস শুনিনি। জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। অতএব আল্লাহর খরিদ করা জান ও মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করলেই পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে এ আবেদনমূলক দারস থেকেই আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে গেল। ইসলাম শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ বিধান কায়েম করা সব ফরজের বড় ফরজ। উক্ত প্রথম টি.এস. প্রোগ্রামে এ ছবক গ্রহণ করলাম। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমানোর পূর্বে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠে শুনতে পেলাম সরচিত কবিতামালা ও সঙ্গীত। আমার মনে হতে লাগল এমন সুন্দর প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করে আমি ভাগ্যবান। সেদিন থেকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের হাতে ইসলামী আন্দোলনের উদ্যম সৃষ্টি হলো। যে কারনে আজও মল্লিক ভাইয়ের একজন শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

লেখক : ভাইস প্রিন্সিপাল, মাধবকাঠী আহমাদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদারাসা, বাগেরহাট।

www.pathagar.com

এ্যাড: মো: শামছুজ্জামান

গৃহশিক্ষকের হাত ধরে বারুইপাড়া সিদ্দিকীয়া মাদরাসায় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে আমি তখন প্রাইমারির গন্ডি পার হইনি। ছোট বেলার কোন একটি ঘটনা হৃদয়ে স্পন্দিত শুধু শুধু হয়না। মাহফিলে মল্লিকের এক গান আমাকে এতোটাই আন্দোলিত করেছিল যে, আজও সে গানেই আমি রোমান্থিত হই

"মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি/ আমি চির রণবীর/ আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানিনা নারায়ে তাকবির" মাহফিলে মল্লিকের এ গান শেষে আবেগ-আপ্লুত হয়ে প্রধান অতিথি ঘুনির পীর সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে পকেট থেকে ৮টাকা উপহার দিয়েছিলেন। লাজুক মল্লিক টাকা নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে শ্রোতারা সমস্বরে বলে উঠেছিল **"এ-মতি, নিসনে ক্যানো, নে- নে"** সেই থেকেই আমি মল্লিকের অন্ধ ভক্তে পরিণত হই। জীবনের প্রত্যেক পরতে মল্লিক আমার সাথে একাকার হয়ে যায়। মল্লিকের এ গানের মর্মার্থ যেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের "আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান" এ গানের যে আবেদন, তার অনেকটা পূরণ করেছিল। তার জীবনটা অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এই মানুষটি আমার জীবনে প্রতিটি স্তরেই প্রবাভ ফেলেছিলেন। সেই শিশুকাল থেকে আমার অঘোষিত অভিভাবকে পরিণত হন। আমার বাড়ি থেকে কোথাও যেতে হলে আব্বা-মা'র অনুমতি নেয়া খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু বাড়িতে যদি বলতাম মতি ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি, তাইলে অনুমতি লাগতো না। এভাবে কতদিন যে মল্লিক ভাইয়ের কথা বলে বন্ধুদের সাথে আড্ডাবাজিতে গিয়েছি তার কোনো ইয়াত্তা নেই। এভাবে শুধু আমার পরিবার নয়, কাঁঠালতলা, পাইকপাড়া, বারুইপাড়া গ্রামের অনেক পরিবারের আস্থভাজান এক কিশোরের খ্যাতি অর্জন করেন মল্লিক। মল্লিক ভাই বারুইপাড়া বাজার থেকে চাঁর (স্যাঁকো) পার হয়ে পাইকপাড়ার মেঠো পথ বেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে চিৎফটাং দিয়ে শুয়ে পরতেন। আমার মা সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘরে গিয়ে ডিম হাফ-বয়েল করে খেতে দিতেন এবং সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারকেল-গুড়, মুড়ি খেতে দিতেন। এসবের মধ্যে মল্লিক ভাই আমাদের গান শোনাতেন। মল্লিকের গান শোনার জন্য আশ-পাশের অনেক বাড়ি থেকে মহিলারাও আমাদের ঘরে এসে জমা হতো।

১৯৮৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার শেষে ঢাকায় আসার প্রবল ই"ছা। কিন্তু পরিবারকে কোনোভাবেই রাজি করতে পারছিলামনা। অনেক ভেবে-চিন্তে নতুন এক ফঁন্দি আঁকলাম। যেহেতু আমার পরিবার মল্লিকের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল, সেটাকে ব্যবহার করতে হলো

www.pathagar.com

আমাকে। নিজে মল্লিক সেঁজে চিঠি লিখলাম। "স্নেহের শামছুজ্জামান, তুমি যদি আইআইইউসিটি, গাজীপুর- এ ভর্তি হতে চাও, ১২০০ টাকা নিয়ে ঢাকায় চলে আসো। ইতি, মতি মল্লিক" খুলনায় গিয়ে আমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পোস্ট করলাম। চার-পাঁচ দিন পর সে চিঠি বাড়িতে আসলো। সে চিঠি পেয়ে আমার আব্বা-আম্মা ১৬০০ টাকা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করে দেন। প্রচন্ড আবেগঘন পরিবেশে আমি ঢাকায় আসি। ঢাকায় মল্লিক ভাই আমার একমাত্র অভিভাবক হয়ে যান।

সেই ৮৫ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার প্রতিটি কাজ-কর্মে তার উপস্থিতি ছিল। কোন এক মূহুর্তের জন্যও তাঁর সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটেনি। আমি তার সাথে একাকার হয়ে যাই। তার একান্ত ইচ্ছায় আমি আইন পেশাকে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করি। সে সময়ে যদি তার পরামর্শ না পেতাম তাহলে হয়তোবা আমাকে অন্য পেশায় যেতে হতো।

মল্লিক ভাই দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থ ছিলেন। সাধ্যমত তাঁর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। এই মানুষটিকে এতো দ্রুত হারাতো হবে, তা কখনো ভাবিনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাল মানুষদের কেন আল্লাহ আরেকটু বেশি সময় দুনিয়ায় রাখেনা। মল্লিক ভাই বাগেরহাট ফোরামের আজীবন সভাপতি ছিলেন। মল্লিকের কারণেই ফোরামে সবসময় সক্রিয় ছিলাম, আজও তার হাতে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনে আছি। এ সংগঠনের কাজকে মল্লিকের অসমাপ্ত কাজ হিসেবেই মনে হয় আমার। যাইহোক অসুস্থতার কারণে কিছুদিন ফোরামের দেখ-ভাল করতে পারেননি। তবে তিনি যেসব পরামর্শ বা কর্মপন্থা দিয়ে গেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বাস্তবভিত্তিক ও একটি সফল সংগঠনের কর্মসূচি।

মল্লিক ভাইকে হাসপাতালে প্রায়ই দেখতে যেতাম, রমজানের ভোর রাতে সেহরি খেতে হবে তাই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত তখন অনেক গভীর। মোবাইলে স্নেহের গালিবের (ছাত্রফোরামের সভাপতি আসাদুল্লাহিল গালিব) কল বাজছে। রিসিভ করতেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভেসে এলো " মল্লিক চাচা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন" আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেললাম। মাথার ওপর যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়লো। সারারাত চোখের দু'পাতা এক করতে পারলাম না। জীবনের বাঁকে বাঁকে মল্লিক ভাইয়ের স্মৃতি ভেসে আসতে ছিল। পহেলা রমজান সকালে মগবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জানাজায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব ইমামতি করলেন। কবি আল মাহমুদসহ অনেকেই জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর দ্বিতীয় জানাজা হলো বায়তুল মোকাররমে। আন্দোলনের জন্য এক প্রতিকূল সময়েও মল্লিকের জানাজায় অংশ নিতে মানুষের ঢল নেমেছিল। সে দিনে মল্লিকের অনুরক্তদের বিশাল মিছিলে সবাই দারুনভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। এতো দিন জীবিত মল্লিকের চারিত্রিক মাধুর্য মানুষের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল বায়তুল মোকাররমে উপস্থিত না হলে বুঝতে পারতাম না। কত মানুষযে দূরদূরান্ত থেকে এসে জানাজা পায়নি। আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা না হলে এতো মানুষের হৃদয় জয় করা সহজ নয়।

লেখক: বাগেরহাট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক ও আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

www.pathagar.com

বোনের এই মোনাজাত কবুল করুন প্রভু

মাসুদা সুলতানা রুমী

খুব আপনজনের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে দুইদিন। একবার এই ২০১০ সালেই। চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার কিছুদিন আগে, ইবনে সিনা হাসপাতালে।

আর একবার তার প্রত্যাশা প্রাঙ্গনের অফিস রুমে। তখন তিনি ছিলেন সুস্থ এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। আমি আর ইঞ্জিনিয়ার নূর (আমার গৃহকর্তা) গিয়েছিলাম। প্রিয় গীতিকার, শিল্পী এবং কবির সাথে দেখা করতে। এ ছাড়াও অল্প স্বল্প দেখা সাক্ষাত দু' চারবার হয়েছে তা এই প্রত্যাশা প্রাঙ্গনেই।

যদিও তাকে জানি ১৯৮৬/৮৭ সাল থেকে, তার গানের মাধ্যমে। একদিন ছোট ভাই মিজান এসে বল্ল, "আপা দেন তো আপনার ক্যাসেটগুলো অজু করায়ে আনি।" মিজান কি বলতে চায় বুঝলাম। কয়েকদিন আগে নাকি ওদের সব ক্যাসেট অজু করায়ে এনেছে। মানে বাদ্যওয়ালা আজে বাজে সব গান মুছে ফেলে ইসলামী গান রেকর্ড করে এনেছে। হাসি মুখে বল্লাম, ঐ তো র‍্যাকে সব আছে নিয়ে যাও।

মিজান সব ক্যাসেট একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে গেল। দিন দুই পরে ক্যাসেটগুলো নিয়ে এসে বাজাতেই আমি মুগ্ধতায় যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। বাদ্য ছাড়া গান যে এতো শ্রুতিমধুর হয় তা আমার জানা ছিল না। ইসলামী গান বলতে কিছু নজরুল গীতি আর গ্রাম-গঞ্জে গাওয়া গজল নামে পরিচিত– ইয়াকুব নবী বাস করিতেন কেনানে, কিংবা বড় বড় বাড়ি ঘর ফেলিয়া জাতীয় একই সুরের কিছু গানকেই বুঝতাম। কিন্তু এই গানগুলোর সুরের বৈচিত্র আর কথার মাধুর্যে অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই সব গানের শিল্পী কে? গীতিকার কে?

মিজান হাসি মুখে খুব গর্বের সাথে বল্ল "এইসব গানের গীতিকার, সুরকার এবং বেশ কিছু গানের শিল্পীও মল্লিক ভাই।"

বল্লাম, মল্লিক ভাই কে?

ও বলল উনি বড় মাপের একজন কবি, এরপর যখন প্রত্যাশায় মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, সালাম দিলাম বললাম কেমন আছেন?

: কবি মতিউর রহমান আমাকে বললেন, 'সোনালি ডানার কবিকে চিনব না ক্যান? কেমন আছেন?'

বল্লাম, আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

www.pathagar.com

মল্লিক ভাই অতি আপন জনের মতো আস্তে আস্তে বল্লেন। "রুমী আপা আমি খুব খুশি হয়েছি- আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন।"

আমার তখন খুব কান্না আসছিল এই ভেবে যে ক্যান আরও আগে আসিনি? মল্লিক ভাই বলছিলেন, "কিছুই করতে পারলাম না। অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। এই তো অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে ভাবলাম আপনার মতো ছোট ছোট কিছু বই লিখি। তা বই লিখে আবার কার কাছে ধর্না দেব? কারো কাছে ধর্না দিতে পারি না। ভাবতে ভাবতেই সময় চলে গেল- লেখা আর হলো না।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লেন, 'ছোট বেলা থেকে ফরজ ওয়াজিব তরক করেছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু নফল ইবাদাত তেমন একটা নেই বল্লেই চলে।' মল্লিক ভাই এর চোখ দুটি পানিতে ভরে গেল। আমরা দুই বোনই কেঁদে ফেললাম। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্লাম, ভাই আপনার মতো এতো নফল ইবাদত ইসলামী আন্দোলনের আর কোন কর্মীর আছে কিনা আমার জানা নেই...। মল্লিক ভাই অবাক হওয়া কণ্ঠে বল্লেন, 'কি বলেন? কই?'

চোখের পানি মুছে আবার বল্লাম, ভাই এই ঢাকা শহর থেকে শুরু করে প্রতিটি জেলা থানা এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের গান বাদে ইসলামী গান বলতে যা বোঝায় তা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান। প্রত্যন্ত গ্রামের মসজিদ কিংবা মক্তব ভিত্তিক কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী শিশু ছেলেটি কিংবা মেয়েটি যখন গায় 'আল্লাহ আমার রব/ এই রবই আমার সব' কিংবা 'নেই কেহ নেই আল্লাহ ছাড়া, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ....।'

তখন সেই প্রতিযোগী হয়ত জানেও না গানটি কোন্ গীতিকারের। এর চেয়ে বড় নফল ইবাদাত আর কি হতে পারে ভাই। আপনার মৃত্যুর পরও এইসব গান সাদকায়ে জারিয়া হয়ে গীত হতে থাকবে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

মল্লিক ভাই এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। চোখ বন্ধ করে থাকলেন কিছু সময়। তারপর বল্লেন, "রুমী আপা, আমি এভাবে কোনোদিন ভাবিনি...। আমার জন্য দোয়া করবেন আপা...।"

বল্লাম, আল্লাহ সুবহানাল্লাহ যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন। আর তাঁর কাছে যাওয়ার ডাক যদি এসেই যায় তবে পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে যেন যেতে পারেন। আমার জন্যও দোয়া করবেন ভাই।

"আপনাকেও যেন আল্লাহ কবুল করেন আর ঈমানের সাথে গ্রহণ করেন।" –বল্লেন মল্লিক ভাই।

: আমীন বলে উঠে দাঁড়ালাম। বল্লাম, আসি ভাই।

জুম্মির দিকে তাকিয়ে, আসি মা– আসসালামু আলাইকুম বলে চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে আসলাম, ইবনে সিনা হাসপাতাল থেকে।

ঐ কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকল। মৃত্যু পথযাত্রী অতি উত্তম একজন মানুষের দোয়া- এ যে আমার বিরাট পাওয়া।

www.pathagar.com

মল্লিক ভাইয়ের সাথে এর আগেও আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। একবার ইঞ্জিনিয়ার নূর আমার সাথে ছিলেন। সেই প্রথম, ইঞ্জিনিয়ার নূরের সাথে মল্লিক ভাই অনেক বিষয়ে অনেক কথাই বল্লেন। প্রথম দেখাতেই একজন মানুষের সাথে অত আপনজনের মতো কথা বলা যায় তা মল্লিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় না হলে, বুঝতে পারতাম না।

আমি ঠাট্টা করে বল্লাম, আমরা তো মনে করেছিলাম আপনি যশোরের জামাই হবেন। তা কি দিয়ে কি করে আপনি কোথায় চলে গেলেন।

নূর আর মল্লিক ভাই হাসতে লাগলেন। হাসি মুখেই মল্লিক ভাই বল্লেন, "তাই শুনেছিলেন বুঝি আপনারা?"

বল্লাম, হ্যা শুনেছিলাম। শুনে খুব খুশিও হয়েছিলাম। তারপর হলো না ক্যান বিয়েটা?

: ওরাই তো দিল না।

: ক্যান?

: আরে আমার কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দেয় নাকি? আমার চাল নেই চুলো নেই। আবার হাসলেন মল্লিক ভাই।

বল্লাম, বল্লেই হলো, আপনার বুঝি আর বিয়ে হয়নি? যশোরের ওদের চেয়ে অনেক ভালো জায়গায় বিয়ে হয়েছে, আপনার।

মল্লিক ভাই বল্লেন, "তা অবশ্য ঠিক। সাবিনাদের পরিবারটা সত্যি খুব ভালো এবং সাহিত্যের পরিবেশ আছে, ওদের পরিবারে। তো এই বিয়েই কি হতো নাকি? হাফেজা আসমা খালাম্মা কতো কি করে বিয়েটা দিয়েছেন। আমার বিয়ের কেনা-কাটা সবই আসমা খালাম্মা করেছেন- শাড়ি গহনা পর্যন্ত।

কি সহজ উচ্চারণ। মানুষকে আপন করে নেয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার কথায়, তার আচরণে। একজন সঠিক মানের মুসলমানের যা থাকা উচিত মল্লিক ভাইয়ের তা ছিল।

মল্লিক ভাইয়ের উপস্থিতি পৃথিবীর আলোতে বাতাসে নেই। তাই বলে মল্লিক ভাই নেই একথা বলা যাবে না। মল্লিক ভাই আছেন তার কবিতায়,তার সাহিত্যে, সর্বোপরি তার গানে।

মহান রাব্বুল আলামিন মল্লিক ভাইয়ের এবং তার সকল নেক কর্মকান্ডকে যেন কবুল করে নেন। তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে তার নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করেন।

চির কল্যাণ, চির শান্তি বর্ষিত হোক আমার মল্লিক ভাইয়ের উপর। এক ভাইয়ের জন্য বোনের এই মোনাজাত কবুল করুন প্রভু। যে বোনের সাথে তার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, আছে বুক ভরা অনাবিল ভালোবাসা....। আমীন। সুম্মা আমীন।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

www.pathagar.com

জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে

তৌহিদুর রহমান

নজরুল থেকে মল্লিক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের প্রাণের কবি, প্রেরণার কবি, ভালোবাসার কবি, যুদ্ধের কবি, আকাশ বাতাস মর্তের কবি, আল্লাহ রসূলের কবি, বেহেস্তের কবি, ইহকাল পরকালের কবি। কৃষক-কুলি-মজুরের কবি, মানুষের কবি, মানবতার কবি। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রিতে সেতারের সুর ঝংকার তোলে 'মুসাফির মোছরে আখি জল ফিরে চল আপনারে লয়ে', অথবা 'ওরে ও মদীনা বলতে পারিস কোন সে পথে তোর, যেথা হাসান হোসেন করতো খেলা ধুলা নিয়ে মোর', তারপর 'সুদূর মক্কা মদীনার পথে আমি রাহে মুসাফির' অথবা 'দূর আজানের মধুরও ধ্বনি বাজে বাজে মসজিদেরই মিনারে' অথবা 'আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে, ফলবে ফসল বেচবো তারে কেয়ামতের হাটে' অথবা 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ!' এ ধরনের শত শত গান বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। যতই দাদা বাবু! দাদা বাবু করে কতিপয় পরগাছা বুদ্ধিজীবী নামের কিট-পতঙ্গ মিডিয়াতে হাই তুলুক না কেন, তাদের নেশার ঘোর কখনোই কাটবে না। কারণ ফেনসিডিল খোররা কখনো সুনির্মল আকাশ দেখতে পায় না, তারা চোখের সামনে শুধুই দেখতে পায় খয়েরি রঙের একটা একশ'গ্রাম ওজনের চরণামৃতের বোতল। কুয়োর ব্যঙ সাগর কি জিনিস বুঝবে কি করে! নজরুলের মতো বিশাল মহাসাগরকে বক্ষে ধারণ করতে হলে আপনার হৃদয়টা কত বড় বিশাল হতে হয় তা তাদের মনের চৌহদ্দিতে কখনোই স্থান পাবে না। কারণ, 'হুতোম পেঁচারা কহিছে কুটরে হইবে না আর সূর্যোদয়, কাকে তার টাক ঠোকরাইবে না হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়, বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চাহে চাহে জ্যোতি! তারা চাহে না এ অশান্তি এ দুর্গতি!' আমাদের নজরুল শত্রুর মুখে ছাঁই দিয়ে 'ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিয়ে পদচিহ্ন, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছে...' তাকে টলাতে পারে সাধ্য কার!

'পথের বায়ে উর্ধ্বে উঠেছে পথের আবর্জনা, তাই বলে উহারা উর্ধ্বে উঠিয়াছে এ কথা কেহ কভু ভাবিও না।' 'হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু, বুঝিব মোদের পরীক্ষা করেন মোদের পরম প্রভু!' নজরুল আমাদের প্রেরণার কবি, ফররুখ আমাদের চেতনার কবি, আল মাহমুদ আমাদের প্রাণের কবি আর কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাদের বিশ্বাস আর ভালোবাসার কবি। তাকে প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতাম! এখনো বাসি, বাসবো আমৃত্যু। আমরা বিশ্বাস করি কবি নজরুলের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিশ্বাসী মানুষের ভালোবাসা পাবেন। যতদিন দুনিয়ার বুকে ইসলাম টিকে থাকবে ততদিন নজরুল,

www.pathagar.com

ফররুখ, আল মাহমুদ ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক বেঁচে থাকবেন কোটি কোটি সাধারণ বিশ্বাসী মানুষের অন্তরে।

দরদি মনের মানুষ ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক

মানুষকে ভালোবাসার গুণ সবার মধ্যে আল্লাহ সমানভাবে দেননি। আর ইচ্ছা থাকলেই একজন মানুষ সকলকে ভালোবাসতেও পারেন না। এক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন ব্যতিক্রম। মানুষকে ভালোবাসাই ছিল তার কাজ। অসম্ভব দরদি মনের মানুষ ছিলেন তিনি। মানুষকে কাছে টেনে নেবার অকল্পনীয় ক্ষমতা ছিল তার মধ্যে। গ্রামের একজন অতি সাধারণ মানুষও মল্লিকের সমাদর পেয়েছেন। বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সমমনা-বিরোধী, কালো-ধলা, কৃষক, মজুর, গায়ক, কবি, লেখক, উঁচু-নিচু সবাইকে। প্রথম দর্শনেই কবি মতিউর রহমান মল্লিক একজন মানুষকে আপন করে নিতেন। তিনি সবাইকে শুনতেন, একেবারে চোখ মেলে নিবিড়ভাবে দেখতেন তারপর হৃদয় দিয়ে বুঝতেন। এরপর হাত বাড়িয়ে দিতেন সহযোগিতার– এটা ছিল তার 'আজীবনের সাধনা'। সাধনা বললাম এই কারণে যে, সাধনা ছাড়া কখনোই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। মুখে অনেকেই বলতে পারে 'আই লাভ ইউ'। কিন্তু এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যে কত বড় কঠিন কাজ তা মানুষ মাত্রই টের পায়। আমরা মল্লিক ভাইয়ের সাথে সারাদিন কাজ করেছি তিনি আমাদের মাথার ওপরে ছাতা হয়ে থেকেছেন। আমরা কখনো বিরক্ত হয়েছি। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছেন। কখনো আমরা তাকে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু তিনি জড়িয়ে ধরেছেন শক্তভাবে। এসব কিছুই আজ আশ্চর্য আমাদের কাছে।

একজন পরিপূর্ণ মুসলমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে

মল্লিক ভাইয়ের সাথে হাজারো ঘটনা, হাজারো স্মৃতি প্রতি পদক্ষেপে আমার মনে পড়ছে। মল্লিক ভাই যখন যেখানে যে কাজে ডেকেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানে হাজির হয়েছি। আল্লাহ রসূলের প্রকৃত অনুসারি ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। অনেক নেতাই পরিপূর্ণভাবে সালামের জবাব দেন না। দু'একজন সালামের উত্তরে ঠোঁট নড়ালেও মুখের বাইরে কোন আওয়াজ শোনা যায় না। অনেকে তো কোন কথায় বলেন না। এখন আপনিই বলুন, কিভাবে ঐ নেতৃত্বের আনুগত্য করবেন? কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম! তিনি সব সময় মানুষকে আগে সালাম দিতেন। তাকে আগে সালাম দিতে পেরেছি, এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। আনুগত্য কি কখনো চেয়ে পাওয়া যায়! একজন পরিপূর্ণ মুসলমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে, চোখ বন্ধ করে তার আনুগত্য করে। এখানে বড়-ছোট, জ্ঞানী-বিদ্বানের মানদণ্ড কোন কাজে আসে না। আরবের ধনী-গরীব, বিদ্বান-বুদ্ধিজীবী সবাই রসূলের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল তার সততার কাছে! আমি দেখেছি, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কথাশিল্পী জামেদ আলী, লেখক মাহবুবুল হক, মওলানা আবদুল মান্নান তালিব, বিচারপতি আবদুর রউফসহ অনেকে কবি মতিউর রহমান মল্লিককে শ্রদ্ধার সাথে ভাই বলে ডাকতেন।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন বা সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের তাবৎ জঞ্জাল সরানোর মহান ব্রত নিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই সংস্কৃতির

www.pathagar.com

অঙ্গনকে খোদার রঙে রঙিন করা। এই অঙ্গন থেকে বিজাতীয় সংস্কৃতির অপসারণ করে সুস্থ ধারার বিকাশ ঘটানো। তিনি আমৃত্যু খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে গেছেন। তিনি জানতেন, 'সামনে বাড়াল পা যারা আজ নতুন পৃথিবী গড়তে/ জানাতো আছে তাদের সবারই কত যে হবে লড়তে'। তিনি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে আমাদের তরুণ সমাজকে বাঁচানোর তাকিদে। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভ-লোকসানের চিন্তা তিনি কখনো করেননি। তিনি চেয়েছিলেন গানের মাধ্যমে, কবিতার মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানকে আল্লাহমুখী করতে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সাংস্কৃতিক বিজয় ছাড়া অন্য সব প্রস্তুতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। এজন্যে তিনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একদল নিবেদিত প্রাণ আল্লাহ ওয়ালা কর্মী তৈরি করার জন্য নিরন্তর ছুটে বেড়িয়েছেন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সুন্দরবন থেকে বান্দরবন। যখনই কোন প্রতিভাবান গায়ক, নায়ক, লেখক, কবির সন্ধান পেয়েছেন ছুটে গেছেন তার কাছে। তিনি কত বড় বা ছোট মাপের লোক তা কখনো বিবেচ্য মনে করতেন না। যখন আধুনিকমানের স্টুডিও ঢাকা শহরে তেমন একটা গড়ে ওঠেনি, হাতে গোণা দু'একটামাত্র ছিল। তাও আবার সবই বাম আর রামদের দখলে। নিজের সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবেই সাইমুমের একটা গানের অডিও ক্যাসেট বাজারে আসত। সেসব দিনের কথা ভোলা যাবে না কোন দিন। তিনি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন বা সম্পর্ক ছিন্ন করতেন।

তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ

'সে কোন বন্ধু বল বড় বিশ্বস্ত, যার কাছে মন খুলে দেয়া যায়, হওয়া যায় বেশি আশ্বস্ত!' রসূল স.-এর চরিত্রের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলে কবি মতিউর রহমান মল্লিক এ ধরনের অনেক গান লিখেছেন। সারা বাংলাদেশের হাজার হাজার কর্মী কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একদম হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তাঁর দরদ ভরা ভালোবাসার ছোঁয়ায়। তার সাথে সবাই মন খুলে কথা বলতে পারতেন। কেউ ইতস্তত করলে তিনি তার সাথে একান্তে বসতেন। এভাবে তিনি অনেকের মনের অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হতেন। তিনি অনেককে পড়ার খরচ দিয়ে, চাকরি দিয়ে এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি যেকোন একজন সাধারণ কর্মীকেও পদস্খলন থেকে বাঁচাতে ছুটে যেতেন তার কাছে।

বাংলা ভাষায় আল্লাহ, রসূল ও সাহাবাদের নিয়ে অসংখ্য গান লেখা হয়েছে। এ ধরনের অধিকাংশ বড় লেখক, কবি, গীতিকারের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। অনেকের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং আছে। দেখেছি, হাতে গোণা দু'একজন ছাড়া কারো কথার সাথে কাজের মিল নেই। অর্থাৎ তিনি যা লেখেন তার সাথে তার কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেই নিজের নামের আগে পরে অধ্যাপক, লেখক, কবি, শিল্পী বসানো অনেককে দেখেছি যারা জীবনে নিয়মিত নামায পড়েননি অথচ নামায নিয়ে গান, কবিতা, নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখেছেন অসংখ্য! অনেককে জীবনে চারআনা পয়সা দান-খয়রাত করতে দেখিনি অথচ নবী-রসূল, সাহাবীদের দান খয়রাতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে শত শত পৃষ্ঠা লিখেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি মতিউর রহমান ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম! তিনি যা আয়-রোজগার করতেন তার প্রায় পনের আনাই দান-খয়রাত বা শিল্পী কবি সাহিত্যিকদের পিছনে ব্যয় করে

www.pathagar.com

ফেলতেন। অনেক সময় তিনি ধার-দেনা করেও এ ধরনের খরচ অব্যাহত রাখতেন। সাবেক বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবদুর রউফ সাহেব কবি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন, মল্লিক ছিলেন সাহাবাদের মতো একজন অনুকরণীয় আদর্শ।

কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা

মল্লিক ভাই দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের একটা আল কুরআনের দারসের ক্লাস নিতেন। অসম্ভব দরদ দিয়ে তিনি আমাদের শেখাতেন। যেকোন সূরার দারসের জন্য তিনি ঐ সূরা সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো নোট করে আনতেন। আমাদেরও ঐ সূরা সম্পর্কিত হাদিস খুঁজে-পেড়ে লিখে আনতে বলতেন। সবার নোট মেলালে অসম্ভব একটা দারস হতো। এত সুন্দর দারস আমরা জীবনে খুব কমই পেয়েছি। মল্লিক ভাই কখনো কখনো দারস দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলতেন! আমাদের চোখ ছল ছল করে উঠতো। তার পড়া-শোনার গভীরতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওপরের নির্দেশে কেন জানি না দারসের ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি আমাকে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে বকাবকি করেছিলেন! আমি যেহেতু এই ক্লাসের কোঅর্ডিনেটর ছিলাম সেহেতু সব দোষ আমার ঘাড়েই পড়েছিল। অথচ এই ক্লাস বন্ধের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না! মল্লিক ভাইয়ের কথার প্রতিবাদ করার সাহস আমাদের অনেকেরই ছিল না, তাই নীরবে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমারও কিছুই করার ছিল না। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, অমুককে বলে দিও কুরআন ভালোভাবে না শিখলে জীবনে কিছুই শেখা হবে না! আমি সেদিন দেখেছিলাম কুরআনের প্রতি মল্লিক ভাইয়ের ভালোবাসা কত গভীর!

কোন দায়িত্ব সহজে নিতে চেতেন না, তবে দায়িত্ব এসে গেলে জান-প্রাণ দিয়ে তা পালন করতেন। তখনো ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। জনাব আবদুল মান্নান তালিব সাহেব পৃথকভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগের কাজ করার জন্য মহানগরের অধীন সাহিত্য বিভাগ নামে একটা পৃথক ইউনিট চালাতেন। আমি রমনা থানার কর্মী হওয়ার পরও এই ইউনিটের ছোট-খাট দায়িত্ব পালন করতাম। বিশেষ করে বায়তুলমাল আদায় ও তার হিসাব কিতাব করে দেয়া। মূলত আবদুল মান্নান তালিব সাহেব চিরদিন একাই দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত। তিনি এখনো অন্যের সাহায্য খুব কমই গ্রহণ করে থাকেন। যাহোক, পর্যায়ক্রমে মল্লিক ভাইয়ের কাঁধে সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব এল। বলাবাহুল্য, মল্লিক ভাই কোন দায়িত্ব সহজে নিতে চেতেন না, তবে কোন দায়িত্ব এসে গেলে জান-প্রাণ দিয়ে তা পালন করতেন। আমি তখন রমনা থানার ৬৫ নং ওয়ার্ডের একজন নগণ্য কর্মী। মল্লিক ভাই আমাকে বারবার সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে এসে কাজ করার জন্য তাকাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু রমনা থানার দায়িত্বশীল ভাইয়েরা কিছুতেই আমাকে ছাড়লেন না। তারপরও মল্লিক ভাই আমাকে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন সাহিত্য ইউনিটের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে। চৌদ্দ শতক উদযাপন কমিটি, ঐতিহ্য সংসদ, নাট্যমঞ্চসহ অন্য বড় বড় অনুষ্ঠানের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব তিনি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগের একে একে দায়িত্ব পালন করেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, খন্দকার আবদুল মোমেন প্রমুখ। এটা ক্রমান্বয়ে ইউনিট থেকে ওয়ার্ড, ওয়ার্ড থেকে থানা এবং সর্বশেষ অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের নেতৃত্বে নিজেই একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন এটা একটা রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক, বাম রাজনীতি ও ভুপেন হাজারিকা

'মানুষ মানুষের জন্য' এটা কবি মল্লিকের সাথে পরিচিত না হলে টের পেতাম না। এক সময় ছাত্র জীবনে ভুপেন হাজারিকার গান শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য'। তখন ভাবতাম মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে দেব। ভুপেন হাজারিকাকে জীবনের আদর্শ মানুষ মনে হতো। ভুপেনের গাওয়া এক একটি গান আমাদের অনেককে আকাশ সমান উঁচুতে নিয়ে যেত। 'সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'–এমন ব্রত নিয়ে সামনের পথ চলতাম। ভুপেনের গানগুলো এখনো হৃদয়ের গিটারে ঢেউ তোলে। বারবার মনে পড়ে, 'আমায় একটা সাদা মানুষ দাও যার রক্ত সাদা, আমায় একটা কালো মানুষ দাও যার রক্ত কালো' অথবা 'ও মালিক সারা জীবন কাঁদালে যখন এবার মেঘ করে দাও, কাঁদতে পারবো পরের সুখে অনেক ভালো তাও' অথবা 'বিস্তীর্ণ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও ও গংগা তুমি... বইছো কেন'। এধরনের অজস্র গান এখনো মনের মণিকোঠায় তুলে রেখেছি সযতনে। কিন্তু মনের সেই অমূল্য স্থানে স্থান দিতে পারিনি ভুপেন হাজারিকাকে। কারণ সাদা কালো, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে মানবতার জন্য ভুপেন হাজারিকা জীবন পর্যন্ত লড়ে যাবার শপত নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে সেই শপতের মালা দলিত-মথিত করে মানবতাকে তিনি চরণামৃতের ভাণ্ডে ঢুকিয়ে অপমানিত করেছেন সমগ্র মানব সমাজকে। আসলে আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজতন্ত্রীরা সব সময় পরজীবী হয়ে থাকে। এরা সব সময় অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে সামনে এগিয়ে যায়। মঞ্চে পুজিবাদের বিরুদ্ধে বুলি কপচায়, কিন্তু নিজেরাই একেক জন মহাপুজিপতি। টাকা দেখলে এদের জিহ্বা পাঁচ হাত বেরিয়ে আসে। এরাই শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে চরম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ধনীদের হত্যা করে গরীব বাঁচাও- এটাই ছিল এদের মূলমন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাতদিন গালাগালি করে, কিন্তু তাদের সাথেই এদের গলাগলি। এমন কোন বাম নেতা কী আছে যার ছেলেমেয়ে ইউরোপ আমেরিকায় লেখাপড়া বা বসবাস করে না? যাহোক, মানবতার ধ্বজাধারী এই ভুপেনই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লোভে– রাহুল গান্ধীর মতে, ভারতের চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপি শিবসেনার পায়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে এতোদিন যা করেছিলাম তা সবই ভুল আর মিথ্যা ছিল। এরা ভিতরে ভিতরে চরম সাম্প্রদায়িক। বামরা চিরদিন চরম মিথ্যার ওপরই প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তবে তাদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি, তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক এদিক দিয়ে আদর্শ স্থানীয়। তার ভিতর আর বাহির বলে কিছু ছিল না। তার ভেতর আর বাহির পুরোটাই ছিল সাদা। একেবারে ধবধবে সাদা। ভুপেন হাজারিকা বা তথাকথিত বাম নেতাদের মতো ব্যামো তার মধ্যে ছিল না। তিনি যা বুঝতেন সরাসরি বলতেন। বাম শয়তানদের মতো 'মনে মনে শেখ ফরিদ বগলে বান্ধা ইট' এ ধরনের কপটতা ছিল তার অপছন্দ। বামরা সব সময় মুসলমানদের বলে সাম্প্রদায়িক, অথচ ভারতে যে অজস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম নিধন হচ্ছে সেক্ষেত্রে এরা চুপ। বাবরি মসজিদ ভাঙা হলো এরা চুপ ছিল। গুজরাটে গণহত্যা হলো তাও এরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিল। মুসলমানদের হত্যা করলে বামরা হাততালি দেয়। একজন অন্য ধর্মেরবাম ও মুসলিমবাম এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের ফারাক। হিন্দু ধর্মীয় বামপন্থি তিনি

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে একজন ধার্মিক হিন্দু। তিনি নিজের ধর্মকে যারপরনাই অসম্ভব রকমের ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। এরা কখনো হিন্দু ধর্মকে গালাগালি করেন না। কিন্তু মুসলিম বাম! তার যেন জন্মই হয়েছে ইসলামকে মুসলিমকে গালাগালি করার জন্য। কবির কথায় তাল মিলিয়ে বলতে হয়, 'কুকুরের মত হিংস্রতা নিয়ে শকুনের মত লোভ, মুসলিম নাম বয়ে বেড়ানোটা পরকালে ফেলা টোপ!... নাম ফেলে দাও! ভণ্ডামি ছাড়! বল্ মুসলিম নও!'

যাহোক, কবি মল্লিক কখনো বাম রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তবে বামপন্থী অনেক লেখককে সুপথে আনার জন্য তাদের সাথে তিনি সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন। অনেকের হেদায়েতের জন্য তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের পর মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। যাদের তিনি পছন্দ করতেন তাদের জন্য অকাতরে পকেটের পয়সা খরচ করতেন। কারো কারো বাসায় তিনি বাজার করে নিয়ে যেতেন। এমন একটি ঘটনা– একদিন আমরা একজনের বাসার কাছে পৌঁছে গেছি, রাস্তায় কিছুই পাওয়া গেল না, বাসায় ঢোকার আগে মুদি দোকান থেকে দু'ডজন ডিম কিনে নিলেন। তবে তিনি সব সময় ভণ্ডদের এড়িয়ে চলতেন। ভণ্ডামি ছিল তার দু'চোখের বিষ।

কাঁচকি মাছের ঝোল অতঃপর

সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান বেশি থাকলে প্রায় দিন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান কম থাকলে মাঝে মাঝে মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গ দিতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজেও মল্লিক ভাই ডেকে পাঠাতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে মল্লিক ভাইয়ের পেছনে ছুটতাম। মানে 'জো হুকুম জাহাপনা'! সম্ভবত সাতানব্বই সালের কথা। তারিখটা আজ আর মনে নেই। ঠিক সকাল বেলা মল্লিক ভাইয়ের ফোন পেলাম, তুমি যেখানে, যে অবস্থায় আছো সিটি অফিসে চলে এসো! তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরবো! সেদিন আমাদের অফিসেও অনেক কাজ ছিল, কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না! তার আন্তরিকতাপূর্ণ আহ্বান আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যেত! সব কাজ পেছনে ফেলে সাড়া দিতাম তার ডাকে। দ্রুত একটা রিকসা নিয়ে চলে গেলাম সিটি অফিসে। বললেন, চলো, উত্তরা যাব। আমি যেহেতু শুধুমাত্র ফলোয়ার– অতএব, মল্লিক ভাইকে ফলো করাই আমার একমাত্র কাজ। বাসে যেতে আমাদের প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেল। উত্তরা থানার একটা কর্মী সভায় মল্লিক ভাই আলোচনা শুরু করলেন। দীর্ঘ আলোচনা। তখন আমার মনে হয়েছিল, এটাই হয়তো পৃথিবীর দীর্ঘতম আলোচনা হবে। যাহোক, ঠিক সোয়া একটায় তিনি ক্ষান্ত দিলেন। যোহরের নামায পড়ে বের হলাম। বললেন, চলো পল্টন গিয়ে তোমাকে নিয়ে রাঁধুনী হোটেলে ছোট মাছ দিয়ে ভাত খাবো! পল্টনে পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। গেলাম রাঁধুনী হোটেলে। হোটেলটা তখন সবে যাত্রা শুরু করেছে। খুবই ছিমছাম ও অভিজাত। মল্লিক ভাই ভাত আর কাঁচকি মাছের অর্ডার দিলেন। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ, আমি কাঁচকি মাছ খাই না। আমার ধারণা ছিল বা আমাদের বাসায় প্রচলিত ছিল, কাঁচকি মাছ হচ্ছে ঢাকার ড্রেনের মাছ! তাই আমি ঢাকায় এসে কোন দিনই কাঁচকি মাছ কেনা তো দূরে থাক স্পর্শও করিনি। মল্লিক ভাই খাওয়া শুরু করেছেন কিন্তু আমি হাত উঁচু করে বসে আছি! মুখে কিছু বলতে পারছি না। মল্লিক ভাই কাঁচকি মাছের বাটি ধরে আমার পাতে ঢেলে দিলেন। তবু আমি খাচ্ছি না দেখে মনে হলো মল্লিক ভাই একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, কি হলো, খাও! বললাম, আমি কাঁচকি মাছ খাই না, এ মাছ নাকি ড্রেনে থাকে?

www.pathagar.com

আর যায় কোথায়! হোটেলের মধ্যেই শুরু করে দিলেন, ড্রেনে নয়, তোমার মাথায় থাকে! মনে হলো একশ' ছিয়াশি কিলোমিটার গতির একটা ফুল টসের বল ব্যাটে স্লিপ করে রমন লম্বা'র মতো আমার মাথায় এসে পড়ল! হোটেলের অনেকেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। মল্লিক ভাই চুপ হয়ে গেলেন। একজন সার্ভার বলল, কাঁচকি হচ্ছে নদীর মাছ! আমি কোন কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ গোগ্রাসে কাঁচকি মাছ দিয়ে ভাত গিলতে লাগলাম। যাহোক, সেই থেকে শুরু হলো আমার কাঁচকি মাছ খাওয়া। তারপর থেকে আমি বাসায়ও মাঝে মাঝে কাঁচকি মাছ কিনি। হোটেল থেকে বের হয়ে আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না। হাঁটতে হাঁটতে সিটি অফিসে গেলাম। তারপর সিটি অফিসে মল্লিক ভাইয়ের কাজ সেরে বের হতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল। এর মধ্যে মল্লিক ভাই আমার সাথে কোন কথা বললেন না। আমিও কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

আবুল আসাদ ভাইয়ের সাইমুম সিরিজ নিয়ে লিখতে বললেন

অধিকাংশ সময় মল্লিক ভাই আমাদের কাঁধে বোঝাটা চাপিয়ে দিতেন। আমরা দেখেছি তিনি প্রতিভা খুঁজে খুঁজে বের করতেন এবং একেকজনকে দায়িত্ব দিয়ে কাজ আদায় করে নিতেন। তার চরিত্রের এমন বিরাটত্ব ছিল যে, তার সামনে কেউ না বলতে পারতো না। তিনি আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আবুল আসাদ ভাইয়ের সাইমুম সিরিজের প্রতিটি বই নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা লেখার জন্য। আমি শুধু বলেছিলাম, আমার লেখা কী ভালো হবে? অমনি তিনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, ভালো হবে কি মন্দ হবে সেটা দেখা তোমার দায়িত্ব নয়, তোমার দায়িত্ব লেখার। আমি লিখেছি, মল্লিক ভাই কোন প্রকার কাট-ছাট ছাড়াই ছেপে দিয়েছেন কলমে। মল্লিক ভাই আবুল আসাদ সাহেবকে অসম্ভব রকম শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, আমাদের মধ্যে এত বড় মাপের লেখক খুব কমই জন্মেছে। যারা তাদের লেখার মাধ্যমে সারা জীবন বেঁচে থাকবেন আবুল আসাদ ভাই হচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। না চাইতেই তিনি প্রতিটি লেখার লেখক সম্মাননা পকেটে গুঁজে দিতেন।

কিচেন আর টয়লেট আমার লাগবে না

কিছু দিন আগেও আমি যে গলিতে ভাড়া ছিলাম সে গলিটির নাম সোনালি বাগ। ঢাকা শহরে যে শতাধিক বাগ আছে এটা তার মধ্যে একটি। পীরেরবাগ থেকে শুরু করে পরীবাগ, স্বামীবাগ থেকে শহীদবাগ– সবই আমার নখদর্পণে। স্বামীবাগে স্বামী পাওয়া যাবে তবে ভালো স্বামী পাওয়া দুস্কর। হাল জমানায় শহীদবাগে হর-হামেশায় মানুষ খুন হচ্ছে, তবে তাদের শহীদ বলা যাবে কিনা এ নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। রাজারবাগে রাজা নেই তবে পুলিশ আছে। যে পুলিশরা রাজাকে চালায়। মালিবাগে মালি নেই তবে বাগান বাড়ি নামে একটা জায়গা আছে। এটা সোনালিবাগের সাথেই। হঠাৎ করে বাগ নিয়ে আলোচনা একটু বেমানান বৈকি! মল্লিক ভাই খুব রসিক মানুষ ছিলেন। ঢাকার এই বাগ নিয়ে মল্লিক ভাইয়ের সাথে অনেক মজার গল্প হতো, তাই ঢাকার বাগ নিয়ে এই অবতারণা। সোনালিবাগের সাথে জড়িত মল্লিক ভাইয়ের অনেক স্মৃতি আজ আমাকে বিমোহিত করছে। এখানেই কবি গোলাম মোহাম্মদ আমৃত্যু বাস করেছেন। বিখ্যাত সুরকার সুবোল দাসের বাড়ি এখানেই। একদিন মল্লিক ভাইয়ের জন্য বাসা ভাড়া খুঁজতে যেয়ে অনেক বাসা দেখা হলো, কিন্তু কোন বাসাই পছন্দ হলো না। শেষ পর্যন্ত সুবোল দাসের বাড়িতে টুলেট লাগানো দেখে ওপরে উঠলাম। সুবোল দাসের সাথে বেশ আড্ডা জমে গেল। পাঁচ রুমের বিরাট বাসা শেষমেস ভাড়ার কথা

www.pathagar.com

শুনে মল্লিক ভাই বললেন, দাদা বাসা খুবই পছন্দ হয়েছে, তবে কিচেন আর টয়লেট আমার লাগবে না। বাড়িওয়ালি আমাদের মুখের দিকে থ'মেরে তাকিয়ে আছে! আমরাও মল্লিক ভাইয়ের কথা শুনে হতবাক! আসলে কি বলতে চাচ্ছেন আমরাও মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না! বাড়িওয়ালি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মল্লিক ভাইয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, আমরাও তাকিয়ে আছি। সহসা মল্লিক ভাই বললেন, মানে আমি যা বেতন পাই তা দিয়ে আপনার ঘরভাড়াটা মেটানো সম্ভব! কিন্তু খাওয়ার টাকা কোথায় পাবো? তাই বলছিলাম রান্নাঘর আর টয়লেট আমার লাগবে না! সুবোল দাস, বাড়িওয়ালিসহ সবাই আমরা একসাথে হোঁ হোঁ করে হেসে উঠলাম। সেদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম, মল্লিক ভাইয়ের এই রসিকতার মাঝেও একটা করুণ আর্তনাদ আছে! আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রায়ই বলতেন, ইসলামপন্থীদের একটা মহৎ দোষ আছে, তারা বেঁচে থাকতে কারো মূল্যায়ন করে না। আজও বুঝতে অক্ষম আবদুল মান্নান সৈয়দ স্যার কেন মহৎ-এর সাথে দোষ শব্দ প্রয়োগ করতেন!

এরই নাম প্রেম!

অনেক মহীরূহ-এর সান্নিধ্য আমাকে ধন্য করেছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক ও অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিব তাদের মধ্যে অন্যতম। তাকে সাথে নিয়ে মল্লিক ভাইকে দেখতে কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছি। শেষবার যখন গেলাম দেখলাম মল্লিক ভাই চোখ বুজে শুয়ে আছেন! কবি আফছার নিজাম বলল, সারারাত ঘুমাতে পারেনি তো তাই একটু ঘুমিয়েছেন। এখন কী ডাকা ঠিক হবে? আসলে মল্লিক ভাই চোখ বুজে ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। তালিব সাহেবের কথা শুনেই চোখ মেলে তাকালেন, অস্পষ্ট আওয়াজে সালাম দিলেন। একটু পর আফছার নিজাম ধরে বিছানায় বসিয়ে দিলেন। একটু পানি খেয়ে মল্লিক ভাই আস্তে আস্তে অসুস্থতাজনিত অনেক কথাই বললেন। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না, আবার সবাই ধরে শুইয়ে দিলাম। মল্লিক ভাই আমার হাতটা প্রায় আধা ঘণ্টা তার বুকে চেপে ধরে রাখলেন। বার বার অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কেন যেন শোনা হলো না। মানে 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ!' অতপর আবদুল মান্নান তালিব দু'হাত ওপরে ওঠালেন, আমরাও সবাই তার সাথে হাত তুললাম মহান মালিকের দরবারে। দীর্ঘ দোয়া করলেন আবদুল মান্নান তালিব, আমরা শুধু আমিন আমিন বললাম! মুনাজাত শেষ হলে দেখলাম সবার চোখ অশ্রুসিক্ত। ভাবী আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, একটা কিডনির ব্যবস্থা করে দেন ভাইজান! ইনশআল্লাহ, তাহলে উনি বেঁচেও যেতে পারেন! দেখলাম ভাবীর দু'চোখ অশ্রুধোয়া! হয়তো এরই নাম প্রেম! এরই নাম ভালোবাসা!

আল ফালাহ বিল্ডিং-এর ছাদের ওপর গান রেকর্ডিং

এক সময় গান রেকর্ড করার মতো কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তখনো কোন রেকর্ডিং স্টুডিওর সাথে আমাদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তখন সাধারণ একটা টেপ রেকর্ডারে আল ফালাহ বিল্ডিং-এর ছাদের ওপর গান রেকর্ডিং করা হতো। যখন ঢাকা শহরের সব কোলাহল থেমে যেত তখন শুরু হতো এই রেকর্ডিং কার্যক্রম। এর নেতৃত্ব দিতেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সবাই গোল হয়ে বসে শুরু হতো রিহার্সেল। তারপর রেকর্ডিং। তবে বিপত্তি দেখা দিত ট্রেন চলে আসলে। কারণ আল ফালাহ বিল্ডিংটা একদম ট্রেন

www.pathagar.com

লাইনের ধারে অবস্থিত। গান একদম শেষ পর্যায়ে হঠাৎ ট্রেন এসে গেলে সব বাদ আবার নতুন করে একটা গানের রেকর্ডিং শুরু করতে হতো। এভাবেই অনেক অডিও ক্যাসেট তখন বাজারে ছাড়া হয়েছিল।

টিক টিক টিক টিক যেই ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে

মগবাজার সোনালিবাগে প্রতিদিন সকাল ৯টার সময় একটা অন্ধ ভিক্ষুক গান গাইতে গাইতে চলে যায়, 'সেদিন রোজ হাসরে আল্লাহ আমার, করো না বিচার আল্লাহ! করো না বিচার...।' সারা বাংলাদেশে এ ধরনের হাজার হাজার অখ্যাত শিল্পী আছে যারা নজরুলের গান বিনে পয়সায় ফেরি করে বেড়ায়। পাটুরিয়া ঘাটে ফেরিতে গান গায় ইমারত আলী। প্রায়ই বাড়ি যাওয়ার পথে শুনি, 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, আমি যেন গোরে থেকেও আজান শুনতে পাই'। আমি দেখেছি নজরুল যেভাবে গানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে নিতে পেরেছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিকও এদিক দিয়ে সফল একজন শিল্পী। মল্লিক একইভাবে সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় পৌঁছে গেছেন। খয়ের হুদা গ্রাম, চুয়াডাংগা জেলার জীবন নগর থানার একটা নিভৃত পল্লী। এ গ্রামেরই পুব পাড়ার সফুরা খাতুন। কোন মতে আরবি পড়তে পারেন। সাত বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে স্কুলে আর যাওয়া হয়নি। লেখা পড়া না জানলে কি হবে, ভালো ভালো ছড়া কবিতা গান অনেকই তার মুখস্থ। একটা ঝগড়া মেটাতে যেয়ে উদাহরণ দিলেন কবি মল্লিকের গান। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে সফুরা খাতুন বলছিলেন, দু'দিনের এই দুনিয়ায় এত লাফালাফি করে লাভ কি? গানে বলে না, 'টিক টিক করে যেই ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে, কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয় দিন কাজে?' এটা শুনে আমি তখনই 'আল্লাহু আকবর' বলেছিলাম আমাদের কবি মতিউর রহমান মল্লিক অবশ্যই সফল হয়েছেন। আমার বিশ্বাস তিনি যুগ যুগ ধরে নজরুলের মতো সাধারণ মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

ঈদের খুতবায় মল্লিকের গান

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর ইসলামী গানের জগতে যিনি সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন আমি মনে করি তিনি হচ্ছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। শহর, গ্রাম, গঞ্জে মল্লিকের গান ইথারে ইথারে ভাসছে! প্রতি রমজানের সেহরিতে মধুবাগ-মীরবাগবাসী শোনে মল্লিকের গান- শোনে সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ বললে ভুল হবে শোনে সারা বিশ্ব। কবি মোরশে আলী ভাই বলছিলেন, আপনি মধ্যপ্রাচ্যের পথে-প্রান্তরে মল্লিক ভাইয়ের গান শুনতে পাবেন। আমি সৌদি আরবের জিজানে থাকি, রাস্তায় বের হলেই শুনি কোন এক বাংলাদেশী চালক তার গাড়িতে শুনছেন মল্লিক ভাইয়ের গান। কথাশিল্পী মাহবুবুল হক বলছিলেন, আমি সুদূর কানাডায়ও মল্লিক ভাইয়ের গান বাজতে শুনেছি। এখন তো সেটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মল্লিক ভাইয়ের গান পৌঁছে গেছে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে! এবার কুরবানির ঈদে বাড়ি গিয়ে জাতীয় ঈদগাহের আদলে তৈরি আমাদের গ্রামের বাড়ির ঈদগায় নামাযের খুদবায় শুনলাম মল্লিক ভাইয়ের গান। আমাদের বিশাল গ্রাম। সারা গ্রামের ৭/৮ হাজার লোক একই ঈদগাহে নামায আদায় করেন। মাঝের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব জান মুহাম্মদ দুই ঈদের একটিতে খুতবা পাঠ করেন। তিনিই রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করলেন এভাবে–'বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল!' উপস্থিত হাজার হাজার নামাযী সবাই শুনলেন এই গান,

www.pathagar.com

কিন্তু আমার মনে হয়েছে একমাত্র ইমাম সাহেব ছাড়া কেউ জানে না এটা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বিখ্যাত একটি গান!

বাঘের রাজ্যে ঢুকে গেলেন একা

বাগেরহাটের ছেলে কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বাঘের সঙ্গেই বেচা-কেনা, বাঘের সঙ্গেই লেনাদেনা। বাঘের সঙ্গেই বসবাস। সত্যিই সুন্দরবন সংলগ্ন লোকেদের বাঘের কোন ভয় নেই! এরা বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়ে। বাঘের সঙ্গেই ঘর-সংসার করে। মল্লিক ভাইও তাদেরই একজন। দুরন্ত কিশোর। গান লেখেন, কবিতা লেখেন আর মানুষকে ডাকেন আল্লাহর পথে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার মল্লিক একা ছুটে চলেছেন দূরান্তের কোন এক কিশোর বন্ধুর বাড়িতে, তাকে আলোর পথে আনবেন এই ভরশায়। আল্লাহর পথের সৈনিক কবি মতিউর রহমান মল্লিক বেছে বেছে সেরা ছাত্রটাকেই টার্গেন করেন যদি তাকে আল্লাহর পথে আনা যায়! সফলও হয়েছিলেন তিনি। অনেক বাঘা বাঘা নেতার ছেলে বাবার হুঙ্কার পায়ে দলে কবি মল্লিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলোর পথে ছুটে এসেছিলেন। অনেকেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন।

কবি মল্লিকের ছিল অসীম সাহস। সেবার আমরা একশ' বিশ জনের বিরাট কাফেলা নিয়ে সুন্দরবন সফরে গিয়েছিলাম। মল্লিক ভাই ছিলেন আমাদের রাহ্বার। ছয় হাজার বর্গকিলোমিটারের পৃথিবীর বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বনভূমি হচ্ছে আমাদের এই সুন্দরবন। পৃথীবি খ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানেই থাকে। আমরা কটকা দুবলার চর পার হয়ে বাংলাদেশের শেষপ্রান্ত হিরণ পয়েন্টে গিয়েছিলাম। কটকা ও হিরণ পয়েন্টে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম। কটকা অভয়ারণ্যে একটা লাঠি হাতে নিয়ে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সবার আগে থেকে বিরাট কাফেলার পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কটকার বন রক্ষীরা আমাদের বারবার বলছিলেন এখানে ৭০টার মতো বড় বাঘ আছে। মল্লিক ভাই বলছিলেন, কুচ পরোয়া নেহি! সবাই বলছিলেন, মল্লিক ভাই সংস্কৃতি অঙ্গনের মতো এই সুন্দরবনেও আমাদের রাহ্বার! মল্লিক ভাই ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি জগতের রাহ্বার। তিনিই বাজনা ছাড়া ইসলামী গানকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামী গানের জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

যাহোক, আমরা কটকা থেকে হিরণ পয়েন্টে পৌঁছলাম পরের দিন দুপুরে। খাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা বিরাট কাফেলা নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকলাম ছয় সাত জন অস্ত্রধারী বনরক্ষীসহ। বনরক্ষীরা বারবার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, যদি বাঘ এসে পড়ে কেউ দৌড় মারবেন না, সবাই এক সাথে চেচাবেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, কোন বাঘের আমরা দেখা পাইনি। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল অন্যখানে! সেটা হচ্ছে, কবি মতিউর রহমান মল্লিককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সবাই উদ্বিগ্ন কোথায় গেল! কোথায় গেল! শেষ-মেশ জানা গেল যে, মল্লিক ভাই একা লাঠি হাতে করে গভীর জঙ্গলে মানে বাঘের রাজ্যে ঢুকে পড়েছেন! আমরা সুন্দরবনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত মানে যেখানে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া দেয়া আছে সে পর্যন্ত যেয়ে আবার ব্যাক করলাম। তখনো মল্লিক ভাইয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। আমরা বন বিভাগের রেস্ট হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সহসা দেখা গেল মল্লিক ভাই একটা লাঠি হাতে, কোমরে চাদর পেচিয়ে গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

রসের ভাণ্ডার ছিলেন তিনি

মল্লিক ভাইয়ের কাছ থেকে কৌতুক আর মজার মজার গল্প শুনতে শুনতে আমাদের অবসর সময়টা আনন্দের মাঝে পার হয়ে যেত। একদিন কথায় কথায় মল্লিক ভাই বলছিলেন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ স. খুবই রসিক লোক ছিলেন। এক দিনের ঘটনা জামাই শ্বশুর মানে নবী স. ও আলী রা. এক সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। নবী স. খেজুর খেয়ে আটিগুলো আলী রা. যেখানে আটি রাখছিলেন সেখানে রেখে দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে রসিকতা করে নবী স. বললেন, আলী তোমার দেখছি খুব খিদে পেয়েছে! তোমার পাশে দেখছো তো অনেক খেজুরের আটি! জামাইও ছাড়ার পাত্র নয়। নবী স.-কে লক্ষ্য করে আলী রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়ে দেখছি আপনার অনেক বেশি খিদে পেয়েছে! কারণ আমি তো আটি ফেলে দিচ্ছি কিন্তু আপনি তো আটি সমেত খেজুর খেয়ে ফেলছেন। এ কথার পর জামাই শ্বশুর হো হো করে হেসে উঠলেন।

মল্লিক ভাই বলছিলেন, আমাদের এলাকারই একটা ঘটনা। আগে আমাদের এলাকায় লঞ্চ খুব দেরি করে আসতো মানে তিন চার ঘণ্টা পর পর। আমাদের গাঁয়ের এক লোক লঞ্চ ঘাটে এসে দেখে লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। লোকটি বুদ্ধি এঁটে চিৎকার শুরু করলো, এই যে ভাই লঞ্চ রাখেন, একশ' লোক আছে! যথারীতি ড্রাইভার লঞ্চ কূলে ভেড়ালেন। লোকটি লঞ্চে উঠে চিল্লাচিল্লি, লাফালাফি শুরু করে দিলেন। সবাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। লঞ্চের কন্ডাকটর বললেন, কোথায় আপনার একশ' লোক? লোকটি বলল, আরে ভাই লঞ্চ ছাড়েন, আমি একাই একশ'! এ ধরনের কত শত গল্প যে মল্লিক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই! সব কিছু আজ শুধুই স্মৃতি।

মল্লিক ভাই কবি আল মাহমুদের সাথে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন

আমি মল্লিক ভাইয়ের সাথে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে কাজ করেছি। পাঁচ বছর এক সাথে চাকরিও করেছি। এমন আল্লাহ ওয়ালা লোক আমরা খুব কমই পেয়েছি। যাহোক, কবি আল মাহমুদকে আমি আগে থেকে জানতাম। পাঠ্য বইয়ে তার লেখা ছোটকালেই পড়েছি। কিন্তু ঢাকায় আসার আগে চোখে দেখিনি তাকে। আমি তখন সবেমাত্র বিআইসিতে জয়েন করেছি। এর ক'দিন পরেই ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৬ প্রথম ঢাকা বই মেলা ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে শুরু হলো। উদ্বোধনের দিন মেহমানরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন। অধিকাংশই আমার অচেনা। সহসা পাতলা ফিনফিনে ছোটখাটো একজন লোক মল্লিক ভাইয়ের সাথে আমাদের স্টলে এলেন। বিভিন্ন বই-পত্র দেখতে দেখতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি হে লেখালেখি করো? আমি চুপ করে ছিলাম। আল মাহমুদ আমাকে বলতে লাগলেন, মিয়া! লেখালেখি না করলে এখানে চাকরি করা হবে না। কি লেখ কবিতা গল্প অন্য কিছু? ইত্যাদি নানান কথা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন। মল্লিক ভাই বললেন, আল মাহমুদ ভাই! চোখ দেখেই বুঝেছি কাজ হবে, ইনশাআল্লাহ! এরপর মল্লিক ভাই বললেন, ইনি হচ্ছেন কবি আল মাহমুদ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কবি। পরে আমার পরিচয় মল্লিক ভাই-ই দিয়েছিলেন। সেই থেকে আল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্কের কোন ঘাটতি হয়নি। দুনিয়াতে যে দু'দশ জন তার বিশ্বাসভাজন আমি তার মধ্যে অন্যতম। নিতান্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে ক'দিন আগেও রাতে আমার সাথে বেরিয়ে পড়লেন একা!

www.pathagar.com

লিখে প্রথম টাকা পেলাম মল্লিক ভাইয়ের হাত থেকে

লিখে টাকা পাওয়া যায় তা জানতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি কবিতা গান লিখতাম। পঁচিশটি গান লিখে খুলনা বেতারে পাঠিয়েছিলাম অল্প বয়সে। তখন কয়েকটা গান গীত হয়েছিল। আমার আব্বা জানতে পেরে বলেছিলেন, যারা লেখালেখি করে তাদের ভাত হয় না। কবি নজরুলকে দেখনি? গ্রামে থাকতেই দৈনিক ইত্তেফাক ও চিত্র বাংলায় আমার লেখা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আমি কখনো টাকা পাইনি। মল্লিক ভাই আমাকে বেশ কিছু বই দিয়ে বলেছিলেন, এগুলোর আলোচনা লিখে আনতে। আমি নিয়মিত লিখে মল্লিক ভাইয়ের কাছে দিতাম। ছাপা হলেই প্রতিটি লেখার জন্যে মল্লিক ভাই আমাকে দেড়শ' টাকা করে দিতেন। যাহোক, অন্যের বই সম্পাদনার পাহাড় সমান কাজ আমার মাথার ওপর সব সময় চেপে থাকে। তাই নিজের লেখালেখিটা ক্রমেই চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমাকে গল্প লেখার জন্যে মল্লিক ভাই জোর তাকিদ দিতেন। লিখছি না দেখে মাঝে মাঝে বকাবকি করতেন। ছাপা গল্পগুলো নিয়ে একটা বই বের করার জন্য খুব চাপাচাপি করছিলেন। তবে আমি রাখতে পারিনি মল্লিক ভাইয়ের কথা।

শোকর গোজার

আমি প্রথম ১৯৮৩ সালে ঢাকায় এসে অনুভব করেছিলাম সত্যিই ঢাকা হৃদয়হীনদের শহর। আসলেই তখন আমার কাছে মনে হতো এটা একটা ইট পাথরের অরণ্য। তখন এই লাল মাটির ঢাকা শহরকে আমার কাছে পাথরের চেয়েও কঠিন মনে হতো। একটা কাজের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, না খেয়ে থেকেছি দিনের পর দিন। কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় না হলে হয়তো আমার ঢাকায় থাকাই হতো না। আল্লাহ এই মহৎ প্রাণের মানুষটিকে সর্বোত্তম জাজাহ দান করুন। তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন! আমিন!

www.pathagar.com

কবির ভাবনায় ঋতুর পালাবদল

মাফরুহা ফেরদৌস

প্রকৃতির বন্দনা কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে তিনি যেমন প্রকৃতি প্রেমিক হিসাবে তাঁর রং রূপের বর্ণনায় মশগুল অন্যদিকে তেমনি মানবজীবনে প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণেও তৎপর। প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বর্ণিল রূপ ধারণ করেছে। আবার মানবজীবনে তাঁর গুরুত্বের কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি বন্দনার পাশাপাশি মানবতার কথাও আছে। আর এ দুটির মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছে তাঁর অসাধারণ কাব্যশৈলীর ব্যবহারে। বিভিন্ন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তাঁর কবিতার অন্যতম উপাদান। এমনি কবির কয়েকটি কবিতা হলো বৃষ্টিরা, বসন্ত বাও, শীতের লিমেরিক ও হেমন্ত দিন। ঋতুর পালাবদল প্রকৃতি ও মানবজীবনে কি প্রভাব ফেলে এটাই এ কবিতাগুলোর মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

"বৃষ্টিরা" কবিতাটির কবির উপমা ও রূপকের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহার নজর কাড়ার মতো। এখানে তিনি Concrete I abstract দু'ধরনের উপমা ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, তিনি বৃষ্টির ধারাকে তুলনা করেছেন ঐকতানের সাথে। ঐকতান যেমন আমাদের মাঝে পূত-পবিত্র শান্তির বার্তা বহন করে আনে, বৃষ্টির ধারাও তাই। পবিত্রতার সাথে শুভ্রতার এক অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই এর পরবর্তী উপমা হিসাবে এসেছে সাদা কাশফুল। বৃষ্টির ধারা কবির কাছে যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়া কাশফুলের মতো। এসব Concrete উপমার পাশাপাশি abstract উপমার ব্যবহারও এ কবিতায় উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টি কখনও কখনও কবির কাছে সুখ স্বপ্নের মতো। সুখ স্বপ্ন যেমন আমাদের মাঝে প্রশান্তি এনে দেয় বৃষ্টিও তেমনি আনন্দের বার্তা বয়ে আনে।

বৃষ্টি যে কেবল আনন্দের সাথী তা নয়। কখনও কখনও বৃষ্টি আমাদের বেদনারও সাক্ষী। বৃষ্টির নিয়ত ধারা কখনও প্রেমের প্রথম কান্নার মতো বেদনাদায়ক আবার কখনও ভালোবাসার প্রথম উচ্চারিত শব্দাবলীর মতো আনন্দময় :

"বৃক্ষের উপর প্রেমের প্রথম কান্নারা
ঝরে ঝরে পড়ে
দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে যায়
আনন্দের প্রথম উচ্চারণের মতো
ভালোবাসার শব্দাবলী"

গাছের পাতায় বৃষ্টির ছন্দময় অনুরণন মানব মনে আনন্দের দোলা দিয়ে যায়। কবির বর্ণনায় নবদম্পতির প্রথম মিলন যেমন অনিমেষ শিহরণ জাগায়, গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শ

www.pathagar.com

সেই অনন্ত ভালোলাগার জন্ম দেয়। বৃষ্টির ফোঁটার পরশে গাছের পাতায় উঠানামার ছন্দময় গতিকে মানবজীবনের উত্থান পতনের সাথে তুলনা করেছেন কবি।

ঋতুর পালাবদলে বর্ষার পরে আসে শরৎ হেমন্ত। "হেমন্ত দিন" কবিতায় হেমন্ত ঋতুর রূপের বর্ণনা আছে। এখানে কবি প্রাচুর্যের কথা বলেছেন, পূর্ণতার কথা বলেছেন। এ পূর্ণতা শুধু প্রকৃতির পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা প্রলম্বিত হয়েছে মানবজীবনে।

প্রথম, কবি হেমন্ত প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে নীল আকাশকে পটভূমি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। ঠিক যেন শিল্পীর হাতের ক্যানভাস। শিল্পী যেমন পরম মমতায় ও যত্নে ক্যানভাসের উপর রং তুলির আঁচড় কাটেন, কবিও তেমনি আকাশের নীল ক্যানভাসে হেমন্তের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা হেমন্তের অতি পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু কবির চিত্রকল্পের ব্যবহারে তা অপরূপ শোভা ধারণ করেছে।

কাশফুলের বর্ণনা ছাড়া হেমন্তের বর্ণনা যেন পূর্ণতা পায় না। হেমন্তের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে সাদা বকের উড্ডয়ন এক অপরূপ চিত্রকল্পের অবতারণা করে।

"কাশবনেরা বকের পাখায় উড়াল দিলো
এবং বকের ডানায় ডানায়
মিষ্টি রোদের মধ্য দিয়ে
হেমন্ত দিন।"

এছাড়াও আছে শিউলি ফুলের কথা যার মাদকতা কবির মনে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। কবির মন হয়ে ওঠে গভীর থেকে গভীরতর ।

প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি কবি হেমন্তে মানবজীবনের প্রাচুর্যের কথা বলেছেন। নতুন ধান, খেজুর, রসের পিঠা, গল্পের আসর, ইষ্টি কুটুম-এ সবই কবির কবিতার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে। গ্রাম বাংলার চিরন্তন হেমন্ত প্রকৃতি আলোচ্য কবিতায় অত্যন্ত বাঙ্ময় হয়ে ধরা দিয়েছে।

'শীতের লিমেরিক' কবিতায় না পাওয়ার কথা আছে বৈষম্যের কথা আছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানের কথা আছে। শীত যেন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে অন্যদিকে 'হেমন্ত দিন' কবিতায় সেই বৈষম্য পরিহারের প্রসঙ্গ এসেছে। হেমন্ত শুধু ধনীদের প্রাচুর্যের জন্য নয়। হেমন্ত সহজ সরল চাষীর মুখের হাসি ফোটানোর জন্যও বটে।

'শীতের লিমেরিক' কবিতায় কবি শীতের আগমন বর্ণনা করতে গিয়ে চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন :

"সাদা মেঘগুলো কোমল কুয়াশা হয়ে
নামলো যখন ধোঁয়াটে চাদর লয়ে
তখন আসলো শীত"

তীব্র শীতের অনুভূতিকে কবি তুলনা করেছেন সূচ ফোটানোর যন্ত্রণার সাথে প্রকৃতির পালাবদলের খেলায় অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে পত্রশূন্য রিক্ত নিঃস্ব গাছের কথা। প্রকৃতির এই কৃপণতার প্রভাব পড়ে মানবমনেও। প্রকৃতির নিঃস্বতার সাথে কবি তুলনা করেছেন মানুষের না পাওয়ার বেদনা–

www.pathagar.com

হলুদ পাতারা ঝরে যায় ঝরে যায়
রুগ্ন শাখারা মরে যায় মরে যায়
কোনো কোনো নীড় একা
মগডালে দেয় দেখা
বেদনায় মত ভরে যায় ভরে যায়।

তাই বলে কবি শীতের প্রাপ্তির প্রতি মোটেও উদাসীন নন। প্রাপ্তির কথা বলতে গিয়ে কবি যথার্থই উল্লেখ করেছেন আগুন পোহানোর কথা, পিঠা পার্বনের কথা বা খেজুর রসের কথা। কিন্তু এসব প্রাপ্তির আনন্দ যে কেবল বিত্তবানদের জন্য তা কবির দৃষ্টির অন্তরালে নয়। তাই মানবতাবাদী কবি স্মরণ করেন সেসব নিঃস্ব অসহায়দের কথা যাদের জন্য শীত কেবলই বেদনাময়। কবির ভাষায় :

কিন্তু এলো কি গরীবের কাছে হায়!
এমন কিছুই-শৈত্য ঠেকানো যায়?
জীবন বাঁচানো যায়
পরাণ মাতানো যায়
পেলো কি সহায়? শীতার্ত অসহায়!

ঋতু পরিক্রমায় সবশেষে আগমন বসন্তের। কবি 'বসন্ত বাও' কবিতাটি ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা বহন করে। বসন্ত বাতাসের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে কবি চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন। বসন্ত প্রকৃতিতে নবজাগরণ ঘটায়। নতুন জীবনের কথা বলে:

বসন্ত বাও এলো বনে বনে–
জীবনের জয় এলো এলো জনে জনে।

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাও বসন্তের সাথে তুলনীয়। বসন্ত বাতাস যেনো অন্তরে নতুন আশার দোলা দিয়ে যায়। বসন্ত তাই জীবনে সুন্দরের সূচনা করে।

বসন্তে প্রকৃতি নতুন সাজে সজ্জিত হয়। গাছে গাছে স্থলে স্থলে নতুন পাতা ও ফুলের সমারোহ মানুষকে নতুন আশায় উজ্জীবিত করে। পুরনো দুঃখ বেদনা ভুলে নতুনকে বরণ করে নেবার প্রত্যাশায় বুক বাঁধে মানুষ। চনমনে বাতাস মানুষকে নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা দেয়।

পরিশেষে বলা যায় কবির কবিতায় প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হয়ে মিশে আছে। মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। একে বিচ্ছিন্নভাবে ভাববার কোন অবকাশ নেই। কবির বিশেষত্ব এই যে তিনি এ দুটিকে একে অন্যের প্রতিফলন হিসেবে দেখিয়েছেন তার অসাধারণ কাব্যশৈলীর মাধ্যমে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

নিষণ্ন নীড়ে বিষণ্ন পাখি

মনসুর আজিজ

দুর্দিনে মানুষের নিয়রে দাঁড়াও
মহাবৃক্ষের মতো দুহাত বাড়াও
দাও ছায়া, দাও মর্মর
বর্তিত- বর্ফান- সাক্ষাৎ দাও।

তোমার নিয়রে দাঁড়াবার কেউ নেই। তোমার ডাগর চোখ দেখছে না সজল আঁখি। প্রিয় কবিতার শব্দ শুনে সচকিত হয় না কান। সমুদ্রের তিয়াশা বুকে করে ঠোঁট দুটো নড়ে না পানির গেলাসে। নিষণ্ন নীড়ে বিষণ্ন পাখি। রমজান শুরু হলো। নাম না জানা হাজার মুয়াজ্জিনে মসজিদে গাইছে তোমার গান। প্রথম রোজার প্রথম সেহ্‌রী। ঘুম জাগানিয়া গানে বেসুরা কণ্ঠে প্রাণের আহ্বান শুনিয়ে যাচ্ছে তারা। টিভি চ্যানেলে ভেসে আসে নিপাট সঙ্গীতের মূর্ছনা। বাংলা গানের দরদিয়া পাখি। চোখ খোল। বুজে আসা চোখের পাতায় এখনও অনেক দৃশ্য ধরা বাকি। হৃদয়ের সেলুলয়েডে অজানা অনেক ছবি তোলা আছে জানি। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ অনেক তৃষ্ণা নিয়ে বসে আছে। সোনালি ধানের চারার মতো আন্দোলিত হও আরো একবার। নিষণ্ন নীড়ে অতিথি অনেক প্রতীক্ষায় আছে ধ্যানী মাছরাঙার মতো। দুটি চোখ না পারো, বাম চোখ খোল অন্তত। দেখবে না!

শোতাল, কাঁটাখালি, বাগদিয়া, লাউপালা
এবং ঠিক বাম হাতে মরিচের ক্ষেত, মুলোর ভুঁই, আলু-কপির খামার।
এবং ক্রমাগত ফসলের জমি।

বামচোখ খুলতে কষ্ট হলে ডান চোখ খোল অন্তত। তোমার চোখ শীতল করা দৃশ্যরা প্রতীক্ষায় আছে এখনো। যেখানে কেটেছে তোমার শৈশব কৈশোর। কবিতার বীজতলা। ক্ষুদে কবির পথচলা–

আমার ডান চোখে কাঁঠাল তলা, পাইকপাড়া, কোমরপুর, মসিদপুর
এবং আমার ঠিক ডান হাতে লিচুর নিষ্ক, কাঁঠালের নিষ্কাশ, বাতাবির বিক্ষেপ
এবং পাতাবাহারের অসংখ্য প্রজাপতি

চিত্রল প্রজাপতি গান গেয়ে নেচে যায় তোমার চারপাশে। তোমার ঘুম ভাঙাতে চায়। একটু হাত বাড়াও। তুমিতো নিজেই ছিলে চিত্রল প্রজাপতি। ওই দেখো-

যায় উড়ে কবিতার সিম্বল
যায় উড়ে প্রজাপতি চিত্রল।

www.pathagar.com

কত চিত্রল প্রজাপতি নিয়রে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এল। অভিমান করে আর কত ঘুমাবে তুমি। দল বেঁধে ছেলেরা গাইছে। মল্লিকগীতি। বাংলা ভাষার এক স্বতন্ত্র সঙ্গীতধারার জনক তুমি। চেয়ে দেখো তোমার প্রবর্তিত সঙ্গীত ভুবনের অসংখ্য সহযাত্রী জেগে আছে তোমার চারপাশে। বুনোরাত দুহাতে ঠেলে একবার উঠে দাঁড়াও।

হে ঘুমন্ত মানুষ ওঠো, জাগো, দাঁড়াও
তারপর সমুখে তাকাও...

তোমার গড়ে তোলা অসংখ্য শিল্পীগোষ্ঠী গানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন বড় দু:সময় বাংলাদেশের। আরো অনেক গান লেখা বাকি। তোমার যৌবন ভরা গানে তারুণ্য নেচে উঠবে অবিরত। ঘুমন্ত তন্ত্রীতে বাজবে সুরের ঝংকার। তোমার তবুও জাগার ইচ্ছে নেই বুঝি! তাহলে তোমার কথাই সত্যি–

'যেমন এক অথৈ তন্দ্রার মধ্যে/ ওঠা নামা করে জীবনের পেন্ডুলাম।' এতো কষ্ট পাবে বলে কি লিখেছিলে-

'নাচের আঁড়ালে কাঁদে গোঙানির শব্দ অধীর/ যেন পাখির ওড়াল প্রচ্ছদে স্পষ্ট/ তো অস্পষ্ট ডানার কষ্ট।

সে কষ্টের ভার আমাদের দাও কিছু। আমরা কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছুটা নম্রতা আর অস্পষ্ট ডানার কষ্ট বয়ে বেড়াই। প্রতিদিন স্টেশনের যাত্রীর মতো হাসপাতালের বাড়ান্দায় ভিড় করে চেনা-অচেনা অনুরক্তের দল। তোমাকে দেখার তৃষ্ণা দুচোখে। অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন জানতে চায় তোমার অবস্থা। মল্লিক ভাই কেমন আছেন। আমরা কিছুই বলতে পারি না। শুধু বলি তুমি অভিমান করে ঘুমিয়ে আছো। নাটকের শেষদৃশ্য মঞ্চায়নের এখনও সময় আসেনি মল্লিক ভাই। আরো বেশকটি দৃশ্য এখনো বাকি আছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছো তুমি। সারা দেশে মহড়া হবে নাটকের। তোমার গড়ে তোলা নাট্যমঞ্চ প্রতীক্ষায় আছে। তুমি তো ভুলো মানুষ। ওঠো। সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অসমাপ্ত নাটকের সংলাপগুলো নির্মাণ করি। এত অভিমান কেন কবি! আরেকবার গাও অন্তত অনবরত বৃক্ষের গান। আবর্তিত তৃণলতার মতো কোথায় ভেসে চলেছো তুমি।

হৃদয় আমার বাকহীন হয়ে আছে
অশ্রুও নেই দুচোখের ধারে কাছে,
বাঁচবার নেশা ছড়ায় না কোন রঙ,
ঘর সংসার শূন্য সব বরং!

তবে কি এই শূন্যতা বুকে ধরে নাটকের মঞ্চ থেকে তোমার প্রস্থান। এই অসমাপ্ত পান্ডুলিপি কার কাছে রেখে গেলে। শক্তি সাহসে পুণ্য হৃদয় তো নেই বাংলাদেশে। ভীরু মানুষের দল তো বাড়ছে বাঁশঝাড়ের মতো। কচুরি পানার মতো বিস্তার ঘটছে মতানৈক্যের। বিভেদের দেয়াল সুউচ্চ হচ্ছে ক্রমশ। সাহসী নাবিক নেই। তোমার নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে কতো আর বাড়বে সাহস। নিষণ্ন নীড়ে বিষণ্ন পাখি আবার একবার চোখ মেলে তাকাও চিত্রল প্রজাপতি হয়ে।

লেখক : ছড়াকার, কবি ও প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

নিজের জন্য মল্লিক ভাই করলো না তো কিছু

আবু আফরা

গতকাল একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম। আমাকে একটা দরস দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, দাবি ছিল আমি যেন তাদের একটা লিখিত দারস পেশ করি, যাতে করে ওটা একটা হ্যান্ড আউট হিসেবে ভাইদের হাতে দেয়া যায়। মাসজিদের গেইট দিয়ে ঢুকে কেবল লিফটের সুইচে হাত দেব, অমনি হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের মল্লিক ভাইয়ের কথা। কেন মনে পড়ল তা আমি জানি না। আমি রেডি করা দারস বাদ দিয়ে তার নিজের প্রতিদিনের একটা একান্ত দোয়া নিয়ে দারস দিলাম। কথা আমার খুব বলা হয়নি, কারণ বেশি বেশি বেঁধে গিয়েছিল। মল্লিক ভাইয়ের কথা আমি বেশি দূরে কখনোই নিতে পারি না। কারণ তাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই কি যেন এক ভাবের আবেশে হারিয়ে যাই আমি।

তার 'নিজের জন্য করলি নাতো কিছু, আল্লাহ জানেন ঘুরিস কাদের পিছু' গানটা নাকি তারই জীবনের ঘটনা, আর সংগীতে উল্লেখ করা সেই মহিয়সী মা নাকি তারই মা। দারুল আরাবিয়ায় একদিন চেচনিয়ার উপর একটা ফিচার লেখা নিয়ে ব্যস্ত। লাঞ্চের টাইমও হয়ে গেছে। মল্লিক ভাই হাতে একটা ঠোঙা নিয়ে ঢুকলেন আমাদের রুমে। বসলেন ঠিক আমার সামনে। বললেন সালাম, পানি নিয়ে এস কিছু খেয়ে নিই। আমি পানি নিয়ে এসে বল্লাম। খেয়ে নেন ভাই। উনি দু'টো সিংগাড়া এনেছেন। বললেন, নাও, তুমি একটা খাও আর আমি একটা। বল্লাম, দুপুরে খাওয়া কি এটাই। উনার খুব সরল হাসিটা উপহার দিয়ে একটা সিঙাড়া নিজে হাতে নিয়ে, আরেকটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে খাওয়া শুরু করলেন।

বলতে থাকলেন, আরে শোন, আমাদের বিয়েটা কিভাবে হল শোন। আমি তোমার ভাবীকে যেদিন বিয়ের পাত্রী হিসেবে দেখতে গেলাম এবং পছন্দ করে ফেললাম, তাকে একটা অপশান দিয়ে এসেছিলাম। ওকে বলেছিলাম, আমার তো পছন্দের পালা শেষ। এখন তোমার পছন্দের পালা। আমি যা তাতো দেখছই। অর্থ বিত্ত বলতে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। আমি যা বেতন পাই তা বাসা ভাড়া দিয়ে, সকালে একটা বা দুইটা রুটি আরেকটু ভাজি, দুপুরে সর্বোচ্চ আলু ভর্তা আর ডাল দিয়ে কিছু ভাত, আর রাতে এক প্লেট ভাতের সাথে এক রকম ব্যঞ্জন আর খুব পাতলা ডাল দিয়ে খাবার সংস্থান করার পর মাস শেষে দেখি আল্লাহর কাছে হিসাব দেবার মতো তেমন কোন অর্থ আমার কাছে অবশিষ্ট থাকে না। এখন তুমি আমার জীবনে এলে, আমি যেখানে থাকি, আর আমি যা খাই, সেইগুলোতে আমি একদম সমান শেয়ার করব। যদি ভাল মনে করে আমাকে পছন্দ হয়, মুরুব্বিদের জানায়ে দিও। আর না হলে আমার কোন দুঃখ নেই। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বল্লাম, ভাবী রাযি হয়ে গেলেন? ভাবার জন্য সময় চাননি? বল্লেন : না, তিনি রাযি হয়ে গেলেন। জানি না মল্লিক ভাই চলে যাওয়ার পর পরিবারটা চলে কি করে? এখনও কি তারা আগের মেন্যুতে খান? নাকি কিছু খরচের বাজেট কমিয়ে ফেলেছেন তারা?

www.pathagar.com

আমার বন্ধু আব্দুর রহমান মাদানি আর আমি আলফালাহ বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়ানো। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ঠিক দুদিন আগে। দেখলাম উনি প্রীতি প্রকাশন থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমরাও এগিয়ে গেলাম। বললেন : শুনলাম মদীনায় যাচ্ছ? দুইজনেই হাঁ বল্লাম। ডিপার্টমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করলে দুজনেই বল্লাম: ভাষা ও সাহিত্য। উনি খুব খুশি হলেন। অনেকগুলো কথা বললেন। এরপর দেখলাম হঠাৎ করে তিনি কেন জানি বেশ আবেগময় হয়ে গেলেন। এখন এই গভীর রাতে স্পষ্টতই আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সেদিনকার আবেগময় মল্লিক ভাইকে। উনি বললেন : "ঠিক করেছ। সাহিত্য সংস্কৃতির আমরা কিছুই করতে পারলাম না, ইসলামের দুশমনদের সামনে সমানে সমান দাঁড়াবার মতো কোন ব্যক্তি বানাতে পারলাম না, আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি। তোমরা টাকার মোহে পাস করে যেন ঐ দেশে থেকে যেও না। ফিরে আসলে তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমি ইসলামি সাহিত্যের বিরাট একটা প্রজেক্ট শুরু করব"। দেশে ফিরে আমরা গিয়েছিলাম কিন্তু তার প্রজেক্টে কাজ করতে পারিনি। কারণ 'নিজের জন্য করলি না যে কিছু'-এর মতো অত ঈমানের জোর আমরা যে অর্জন করতে শিখিনি কখনো।

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় এক লীডারশিপ প্রোগ্রামে উনাকে আমরা একবার নিয়ে গিয়েছিলাম। কক্সবাজারের সৈকতে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ছিল ঈমানি যিন্দেগির জন্য এক অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো এক ঘটনা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মেধাবিদের ওখানে পেয়ে অনেক নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। অনেক গোপন কথা সেদিন তিনি অকপটে বলেছিলেন; অনেক আশার কথা তিনি সেদিন আমাদেরকের শুনিয়েছিলেন; নানান বেদনার ডালি তিনি আমাদের কাছে মেলে ধরেছিলেন; আর স্বপ্নীল এক রাঙা তোরণের হাতছানিও সেদিন তার কথায় আমরা দেখেছিলাম। নির্ধারিত সময়েরও অনেক বেশি সময় ধরে তিনি সেদিন কথা বলেছিলেন।

গভীর রাতে সমুদ্র সৈকতে তার কাছে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল : মল্লিক ভাই, এত বেদনার পাহাড় নিয়ে আপনি ইসলামি আন্দোলনে টিকে আছেন কি করে? তিনি খুব শান্ত, মিহি, কাব্যিক কিংবা গায়কী সুরে বলেছিলেনঃ রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আ'উনিন, অজ'আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা" এই দোয়াটা, কুরআনের এই দোয়াটা আমাকে এই জান্নাতি পথে টিকিয়ে রেখেছে। "আল্লাহ তুমি আমার স্ত্রী আর সন্তানদেরকে আমার চোখের মনি বানিয়ে দাও, আর আমাদেরকে বানিয়ে দাও মুত্তাকীদের ইমাম"। বিশ্বাস কর, আমি 'সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে উপকণ্ঠে' যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি আমাকে যারা ইমাম মানে তারা মুত্তাকি কিনা। যখন দেখলাম আমি শয়তানদের জন্য এক জ্বলন্ত দাবানল। বুঝলাম আমি মুসলিম সাহিত্যিক হওয়ার কারণে ইসলাম বিরোধীদের কাছে খুবই হীন আর তুচ্ছ। দেখলাম আমাকে যারা মনে প্রাণে দায়িত্বশীল হিসাবে মানে তারা আসল অর্থেই মুত্তাকী, তখন বুঝলাম আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। বুঝে নিই এই আন্দোলনে আমাকে টিকে থাকতে হবেই।

একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকেনা, বসে থাকেনা
যতই আসুক বাঁধা, যতই আসুক বিপদ, ভেঙে পড়েনা
অর্থ বিত্ত নাইবা থাকল তার
নাই বা থাকল সাজানো সম্ভার
তবুও সে হয়না হতাশ, তবুও সে হয়না হতাশ মুষড়ে পড়েনা।

www.pathagar.com

সবার বন্ধু কবি মতিউর রহমান মল্লিক

উম্মে আরজুম

বন্ধুরা, কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কথা তোমাদের অবশ্যই মনে আছে। মনে থাকবে না কেন? তিনিতো তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের কতো ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন একজন হাস্যরসিক। তার মন ছিলো নরম গাল্লিক মন। শিশুমনের অধিকারী এই কবি শিশুদের নির্মল জগতে আকর্ষণ করেছেন। তিনি কখনো নির্মল আনন্দ বিতরণ করেছেন, কখনো বা নীতি উপদেশপূর্ণ ভালো ভালো কথা গীতিকাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে তৃপ্ত করেছেন। যেমন ধরো-

'খুব সকালে উঠবো না যে
জাগলো না ঘুম থেকে,
কেউ দিওনা তার কপোলে
একটিও চুম এঁকে।
মাজলো না দাঁত অলসতায়
মুখ ধুলো না কোন কথায়
লজ্জা দিও সবাই তাকে
আস্ত হুতুম ডেকে।'

অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাসাহিত্যের একজন অন্যতম গীতিকার। তার কবিতায়, গানে রয়েছে ছন্দ, শিল্প, সুষমা, ভাবের সুঠাম বিন্যাস আর নিখুঁত কারুকাজ। তার রচিত প্রতিটি লেখায় ধ্বনিত হয় একটি ম্যাসেজ যা বড়মাপের একজন কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক তার লেখার মাধ্যমে তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। তিনি নতুন নতুন শব্দ ও ভাষার ঝংকারে রস-রচনা লিখেছেন অনেক। মন ও মেজাজে চঞ্চল এই লেখক সমাজ জাতির জন্য মূলত লেখনী ধারণ করলেও তার শিশুতোষ রচনা স্পন্দিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে তিনি ছিলেন আলোর অভিসারী, রঙিন সকাল প্রত্যাশী মানবতাবাদী কবি। যেমন ধরো-

'ভালো নয় বাড়বাড়ি
আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি
মারামারি করাটা,
ভালো নয় চড়াচড়ি

www.pathagar.com

পড়াপড়ি চোরাচুরি
ছোরাছুরি ধরাটা।'

এই কবি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন জানো? কবি মতিউর রহমান মল্লিক ১৯৫৬ সালের ১ মার্চ বাগেরহাট জেলার রায়পাড়ার বারুইপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী কায়েম উদ্দিন মল্লিক আর মা আছিয়া খাতুন।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক গ্রামেই লালিত পালিত হয়েছেন। এ কারণে গ্রাম সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি তাকে মুগ্ধ কবি আত্মার অধিকারী করেছে। বাংলার প্রাকৃতিকরূপ, গাঁয়ের সরল মানুষের প্রেম-প্রীতি, ঝগড়া, বিসংবাদ, আনন্দ-বিলাপ সবকিছুকে তিনি মমতার দৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের চক্ষুষমান করেন। ফলে তিনি ছোটদের যেমন প্রিয় কবি তেমনি বড়দেরও প্রিয় কবি।

এই বড় মানুষটি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। ২০১০ সালের ১২ আগস্ট তিনি আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি তার গানে কি বলেছেন জানো?

'পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়'...

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
চারিত্রিক মাধুর্যের এক অপূর্ব কাব্য

খান শরীফুজ্জামান সোহেল

কালের যাত্রায় এগিয়ে চলে মহাকাল। কালের ক্যানভাসে চিন্তাপ্রসূত শৈল্পিক স্বার রেখে যান মহামানব। জানি না কতুটুকু নাম ছড়ালে মানুষ মহামানব হয়। তবে আমাদের আশে পাশে অনেক মানুষ আছেন যারা প্রচার বিমুখ। বর্তমান সেক্যুলার স্রোত ধারার প্রতিকুলে চলা কোনো কোনো মানব সত্যের ও অনিন্দ সুন্দরের ব্রত করে গেছেন আমৃত্যু। কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন তেমনই একজন।

আমি তাকে "চাচা' ডাকতাম। এটা আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগার ডাক ছিল। কিন্তু এলাকার বা দূরসম্পর্কে মামাবাড়ির দিক দিয়ে তিনি আমার মামা হতেন। যেহেতু, তিনি একজন আধুনিক কালের কবি ছিলেন, তবু তার বেশ-ভুসা ও চারিত্রিক ইতিহাসে আধুনিক বা সেকুলার কবিদের জীবনের যে সকল নৈরাস্যবাদী চিন্তার প্রকাশ থাকে, একজন ভক্ত ও পরিচিত জন হিসেবে আমি তা দেখিনি। কারণ, তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ও ইসলাম পালনকারী মুসলিম।

তার চরিত্রে আমার সবচেয়ে ভাল লাগার দিক ছিল তার সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতা। আমি কখনো তাকে রেগে কথা বলতে দেখিনি। শুধু আমার সাথে নয়, অন্য কারো সাথেও। যদিও তার সাথে আমার চিন্তা ধারার বেশ কিছু অমিল ছিল। আর তার ধীর-স্থিরতা বিমোহিত করেনি তার সান্যিধ্যে আসা এমন মানুষের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যাবে। কথা বলার সময় মনে হতো তিনি প্রতিটি কথা আগের থেকে ভেবে রেখেছেন। যেন ভেবে ভেবে বা মেপে মেপে কথার ফুলঝুরি ছিটাচ্ছেন। তার লম্বা লম্বা কথা বলার এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশ ভঙ্গি ছিল। লম্বা কথা বা বেশি চিন্তা করে কথা বলার সময় তিনি চোখ বুজিয়ে কথা বলতেন। অল্প অল্প করে মাথাও ঝাঁকাতেন। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশ ভঙ্গিও উপভোগ করতাম।

মিথ্যা, ঘুরিয়ে কথা বলা বা বাড়িয়ে কথা বলতে কখনো আমি দেখিনি। অত্যন্ত উদার মনের ও পরোপকারী এক মানুষ ছিলেন। যেন তিনি শুধু দিতে এসেছিলেন। নজরুলের সঙ্গে তার তুলনা না করলেও ইসলামী ভাবধারার এতো অজস্র গান, কবিতা ও সাহিত্য তিনি রচনা করে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী আর্দশের সন্তানকে

সুদৃঢ় করেছেন। ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও পোষাক পরিচ্ছদেও ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালি মুসলিম। সরল ও প্রাঞ্জলতায়, কথা বার্তার আঞ্চলিকতায় তিনি জীবনে বড় একটা সময় রাজধানীতে কাটালেও, তার সাথে কথা বললে মনে হতো তিনি যেন এই মাত্র বাগেরহাট থেকে ঢাকা শহরে পৌঁছালেন। তার গায়ে ও মনে যেন বারুই পাড়ার মাটি লেগে আছে।

www.pathagar.com

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি একজন সফল সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠক ছিলেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকায় সমমনা সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে গড়ে তোলেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী। তারপর একে একে তার অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের শহর, নগর, গ্রাম, গঞ্জ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যায়ল ও মাদরাসায় গড়ে ওঠে একই ধারার অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। আমার দেখা অসংখ্য কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংবাদ কর্মী তার সংগঠন ও ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় আজ সমাজে অবস্থান করে নিয়েছেন। দেশীয় ও ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করেছেন আমৃত্যু।

কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ স্বর্ণপদক, কলমসেনা সাহিত্য পুরস্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্যপদক, সসাস সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, ফ্রান্স কর্তৃক প্যারিস সাহিত্য পুরস্কার, বায়তুল শরফ সাহিত্য পুরস্কার, কিশোর কণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৮৫ সালে বৃটেন ১৯৯২, ২০০০ ও ২০০১ সালে ভারত, ২০০২ সালে ফ্রান্স ও ২০০৩ সালে সৌদি আরব সফর করেন।

এত বিপুল কর্মযোগ্যে জীবন যার পূর্ণকর্মময়, তার মধ্যে কখনো অহংকার বা আত্মঅহমিকার ছিটে ফোঁটা আমি দেখিনি। এর চেয়ে আর কত চারিত্রিক মহত্ত্ব ও অবদান দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি থাকলে একজন মানুষকে 'মহামানব' বলা যায়?

লেখক: খান শরীফুজ্জামান সোহেল, শিক্ষক, বি.আই.এস.সি ও এম. ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

প্রেরণার বাতিঘর

এস.এম. শাহজাহান তারিক

কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক, সমাজসেবক মতিউর রহমান মল্লিকের সম্পর্কে কোন কিছু লেখা বা বলার সামান্যতম কোন যোগ্যতা আমার নাই। তথাপি আমরা কি হারালাম তা জানানোর অদম্য এক বাসনা থেকে কলম হাতে নেবার দু:সাহস দেখালাম। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো আমরা কাছের জিনিসের কোন কদর করতে জানিনা কিন্তু দূরে চলে গেলে তার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে টের পাই। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরব বিশ্বের ইসলামী রাজনীতির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসান আল বান্না এবং আমাদের উপমহাদেশের সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ:)। তাদের জন্ম না হলে ইসলামের মনবাতাবাদী মুক্তির দিশা আমাদের কাছে শুধু ইতিহাস হয়েই থাকতো। ওমর (রা:) ঘোষণা " ফোরাতের তীরে যদি একটা কুকুর ও না খেয়ে মারা যায় তবে আমি ওমর-ই হবো এর জন্য দায়ী-" এ ধরণের সেবক, দায়িত্ববান রাষ্ট্রপ্রধান যে পৃথিবীর বুকে থাকতে পারে তা আমাদের কল্পনার বাইরে থেকে যেতো। আজ একবিংশ শতাব্দীতে উল্লেখিত মনীষীদ্বয়ের কারণে আজ আমরা সেই ইসলামের ইতিহাসের সে ধরণের রাষ্ট্র নায়কের বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। তুরস্ক, ইরান, তিউনিশিয়া প্রভৃতি দেশের পরিবর্তন আমাদেরকে ইসলামের সেই বাস্তব চিত্র দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও তেমনি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি-সাংস্কৃতি শুধু মাত্র একটি বিনোদনের উপাদান এটা ভুল প্রমাণ করে এটি একটি আন্দোলনে রূপদান করেছিলেন। ইসলাম মানেই সংস্কৃতি-আর এই সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমেই মানবতার মুক্তি বা কল্যাণ হয়ে থাকে। কারণ এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য প্রেরিত বিধান। আর এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার আবেদন সবার মাঝে পৌছে দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন মতিউর রহমান মল্লিক।

মল্লিক ভাইয়ের সাথে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে যা আমাকে আজও অনুপ্রাণিত করে। মল্লিক ভাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন, অবশ্যই মল্লিক ভাইয়ের পরিচিতি সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই আমার মত একই কথা বলবে কারণ মল্লিক ভাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ এমন ছিল যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মানুষকে আপন করে নিতেন যাতে সে বুঝতো সেই তার আপন।

১৯৯৫ সালের কোন একদিনে খুলনার আল-ফারুক সোসাইটিতে সাথী শিক্ষাশিবিরের প্রথম মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা। প্রোগ্রাম শেষে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করলাম অনেকে, আমাকে আমার নোট খাতায় বিভিন্ন কাহিনী সম্ভাবনা-স্বপ্ন সম্বলিত স্বাক্ষর দিলেন এবং স্বাক্ষরের উপরের লিখে দিলেন অ-নে-ক বড় হও। অনেক অটোগ্রাফের মধ্যে আমার খাতায় কেন একথাটি লিখলেন তা আজও বোধ গম্য নয় তবে খুলনা জেলা উত্তর শাখায় তৎকালীন সব চেয়ে কম বয়সী সাথী ছিলাম বলে এমনটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

বাগেরহাট জেলার ছাত্র অঙ্গনের দায়িত্বশীল থাকাকালীন মল্লিক ভাইয়ের সাথে বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। তিনি বাগেরহাটে সফরে এলেই আমার সকল কর্মসূচি বাতিল করে মল্লিক ভাইকে নিয়ে বিভিন্ন থানার প্রোগ্রামে ছুটে বেড়াতাম। মল্লিক ভাই ২/১ দিনের এই সফরে জনশক্তির মাঝে যে প্রাণচাঞ্চল্য পরিবেশ তৈরি হতো তা বহুদিন পর্যন্ত কর্মীদের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করত। আসল কথা মল্লিক ভাই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ব্যক্তিগত সমস্যা বা সংগঠনিক সমস্যা যাই হোক না কেন, তা সমাধানে মল্লিক ভাইয়ের কাছে বলা এবং তার সমাধান নেওয়া ছিলো কর্মীদের প্রধান স্থান। আজ এই স্থানের বড়ই অভাব। আজকের অনেক দায়িত্বশীলই কর্মীদের ব্যক্তিগত সমস্যা তো দুরের কথা সংগঠনিক জরুরি সমস্যা ও শোনার সময় হয়ে ওঠেনা।

বাগেরহাটের প্রাণপূরুষ কবি মল্লিক কে বাগেরহাটে আমরা যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে পারি নাই। তথাপি যতটুকু কাজ আমরা পেয়েছি তা আমাদেরকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সম্ভাবত ২০০৩ সালে বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমীতে অয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধকার ছিলেন মল্লিক ভাই। মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা:) শীর্ষক প্রবন্ধে মহনবীকে মানবতার বন্ধু হিসাবে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই বিরল। প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা:) পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রত্যেক মানুষকেই মানবতার বন্ধুতে পরিণত হতে হবে এটাই ইসলামের দাবি।

ছাত্রআন্দোলনের কাজ কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার প্রেশানি সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। বিগত জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে সরকারি দলীয় ছাত্র সংগঠনের সাথে আমাদের যে সমস্যা গুলি হচ্ছিল তা মোকাবেলার জন্য একজন সত্যিকারের অভিবাবকের ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন। বিশেষ করে তারই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে ভিপিসহ প্রায় সকল পদে আমাদের বিজয় নিশ্চিত হবার পরও পরাজিত প্যানেল কতৃক ব্যালট বাক্স ছিনতাই পরবর্তীতে ফলাফল বাতিলের ঘটনায় মল্লিক ভাই আমাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা সত্যিই আমাদের সাহসকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। সে সময়ে মল্লিক ভাইয়ের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মল্লিক ভাই ছিলেন আমাদের একজন মহান শিকক্ষ। তিনি ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদেরকে কিভাবে কাজ করতে হবে সে ব্যাপারে যথাযথ পরামর্শ দিতেন। তিনি আমাকে অনেক বারই বলেছেন যে, কোন প্রোগ্রামের উপস্থিত ছাত্রদের মাঝে যারা একটু পিছিয়ে (শারীরীক, আর্থিক) তাদেরকে প্রোগ্রামের শেষে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া তাহলে তাদের এগিয়ে আসতে সুবিধা হবে। যারা এগিয়ে আছে তাদের খোঁজ-তো সকলেই রাখে।

এক সময় প্রতি ঈদের পর দিন বাগেরহাটে মল্লিক ভাইয়ের উপস্থিতিতে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হতো । অতিথিবৃন্দ এই সুযোগে নিষ্ক্রীয় প্রাক্তন দায়িত্বশীলদের সমালোচনা করলে ও মল্লিক ভাই ছিলেন নিষ্ক্রীয়দের পক্ষে। তাদের সমস্যা দেখ-ভাল করা এবং এগিয়ে আনার জন্য দায়িত্বশীলদের আরো সহানুভুতিশীল হওয়ার পরামর্শ দিতেন।

যাহোক, মল্লিক ভাই ছিলেন আমার প্রেরণার উৎস। তার কাছ থেকেই যা শিখেছি তা আমার আজকের চলার পাথেয় হয়ে রয়েছে। মল্লিক ভাই আজ নাই- মনে কোন কষ্ট পেলে তা মন খুলে বলার কেহ নাই। শুধু তার কাছ থেকে দেখা বা শোনা বিষয়গুলি আমাকে সাহসের সাথে সক্রিয়তার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নিশানার কাজ করছে।

লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক, বাগেরহাট ফোরাম, ঢাকা

www.pathagar.com

ধ্রুব চিন্তার বয়ান

আফসার নিজাম

শুরু করতে পারি এখান থেকে যেখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন। তিনি কি শুরু করেছিলেন? আমাদের মনের ভেতর সেই প্রশ্নটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে। কেনো আসে আমাদের সেই প্রশ্নটার দিকেই আগে যেতে হবে। আমি চেষ্টা করবো সেই প্রশ্নটার জবাবের দিকে ধাবিত হতে। আমরা প্রায়সই একটি চিন্তা করি। এই প্রায়সই কথাটি এ জন্য ব্যবহার করলাম। কারণ আমরা কোনো চিন্তাই করি না। আসলে চিন্তার জন্য যে মন তৈয়ার করা প্রয়োজন আমাদের সেই মন এখনো তৈয়ার হয়ে ওঠেনি। কারো কারো সেই চিন্তা তৈয়ার হয়েছিলো এবং সেই চিন্তার আলোকে একটি বয়ানও তৈয়ার করে কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

আমরা যারা নয়া কোনো চিন্তা বা বয়ান তৈরিতে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারিনি বা আমি বলবো নিজের আখেরকে অতিমাত্রায় প্রধান্য দিয়েছি কওমের আখেরের থেকে তারা চিন্তা থেকে দূরে বসবাস করি। এইযে চিন্তার থেকে দূরে বসবাস করা সেই জন্য চিন্তাশীল মানুষকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পায়। তখন আমরা খোঁজ করি কে শুরু করেছিলো কওমের জন্য নয়া বয়ানের কর্মকৌশল। সেই কর্মকৌশলকে অবলম্বন করে আমরা নিজের একটি পথ তৈয়ার করি। যদিও আমরা তাঁর পথেই হাঁটি তবু আমরা বলতে চেষ্টা করি আমরা এক নয়া পথে চলছি। এই পথ তাঁর দেখানো পথ বা আমরা এও বলতে পারি একটি পথ ছিলো যা ব্যাবহৃত না হওয়ার জন্য জংগলাক্রিন্ন হয়ে পড়েছিলো অথবা কওম ভুলেই গিয়েছিলো একখানে একটি পথ ছিলো; যে পথ দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা হেঁটে গেছেন বছরে পর বছর; যুগের পর যুগ। সেই পথটি তিনি নতুনভাবে আবিষ্কার করে গেছেন। সেই পথটিকে আমরা নয়া পথ বলি। এই যে নয়া পথের আবিষ্কারক তাকেই আমরা চিন্তাশীল বলে আমাদের নকিব ভাবতে থাকি।

এই যে বললাম নকিব বা নয়া পথের আবিষ্কারক অথবা চিন্তক। তিনি কে? কোথা থেকে তার এই পথ চলা। কোথা থেকে তিনি নয়া পথের দিকে ডাকেন। কি তার মিশন? কি তার ভিষণ? তাকে জানার কওমের একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখনই তিনি আমাদের মাঝে বিরাজ করেন। আমরা অনুভব করি তিনি আমাদের মাঝে বিরাজ করছেন। তিনি আমাদের চিন্তার ভেতর এমন একটি স্থান অধিকার করেছেন যেখান থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই; দর্পনে যেভাবে দেখতে পাই আমাদের চেহারা।

তাঁর চলে যাওয়ার পর আমরা নানাভাবো বয়ান করতে চেষ্টা করছি, তাঁর জীবনে বিভিন্ন রূপ। এখন যা বয়ান করছি আগামীতে আমরা হয়তো অন্যভাবে বয়ান করবো তাঁর জীবন।

www.pathagar.com

এখন মোটের ওপর তাঁর চিন্তা নিয়ে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না তেমন কথাও বলা চলে না আবার এ বলা চলে না তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁর চিন্তাকে সংগঠিত করার ব্যাপক প্রয়াস চলছে। তবে যে ছোট ছোট কদমে চলছে তা নগণ্য একথা বলার কারো সাহস নেই।

পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছেন যাদের আবিষ্কার করতে কওমের সময় লেগেছে শতবছর। আমরা তেমন দুর্ভাগা নই। তিনি বিরাজমান থাকতেই আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম আমাদের মাঝে তিনি এক নান্দনিক শিল্পী। তাঁর চিন্তা স্ফুরোন বিদ্ধ করেছে বিদগ্ধজনকে। যাঁরা ক্রমাগত চিন্তা করেছেন কওমের কথা। তাঁদের মাঝেও তিনি বিরাজমান। তিনি তাঁদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তার যে আদর্শ সেই আদর্শেল পাণ্ডলিপি। তিনি যে নয়া পথের দিকে কওমকে নিয়ে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন তার বয়ান দেখতে পাই –

এসো গাই আল্লাহ নামের গান
এসো গাই গানের সেরা গান
তনু মনে তুলবো তুমূল তুর্য তাল ও তান।।
পাখনা মেলে উড়লে পাখি
গায় কি ও নাম ডাকি ডাকি
আকাশ নীড়ে মেঘের ভেলা নিত্য চলমান।।
ঢেউ সে দুলে দুলে বুঝি
সাত সাগরে বেড়ায় খুঁজি
ঐ নামের-ই অরূপ রতন হীরা ও কাঞ্চন।।
মাঠে মাঠে বনে বনে
সবুজ সবুজ আলাপনে
ঐ নামের-ই আলোকধারা জমিন ও আসমান।।

এই যে পথের বয়ান তা যুগ যুগ ধরে চলমান। এই পথ বিভিন্ন সময় এসে বিভিন্নভাবে বাঁক নিয়েছে। নতুন নতুন দিক নির্দেশক এসে আবার সহজ সরল পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। সেই পথ বাতলিয়ে দেয়ার শেষ নির্দেশক যখন আর থাকলো না। তখন সেই পথের নিদর্শন প্রস্ফুটিত রাখার জন্য কাজ করেছেন অনেক বিজ্ঞজন। আমরা তেমনি একজন মানুষের চিন্তাকে জানার চেষ্টা করছি। আমরা সেই বিজ্ঞজন বা চিন্তাশীলের আদর্শ বনায়ের কৌশলকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করছি।

আমরা আবার ফিরে আসি সেই প্রশ্নটার কাছে তিনি কি শুরু করেছিলেন– আমরা সেই দিকগুলোর বয়ান হাজির করবো-

ঈমানের দাবি যদি কোরবানী হয়
সে দাবি পুরনে আমি তৈরি থাকি যেনো
ওগো দয়াময়
হে আমার প্রভূ দয়াময়।।
ঈমানের দাবি সে তো বসে থাকা নয়
ঈমানের দাবি হলো কিছু বিনিময়
সেই বিনিময় যদি কলিজার ঘাম হয়
সেই ঘাম দিতে যেনো তৈরি থাকি আমি
ওগো দয়াময়
হে আমার প্রভূ দয়াময়।।
ঈমানের উপমা যে অগ্নিশিখা

www.pathagar.com

কাজ হলো শুধু তার জ্বলতে থাকা
তেমনি করে ওগো নিঃশেষে এই আমি
জ্বলে জ্বলে জীবনের দাম যেনো খুঁজে পাই
ওগো দয়াময়
হে আমার প্রভূ দয়াময়।।

কোন পথটির দিকে তিনি আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন। চিন্তার কোন অবস্থানটি আমাদের ধারন করতে হবে তা তিনি বাতলিয়ে দিয়েছেন। এইযে পথের সন্ধান দেনেওয়ালা তার চিন্তার ভেতর কি খেলা করছিলো। কোন কোন বিষয়াবলীকে কেন্দ্র আবর্তিত হয়েছিলো তাঁর চিন্তার আবহ। কোন মঞ্জিলে পৌছতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাথে তিনি কাকে কাকে সঙ্গী করতে চেয়েছেন তার সব বয়ানই তুলে ধরেন–

আয় কে যাবি সংঙ্গে আমার
নবীর দেশে আয়
যেথা মরুর ধুলো মুক্ত হলো
লেগে নবীর পায়।।
সেথায় গিয়ে প্রশ্ন আমি
করবো জনে জনে
পথে চলতে আনমনে
কোন দিকে ভাই হেরার পাহাড়
বলে দাও আমায়...।।
একা একা খুঁজবো আমি, বদর দিকে দিকে
হাজার খুশি নিয়ে বুকে
মুক্তির দীক্ষা নেবো সেথায়
গভীর পিপাসায়...।।

তার বয়ানে তুলে ধরেছেন তার যাবতীয় কর্মের উৎসমূল। তিনি কেবলী যেতে চেয়েছেন সেই পথের দিকে যে পথ একসময় ছিলো এখন কন্টকাকির্ণ। অসম্পূর্ণ চিন্তার বেড়াজালে বন্দি করতে দেননি কওমের জিজ্ঞাসা। সেইসব জিজ্ঞাসার জবাবের মধ্যেই তিনি তৈয়ার করেন নয়া পথ বা জংগাকির্ণ পথের নয়া সংস্করণ।

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরন একদিন মুছে দেবে
সকল রঙিন পরিচয়।।
মিছে এই মানুষের বন্ধন
মিছে মায়া-স্নেহ-প্রীতি ক্রন্দন
মিছে মায়া ভালাবাসা বন্ধন
মিছে এই জীবনের রঙধনু সাতরঙ
মিছে এই দুদিনের অভিনয়।।
মিছে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
মিছে গান কবিতার ছন্দ
মিছে এই অভিনয় নাটকের মঞ্চে
মিছে এই জয় আর পরাজয়।।

তাঁর চিন্তা এখানে এসেই থেমে যায় যেখানে থামলে আর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আর কোনো বাসনাই জাগ্রত থাকে না।

লেখক : কবি ও সাংবাদিক

www.pathagar.com

স্মৃতিময় মল্লিক

খালিদ সাইফ

পরিচয়ের প্রাথমিক পর্ব

মতিউর রহমান মল্লিককে আমি প্রথম দেখি ১৯৯৪ ইসায়ী সনে, শাহবাগের বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে। তখন তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ কলম পত্রিকার যোগ্য সম্পাদক। সে-সময়ই অকস্মাৎ তার কাছে যেতে হয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধু আবু তালেব শেখ তখন গান গাইত এবং সে একটি সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। সাংস্কৃতিক দলটি অন্যান্য কাজ-কর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করত। সেই সংগঠনের দরকার একটি দলীয় সংগীতের। আমার বন্ধু আগে একদিন গিয়ে তাকে বলে এসেছিলেন গান লেখার কথা। তিনি গানটি লিখে দেয়ার ব্যাপারে রাজিও হন। অবশ্য আমরা সেদিন গিয়ে লেখা আনতে পারি নি; তিনি বসতে পারেন নি লেখাটির জন্য। আমরা দুজনই তখন উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র একেবারেই অপরিচিতি মুখ। সালাম দিয়ে তার রুমে ঢুকলে স্বাভাবিক বিনয়ের হাসি দিয়ে তিনি আমাদের বসতে বললেন; আমরা বসলে হাতের কিছু কাজ সারলেন। সেই ফাঁকে আমার চোখ ভিডিও ক্যামেরা হয়ে তাকেসহ রুমের প্রতিটি জায়গার ছবি তুলে নিল মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে। খুবই আড়ম্বরহীন একজন মানুষ, অত্যন্ত সাধারণ পোশাক-আশাক, সবচেয়ে বেশি অবাক লেগেছে পায়ের চপ্পল দেখে, শরীরে পরা পাঞ্জাবি-পায়জামাও খুবই সাধারণ মানের। তাকে দেখে সেদিন অনুপ্রেরণা জেগেছিল মনে; মুমিন তো এমন সাধারণ জীবনই যাপন করেন। পৃথিবীর জীবন তো তার কাছে কিছুই নয়, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য কাজ করে চলেন নিরলসভাবে। সেদিন তাকে মনে হয়েছিল বিশাল জনস্রোত থেকে একেবারে আলাদা, যে-আলাদার মহিমা তাকে দিয়েছিল পর্বতের উচ্চতা। সাহিত্যানুষ্ঠানে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে; সে-সব ছিল অত্যন্ত দূর থেকে দেখা।

বিভিন্ন সাহিত্যসভার পেছনের সারিতে এসে বসে থাকি; মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হোতো মাঝে-মধ্যে। আলোচক না হলে তিনিও এসে বসে পড়তেন পেছনের সারিতে। কিন্তু মেহমানবৃন্দ ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অতিথিদের চেয়ারে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতেন। তিনি একেবারেই রাজি হতে চাইতেন না সামনে যেতে; অবশ্য কখনও কখনও অনুরোধ এড়িয়ে যাবার উপায় থাকত না, তখন তিনি গিয়ে বসতেন সামনের সারিতে। ঢাকায় প্রথম এসে বেশি ঘুরাঘুরি করতাম মগবাজারেই; মগবাজারের বাংলা সাহিত্য পরিষদে তখন প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত আসতেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাকে ঘিরে জমে উঠেছিল জমজমাট সাহিত্য আড্ডা; সেখানে হঠাৎ হঠাৎ এসে যোগ দিতেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ঐ

www.pathagar.com

সময় ১৯৯৫ সালে, সেই সাহিত্য আড্ডার নিয়মিত সদস্য, বর্তমানের লেখক ও প্রকাশক নিজাম সিদ্দিকী বললেন মতিউর রহমান মল্লিক ভাই অসুস্থ। জানলাম তিনি মহাখালির টিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন; সিদ্ধান্ত হলো তাকে দেখতে যাওয়া হবে। একদিন সন্ধ্যার পর তরুণরা দল বেঁধে গিয়ে হাজির হলাম হাসপাতালে। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে; হাসপাতাল কেবিনের ছোট রুমটার বিছানায় রাখা বই আর বই। এই মারাত্মক অসুস্থতার ভেতরেও তার পড়াশুনার বিরাম নেই। পরে যখন সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখন আমার মনে পড়েছে তুরস্কের বিপ□বী ব্যক্তিত্ব সাইদ নুরসীর কথা। তিনি বলেছিলেন প্রতিটি মুমিনের জীবনই সৈনিকের জীবন। প্রতি মুহূর্তেই তাকে যুদ্ধ ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। মল্লিক ভাইও জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সারা বিশ্বের খোদাহীন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্রোতের বিপরীতে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন উল্টাস্রোত। যে-তৌহিদবাদী স্রোতধারা তৈরিতে তার ভিত্তিভূমি ছিল বাংলাদেশ। বিপরীত উচ্চারণ ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাদের স্বপ্নগুলো ঐসময় পরিণত হচ্ছিল বিভিন্ন সাহিত্যসভাকে কেন্দ্র করে; সারা সপ্তাহ চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম কখন কোথায় সাহিত্যসভা হবে সে জন্য। মগবাজারের ডাক্তারের গলির বাংলা সাহিত্য পরিষদে বৃহস্পতিবারের সাহিত্য আড্ডা ও প্রতি মাসের দশ তারিখের সাহিত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগ দিতাম। বাংলা সাহিত্য পরিষদেই পরিচয় হলো কবি নাঈম মাহমুদের সঙ্গে। তিনি তখন বিপরীত উচ্চারণের সাহিত্যসভা চালাতেন (বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী), আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যত সাহিত্যসভা হতে পারে হোক, সাহিত্যসভাতেই সুখ, সাহিত্যসভাতেই একমাত্র আনন্দ। নাঈম ভাই সাহিত্যসভার খোঁজ দিলেন আর আমরা প্রায় দলবেঁধেই যোগ দিলাম তার সাথে। এরপর বিপরীত উচ্চারণের সাহিত্যসভায় যখনই কবি মতিউর রহমান মল্লিককে চেয়েছি তখনই তিনি ঢাকা থাকলে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। মূলত বিপরীত উচ্চারণের মাধ্যমেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গে। ঐ সময় ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের দিকে আমরা বিপরীতের সাহিত্যানুষ্ঠান করতাম মগবাজারের গ্রিনওয়ের একটি বাসায়। ঐ বাসাতে তখন কোনো এক রমযানে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র (তখন সংগঠনটির নাম ছিল অন্য) একটি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। দাওয়াত পেয়ে সেখানে যোগ দিয়ে দেখি, রমযান মাসের সেই ইফতার মাহফিলে কুরআন তিলাওয়াত করছেন মল্লিক ভাই। দ্র"ত বসে পড়ে তার তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিয়েই অবাক হয়ে যাই; তিলাওয়াতের কী অসাধারণ কণ্ঠ; তিলাওয়াতও করছিলেন হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে। বিশ্বের বহু বিখ্যাত ক্বারির কুরআন তিলাওয়াত শুনেছি, তাদের অনেকের কণ্ঠই হয়ত মল্লিক ভাইয়ের চেয়েও শ্রুতিমধুর, কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের কণ্ঠে কালামেপাকের যে-সুধাবর্ষণ আমার কানে হয়েছিল তা কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। সেদিনের পর থেকে কেবলই মনে হয়েছে আরও তিলাওয়াত শুনতে হবে তার কাছ থেকে। তার ইমামতিতে সালাতে দাঁড়িয়ে শুনেছিও সে তিলাওয়াত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই ইফতার মাহফিলের মতো মন-প্রাণ ভরে আর কখনও তিলাওয়াত শুনতে পারি নি। অত্যন্ত যোগ্য নেতা ও সংগঠকের মতো তিনি যার মধ্যেই লক্ষ করেছেন সামান্য সম্ভাবনা, তাকেই উৎসাহিত করেছেন প্রচন্ডভাবে। তার স্নেহধন্য যারা হয়েছেন তাদের সবার মনে হয়েছে যেন তিনি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

www.pathagar.com

ইস্কাটনের অফিস

এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। লেখালেখি, পড়াশুনা ও সাহিত্য আড্ডা সমান তালে চলছে। শাহবাগের নতুন কলম পত্রিকা অফিসে যাতায়াত আরম্ভ হলো। দু'হাত ভরে লেখার সুযোগ পেলাম কলম-এ; এজন্য পত্রিকাটির কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এ সময়ই, অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের প্রথম পর্যায়ে, একদিন খবর পেলাম মল্লিক ভাই দেখা করতে বলেছেন আমাদের, আমাদের মানে হোসাইন হাফিজুর রহমান ও আমাকে। হোসাইন হাফিজ ছিল আমাদের বিপরীত সাহিত্য আসরের এক বন্ধু। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র; মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে মেধা তালিকায় স্থান করেছিল। যথাসময়ে আমরা দেখা করি তার সাথে। ঐ দিনগুলো ছিল আমাদের জন্য খুবই উন্মাতাল সময়। কিভাবে যেন আমরা মৌচাকের মতো জমাট বেঁধেছিলাম একদল সাহিত্য পাগল তরুণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সাহিত্যের আড্ডা দিয়ে কেটেছে সে সময়; স্বপ্নের মতো রঙে রঙে ভরা ছিল সে-সব দিন। একেকজনের স্বভাব-প্রকৃতি ছিল একেক রকম। নিয়াজ শাহিদী তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখত। কবিতার জন্য দুর্দান্ত আবেগ ছিল তার; এখনও সুদূর কানাডা থেকে মাঝে-মধ্যে ফোন করে দীর্ঘ সময় ধরে কবিতা শোনায় সে। কবি আজাদ ওবায়দুল্লাহ ছিল আল্লামা ইকবাল, ফররুখ আহমদের মহা ভক্ত। অজস্র কবিতা ঠোঁটে ঠোঁটে ঘুরত তার, পড়াশুনা করত দানবের মতো। মল্লিক ভাইও অসম্ভব স্নেহ করতেন আজাদকে। দিন কত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যায়; মল্লিক ভাই বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে আর কবি আজাদ ওবায়দুল্লাহ মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের মাঝে থেকেও নেই। নিউ ইস্কাটনে একটি বাড়িতে। দেখা করলে বললেন তার স্বপ্নের কথা; একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করার আগ্রহ আছে, সেটা সম্পাদনা করার দায়িত্ব দিতে চান আমাদের। পরেও দুই-একবার মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গে বসা হয়েছে পত্রিকা প্রসঙ্গে; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেই প্রত্যাশিত পত্রিকা আর আলোর মুখ দেখেনি। ততদিনে আমিও অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক হয়ে গেছি আর আমাদের অপর সম্পাদক হোসাইন হাফিজুর রহমান ব্যস্ত তার ফিজিওথেরাপি পড়াশুনা নিয়ে। হোসাইন হাফিজের তখন একটি যৌথ কবিতার বইও বেরিয়েছিল। তার নাম আসলে ছিল হাসান হাফিজুর রহমান ড় আমাদের প্রতিষ্ঠিত একজন কবি ও বুদ্ধিজীবীর নামে। হাসান যখন সাহিত্য সভায় আসা শুরু করল তখন মল্লিক ভাই-ই তার নাম খানিকটা পরিবর্তন করে হোসাইন হাফিজুর রহমান করে দেন।

বিপরীত উচ্চারণ ও মল্লিক ভাই

অসংখ্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠন গড়ে তুলেছেন বা সে-সবকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। অন্তত তিন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তার অনন্য কীর্তি, সে তিনটি হলো, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী ও বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ। বিশেষ করে বিপরীতের জন্য মল্লিক ভাই ছিলেন বাবা-মায়ের মতো। আমরা যখন বিপরীতের সাহিত্য আসরগুলোতে নিয়মিত যোগদান করছি তখন এর কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না; এখানে-সেখানে উদ্বাস্তুর মতো করতাম সাহিত্যানুষ্ঠান। মল্লিক ভাই সে-সময় পাখি-মাতার মতো আমাদের মাথার ওপর বিছিয়ে দিলেন স্নেহের ডানা। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র তখন চলে গেছে, মুহাম্মদপুরের গজনবি রোডে। সেখানেই বিপরীত উচ্চারণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

জায়গা হলো আমাদের। কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিপরীতের অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য নানা পরামর্শ দিতেন, বিপরীত কোনো সমস্যায় পড়লেই পাওয়া যেত সব ধরনের সহযোগিতা। ৫/৫ গজনবি রোডের বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রেই সবচেয়ে নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছি তার; দেখা হয়েছে খুবই কাছ থেকে। এখানে আমি নতুনরূপেও আবিষ্কার করি তাকে। তিনি তো ছিলেন একাধারে গায়ক, গীতিকার, সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব, ছাত্রনেতা, সংস্কৃতিকর্মী, কবি ও অসাধারণ বাগ্মী। এসব বহুমুখী গুণের বিপরীতে দেখা গেছে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু উজ্জ্বল একটি দিক; সেটি হাস্য-রসপ্রিয়তা। অসংখ্য মজার মজার গল্প বলতেন তিনি, কৌতুকের স্টক ভেতরে সব সময় টইটম্বুর হয়ে থাকত। তার সঙ্গে আড্ডা দেয়াটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-আন্তর্জাতিক ইত্যাদি প্রায় সকল প্রসঙ্গেই কথা বলতে পারতেন তিনি। ১৯৯৮-৯৯ সালের ঐ দিনগুলোতে আমি থাকতাম সাভারে, বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসে গুলিস্তান পর্যন্ত আসতে লাগত এক টাকা। জাহাঙ্গীরনগরে রটনা ছিল, 'বাস ভাড়া কম হওয়ায় অনেকে চা খেতে আসে নীলক্ষেতে'। এক টাকা ভাড়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছি যতটুকু পারা যায়; নতুন কলম পত্রিকা অফিস ও বিপরীত উচ্চারণের সাহিত্যসভায় কেটে গেছে অসংখ্য বিস্মিত মুহূর্ত, ঘণ্টা ও দিন। বিপরীত উচ্চারণের সাহিত্যসভা জমে উঠেছে পুরোদমে; অগণিত উজ্জ্বল তরুণের উপস্থিতিতে তখন মুখর থাকত বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র। আমরা চেয়েছি আমাদের প্রত্যাশা ও আশাগুলো পূরণ করতে; মল্লিক ভাইও সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছেন সব দাবি মেনে নিতে। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের ঠিকানা থেকেই তখন নাঈম মাহমুদের সম্পাদনায় বেরিয়েছে দ্রষ্টা নামক সাহিত্য-কাগজ ও বিপরীত উচ্চারণ স্মারক। দ্রষ্টা ছিল মল্লিক ভাইয়ের পরিকল্পনার ফসল ও আমাদের মুখপত্র। লেখা নয় যেন স্বপ্ন আঁকা হয়ে থাকত দ্রষ্টা-র প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বিপরীতের জন্য মল্লিক ভাইয়ের দরাজদিল ও উদার হাতের কথা কখনও ভুলতে পারবে না ঐ সময়ের তারুণ্য।

ছন্দের ক্লাস

গজনবি রোডের বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে তখন শুরু হয়েছে অনেক প্রশিক্ষণ ক্লাস। সেখানকার সভাপতি হিসেবে মল্লিক ভাই-ই শিক্ষকদের দ্বারা শুরু করেন ক্লাসগুলো। অবশ্য তিনি বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সভাপতি বা পরিচালক কোনো পদবিই ব্যবহার করতেন না; তার দাফতরিক পরিচয় ছিল সদস্য-সচিব হিসেবে। ঐ সময় মল্লিক ভাই আমাকেও বললেন কবিতার ছন্দের উপর ক্লাস শুরু করার জন্য। আমি আর না করি নি, সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই। ক্লাসগুলো নিতে গিয়ে নিজের যা লাভ হয়েছিল তা হলো, তখন ছন্দর উপর আমি প্রচুর পড়ে ফেলি। তবুও ছন্দ বিষয়টাতে খুব একটা আকর্ষণ অনুভব করি নি।লেখালেখির প্রথম পর্বটা অন্য অনেকের মতো আমারও শুরু হয়েছে কবিতা দিয়ে; কিন্তু পরে গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, কবিতা- মাধ্যমে কাজ করাটা আমার দ্বারা হবে না। কবিতা সম্পর্কে চিন্তা করে মনে হয়েছে, কবিতা কবির জীবন থেকে নেয় অনেক বেশি কিন্তু ফিরিয়ে দেয় খুবই খুবই কম। কবিতা লেখার জন্য অনেক বড় ধরনের ঝুঁকিও নিতে হয়; সে-ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার উপযুক্ত নিজেকে মনে হয় নি। তাছাড়া ঢাকা শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কবি বন্ধুদের অনেকেই আমার চেয়ে অনেক ভালো কবিতা লিখত। ভাবলাম এক ব্যাচের সবাই কবিতা নিয়ে কাজ করলে সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে ফসল ফলাবে কারা? ছন্দের ক্লাসটি

www.pathagar.com

শুরু হয়েছে মূলত মল্লিক ভাইয়ের আগ্রহে; কিন্তু ক্লাসে ছাত্র খুব একটা পাওয়া যায় নি। প্রথমদিকে কয়েক মাস ভালোভাবে চললেও আস্তে আস্তে শিক্ষার্থী কমতে থাকে। তবে শিক্ষার্থী কম থাকলেও যারা তখন আসত প্রায় সবাই ছিল খুবই আগ্রহী ও মেধাবী। পরে ছাত্র সমস্যা এবং আমারও ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় ক্লাসটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে যাওয়াটা নিয়মিত না হলেও বন্ধ ছিল না। ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগ থেকে একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় সুন্দরবনে গিয়ে আমরা কয়েকদিন থাকব। সে-সফরের জন্য যে-চাঁদা ধার্য করা হয় তা আমার জন্য ছিল বড় অংকের; এত টাকা বাড়ি থেকে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এ সফর উপলক্ষ্যে একটি স্মারক বের হবে এবং তার জন্য স্পন্সর নেয়া হবে। যারা স্পন্সর সংগ্রহ করতে পারবে তাদের কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না। আমি এসে মল্লিক ভাইকে বললাম, আমার একটা স্পন্সর লাগবে। তিনি বললেন, তুমি একটা দরখাস্ত লিখে 'সরকার ও রাজনীতি' বিভাগে আমার বন্ধু ড. আবদুল লতিফ মাসুমের একটা সুপারিশ-স্বাক্ষর নিয়ে আস। আমি সেটা নিয়ে এসে মল্লিক ভাইয়ের হাতে দিলাম; তিনিও সেটাতে সুপারিশ-স্বাক্ষর দিলে স্পন্সর পেয়ে যাই এবং বিনা পয়সায় সুন্দরবন ভ্রমণ করি।

শেষ সাক্ষাৎ

লেখাপড়া শেষ হলে বাস্তবতা হাঙরের মতো বিশাল মুখ করে সামনে দাঁড়ায়, যেন সাথে সাথে গিলে খাবে। নানামুখী ব্যস্ততার কারণে মল্লিক ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগে পড়েছে ছেদ। নিজের ভেতরেও ঘটে গেছে কত রূপান্তর-পরিবর্তন। এলোমেলো যে-সমস্ত লেখা বিভিন্ন সময়ে লিখেছি, সেগুলোকে গ্রন্থভুক্ত করার একটি প্রবল তাগিদ অনুভব করেছি মনে মনে। কিন্তু লেখার মানের কথা চিন্তা করে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি স্বপ্নের গলা। অথচ স্বপ্ন ও স্বাধীনতাকে কখনও বন্দি করে রাখা যায় না। শেষপর্যন্ত প্রথম বই বের হলো; প্রচ্ছদ মোটেও ভালো হয়নি; বের হবার শেষের দিকে খুব আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। নিজের সমালোচক সত্তা পরাজিত হয় প্রকাশের তীব্র ইচ্ছের কাছে। মনে হয়েছে, আরে হোক না প্রচ্ছদ একটু খারাপ তাতে কী! বই বের হচ্ছে এটাই বড় কথা। প্রথম বই শেষপর্যন্ত বের হলো ২০০৬-এ; শিরোনাম প্রজ্ঞার শহরে একদিন। দ্বিতীয়টিও বের হলো পরের বছর; এবার আর আগের মতো ভুল করা নয়। আমার প্রবন্ধের বই নির্মাণ ও বিনির্মাণ (২০০৭) এর উৎপাদন-গ্রন্থনার সমালোচনা শত্রুও খুব একটা করতে পারবে না। দ্বিতীয় বইটি নিয়ে সাক্ষাতের ইচ্ছা ছিল মল্লিক ভাইয়ের সাথে, কিন্তু নানা ব্যস্ততায় সেটি আর হয়ে উঠে নি; তবে বই ঠিকই পৌঁছে দিয়েছি মল্লিক ভাইয়ের হাতে। শেষপর্যন্ত তৃতীয় বইটি [জালালুদ্দিন রুমিঃ প্রেমের কবিতা (২০০৮)] বেরুনের পর সেটি নিয়ে সরাসরি একদিন হাজির হই কল্যাণপুরে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের অফিসে। দীর্ঘক্ষণ আড্ডা হয় কবির সঙ্গে; বই দেখে অনেক খুশি হন। বই দিয়ে আসার কয়েক মাস পরেই শুনতে পাই তিনি অসুস্থ। পরের ইতিহাস তো সবার জানা। সর্বশেষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চিকিৎসা নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর। গত বছর পহেলা বৈশাখের দিন, অর্থাৎ বাংলা ১৪১৭ অব্দের প্রথমদিন। সে-দিন বর্ষ-বরণের অনুষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে। সে- অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরের খাবার খেলাম; খাওয়া শেষে কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে মল্লিক ভাইকে দেখতে যাবো। দল বেঁধে গেলাম তার বাসায়; আহসানুল ইসলাম, আহমদ বাসির, আফসার

www.pathagar.com

নিজাম, রেদওয়ানুল হক ও আমি। দীর্ঘক্ষণ কথা হয় তার সঙ্গে, নানা বিষয় নিয়ে। নিজেই বলেছিলেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন বেশি সুস্থ। কথা বলতে বলতে মাগরিবের আজান দিয়ে দিল, সবাই মিলে নামাজে দাঁড়ালাম। জোর করে তিনি আমাকেই ঠেলে দিলেন ইমামতির জন্য। সেদিন তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে সুস্থ হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা ছিল না, তিনি নিজের বান্দাকে নিজের কাছে নেবেন এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। মল্লিক ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন কর্ম। কিছু কর্ম তার এমন আছে যা অসমাপ্ত, তা শেষ করতে হবে আমাদেরই। আছে কিছু এমন কাজ যা শেষ করে গেছেন নিজেই। সমাপ্ত-অসমাপ্ত দুই কাজের জন্যই তিনি অমর হয়ে থাকবেন; থাকবেন, যেমন ছিলেন তিনি, সবার ভালোবাসার বন্ধনে। মানুষকে সারাজীবন বিলিয়েছেন প্রেম-ভালোবাসা, এখন দোয়ার মাধ্যমে পাবেন সেটা ফেরত; রাহমানুর রাহিমের কাছ থেকে যেমন -ইনশাআল্লাহ, তেমনি মানুষের কাছ থেকেও।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক: জীবনের মতো মৃত্যু বাঁচিয়ে রাখলো যাকে

এ কে আজাদ

ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি জন মিল্টন কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন- ''কবিতা হবে সরল, ইন্দ্রিয় সংবেদী ও আবেগ দৃপ্ত।'' কতটা আবেগ দৃপ্ত? বিশ্বাসের গভীরতা যতটা। কতটুকু গভীরতা? একজন কবির বিশ্বাসের মূল স্বতঃ প্রণোদিতভাবে পৌঁছতে পারে যত গভীরে, ঠিক ততটুকু। এই বিশ্বাস আর আবেগের এই যে প্রকৃষ্ট সংমিশ্রণ তা-ই স্থান করে নিয়েছে কবি গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী মতিউর রহমান মল্লিকের (০১/০৩/১৯৫৬-১২/০৮/২০১১) স্বজ্ঞাজাত অভিব্যক্তির সংবিৎজারিত প্রকাশ ভঙ্গিমায়। তাঁর সরল কাব্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রজ্ঞাজাত বিষয়বস্তু -

কবিতা তোমার জন্য আমি তো চৌচির করি রঙ,
দুই ভাগ করি রসের শরীর রূপের রেখা বরং।
তোমার জন্য মঞ্চ ধূসর কুয়াশার দিনক্ষণ,
ক্রমাগত বাজে দূরের বাদ্য ঝাপসা পর্যটন।
[-কবিতা তোমার জন্য]

সত্যিই ঝাপসা হয়ে গেল পর্যটন (১২/০৮/২০১০)। বিদায় নিলেন অভিমানী এক পর্যটক। কিন্তু রেখে গেলেন তার বিশ্বাসের আঁচড় তাঁর গান আর কবিতার পয়ারে পয়ারে। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব তা প্রকাশে দ্বিধাবিভক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল মূলত তিরিশের দশকে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় সে সময় নাস্তিক্যবাদ আর হতাশাবাদ আবর্তিত হয় প্রধান পাঁচজন কবির হাতে। তারা হলেন- বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অসীম চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাস। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন ''হয়তো ঈশ্বর নেই, জীব সৃষ্টি আজন্ম অনাথ।'' যাহোক, সেই তিরিশের দশকে বিশ্বাসী কবিদের যে অবস্থান তা কোন মতেই দুর্বল ছিল না। বরং নাস্তিক্যবাদী আর হতাশাবাদী কবি যারা, সে সময় পশ্চিমা সাহিত্যের হতাশাব্যঞ্জক ঢেউয়ের দ্বারা দারুণভাবে প্ররোচিত হয়েছিলেন, তাদের চেয়ে খানিকটা দাপটের সাথেই অবস্থান ছিল, আশাবাদী আর বিশ্বাসী কবিদের।

যাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন আর ফররুখ আহমদের নাম বিশেষভাবে আলোচিত। এরপর ৪০, ৫০, ৬০ এবং ৭০ এর দশক পেরিয়ে গেল। দুই বিশ্বাসের ধারক হয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে গেলেন দশক উত্তীর্ণ দুই কবি আল মাহমুদ এবং শামসুর রাহমান। আশির দশকে এসে বিশ্বাসী কবিদের প্রবল দাপট শুরু হলো আবারও। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, গোলাম মোহাম্মদ, তমিজ উদ্দিন লোদী, বুলবুল সরওয়ার প্রমুখ। আশির দশকের এই যে জোয়ার এর প্রধান গতি সঞ্চারক হলেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তাদের জোয়ারের যে ঢেউ তার প্রবাহ তারা ছড়িয়ে দিতে

www.pathagar.com

পেরেছেন, একবিংশ শতাব্দীর সূচনা দশক পর্যন্ত। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বিশ্বাসী চেতনার কয়েকটি উদাহরণ এখানে আলোকপাত করা দরকার। তার গানে তিনি লিখেন-

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ/নেই কেহ নেই আল্লাহ ছাড়া
পাখির গানে গানে হাওয়ার তানে তানে/ঐ নামেরই পাই মহিমা হলে আপন হারা।

ঈমানের পথটাই তাঁর কাছে ছিল আসল পথ। তাই তো তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

আল্ কোরআনের পথ/ সেই পথই আসল পথ

অথবা

আমাদের পথ ঈমানের পথ/জিহাদের পথ ঠিক
এই পথে মোরা চিরনির্ভর/ চিরদিন নির্ভীক।

একটা বিজয় তাঁর বড় আকাঙ্খা ছিল যে বিজয়ে মুছে যাবে গণতন্ত্রের আছে যতো ঝন্‌ঝাট, অবিরাম চলবে অর্থনীতির নান্দিপাঠ-

অনেক বিজয় এসেছে আবার/ অনেক বিজয় আসেনি যে
অনেক বিহান হেসেছে আবার/ অনেক বিহান হাসেনি যে।
[-অনেক বিজয়ঃ নিষন্ন পাখির নীড়ে]

সেই চূড়ান্ত বিজয় দেখার জন্য উন্মুখ চেয়ে থাকা ছিল কবি মতিউর রহমান মল্লিকের। তার দৃঢ় সংকল্প ছিল কুরআনের আলোয় দীপ্ত সেই মঞ্জিলে তাঁর যাওয়া চাই। ' অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্য গ্রন্থের ''মঞ্জিল'' কবিতায় তাঁর সেই আকুতি-

আর কত দূরে কত দূরে আর মঞ্জিল আমার/ সেই ইঙ্গিত মঞ্জিল আমার
আল্ কুরআনের দীপ্ত মঞ্জিল পাওয়া চাই/ যত দূরে যাক তবু যে আমার মঞ্জিলে যাওয়া চাই।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রেরণার উৎস ছিল আল্লাহর রসূলের সাহাবী কবি আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা), কবি হাসসান বিন সাবিত (রাঃ), কবি কাব বিন মালিক (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী কবি এবং সর্বোপরি রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)।

হাসসান বিন সাবিতের অলৌকিক স্বর্ণালংকার/আমি দেখেছি এবং
আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার অশ্বারোহণও/ সমবেত সূর্যমন্ডলী তাকে অতিক্রম করতে পারলো না।
[সন্নিহিত না'তের পঙ্‌ক্তি বিশেষ- নিষণ্ন পাখির নীড়ে]

জীবন যেমন যাজ্জ্বল্যমান মরণেও তেমনি তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই অনুভূতির অমর প্রকাশ তার ''মিনার'' কবিতায়-

জীবনের মতো মৃত্যু কামনা করি/ বেঁচে রবো আমি ইতিহাস ভালবেসে
আমি তো পালাবো উধাও ধূসর রাতে/ বাঁচার দলিল বেঁচে রবে প্রাণে প্রাণে।
[-আবর্তিত তৃণলতা]

সত্যিই তিনি ইতিহাস হলেন। জীবন যেমন বেঁচে থাকে পৃথিবীর পরে তেমনি বেঁচে রইলেন কবি, গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি সেই মৃত্যুর স্বাদই পেলেন যেই মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে বাঁচার দলিলের মত যুগের পর যুগ ধরে বাংলাদেশের লক্ষ কোটি কবিতা প্রেমিক বিশ্বাসী মানুষের প্রাণে প্রাণে।

www.pathagar.com

মল্লিকের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা ভিন্ন

আসাদুল্লাহিল গালিব

আকাশচুম্বি মর্যাদার অধিকারী কোনো ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিছু লেখার সূচনা করার যে বিড়ম্বনা তা বুঝি আমার মতো অলেখকেরা ভালই টের পেয়েছেন। একজন মানুষ যাকে পৃথিবীর হাজারো বিশেষণ দেয়া হোক না কেন, সম্ভবত কারো পক্ষ থেকে কোন আপত্তি আসবেনা। তাঁর মতো মানুষকে একান্ত আপন করে নেয়ার যে প্রবল ক্ষমতা বুঝি আর নেই। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে মিশেছেন অকপটে স্বীকার করেছেন- "আমাকেই তিনি অধিক ভালোবাসেন"। এই ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা ছিলনা। নিজের শক্তি-সামর্থ উজাড় করে দিয়েছেন সকলের জন্য। কোনো সীমাবদ্ধতা তাকে স্পর্শ করেনি।

তাঁর প্রবল ইচ্ছা শক্তির কাছে হার মানতো যেকোনো বাধা। মানুষ ছুটে যেতো জীবনের বাঁকে বাঁকে সৃষ্ঠ সমস্যার সমাধান পেতে। তাৎপর্যপূর্ণ অথচ অসঙ্গতি নয় এমন সব সমাধান পেয়ে যারপর নাই খুশি হতো সকলে। কতটা মানব দরদী হলে এই অনন্ত চারিত্রিক বৈশিষ্টে উঠা সম্ভব! তাইতো আজও একজন জীবিত মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে মৃত কবি মল্লিকের তফাৎ খুবই সামান্য।

বহুমুখী প্রতিভার সংমিশ্রণ ঘটেছিল মানবতাবাদী এই কবির মাঝে। কেউ তাকে ডাকে গানের পাখি, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার অথবা ইসলামী সংস্কৃতির রূপকার। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা ভিন্ন। একজন কবি আবার একজন ভাল সংগঠক, একজন সাংস্কৃতিক কর্মী আবার একজন দায়িত্বশীল, একজন শিল্পী আবার একজন আনুগত্যপরায়ন, একজন সাহিত্যিক আবার আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক, একজন গান-পাগল আবার একজন দানশীল। তাঁর মাঝে এসবের যে চমৎকার সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, তাই তাঁর উচ্চতার মানদন্ড।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে থেকেও প্রতিটি আন্দোলনে সব সময় তিনি ছিলেন নিবেদিত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো- তার মতো মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। তিনি ছিলেন অসম্ভব ধৈর্য্যশীল ও পরমত সহিষ্ণু একজন মানুষ।

একজন নিষ্ঠাবান মল্লিক:

মল্লিক সবসময় নিজেকে একজন চাকরিজীবী ভাবতেন। তার চাকরির ক্ষেত্র অন্যান্য চাকরির মতো ছিলনা। তারপরেও তিনি অফিসিয়াল ডেকোরাম মেনে চলতেন, সবকাজ সঠিক সময়ে করার চেষ্টা করতেন। তার চাকরির কর্মঘন্টা সকাল ৯টা থেকে শুরু হলেও শেষের সীমা ছিলনা। সারা দেশ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের পদচারণায় মুখরিত থাকতো

www.pathagar.com

সেই ৫/৫ গজনবী রোডের প্রত্যাশা প্রাঙ্গন। আন্দোলনের কর্মীদের সুখে-দু:খের সাথী কবি মল্লিক। যার কাছে গিয়ে উজাড় কথা বলতেন সবাই। তারই গানের ভাষায় " যার কাছে মন খুলে বলা যায়....." তিনি যেন এক ইউনিভার্সাল গার্ডিয়ান।

সেই ২০০৪ সালের বর্ষাকালের কথা। ঢাকা শহর তখন পানির নিচে। নিচু এলাকায় গলা-পানি। শহরের রাস্তা দিয়ে নৌকা চলাচল করছে। টানা বৃষ্টিতে চারি দিক থই থই করছে। এমনই এক সকালে কাক-ভেজা কবি মল্লিক প্রত্যাশা'র গেটে কড়া নাড়ছেন। দু'হাতের দশ আঙ্গুল প্রসারিত করে টান টান করে রেখেছেন। একটু বাড়তি তাপ অনুভবের জন্য। শরীরে প্রচন্ড কাঁপুনি শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, চাচা প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে সাঁতার কেটে না আসলেও তো পারতেন? মল্লিক উত্তরে বললেন, আমি তো আমার রিযিক হালাল করে নিতে চাই। বৃষ্টির জন্য আমি যদি অফিসে না আসি তাহলে অন্যরা উদাসিনতা দেখাবে। এতে আমিতো নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবো, পক্ষান্তরে ঐ মানুষটিকে অন্যায়ে উদ্বুদ্ধ করার দায়েও অপরাধী হবো।

খাঁটি সংগঠক:

কোন কিছু নতুন করে শুরু করতে হলে যথাযথ পরামর্শ কবি মল্লিক ছাড়া হবে না। এটা যেন আমাদের সাংস্কৃতিক ও আন্দোলনের মানুষদের নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে ব্যাপ্তি পেয়েছিল তার পুরধা ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তবে তিনি আড়ালে থেকেই এসব কাজ করতে বেশি ভালোবাসতেন।

একটা নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে? কী ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে তার আপদমস্তক বহু সংগঠনের পিতা অভিজ্ঞতার ঝুড়ি থেকে বলেদিতেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে মূল আন্দোলনের নেতাদের মাঝে যে লঘূ চাপ ছিল সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তিনি। তাই এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়ের জুড়ি ছিলনা। সারা দেশের সাংস্কৃকতিক সংগঠন গড়ে তুলতে রাতের পর রাত নির্ঘুম থাকতেন মল্লিক। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন বিভিন্ন এলাকায় সংস্কৃতিকেন্দ্র। যেখানে একজন সংগঠক পেয়েছে তাকে দিয়ে সংগঠনের একটা কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। শুধু গঠন করেই তার দায়িত্ব শেষ হতো না, সবসময় নিজ দায়িত্বে মনিটরিংও করতেন।

তিন পেশায় লোক তৈরির চেষ্টা: সামাজিক দায়িত্ব বোধ থেকে মল্লিক আন্দোলনের ভাইদের সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে কয়েকটি পেশায় খুবই উদ্বুদ্ধ করতেন। মফস্বল এলাকা থেকে সদ্য ছাত্রজীবন শেষকরা দায়িত্বশীলরা ঢাকায় চাকুরিরর জন্য মল্লিকের পরামর্শ নিতেন। মল্লিক যে কোনো ভাবে তাকে আপন করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বলতেন " হায়দার! তোমার মতো অনেক হায়দার ঢাকায় আছে, কিন্তু ফকিরহাটে তোমার প্রয়োজনীয়তা অনেক। তুমি ঢাকায় এসোনা। এলাকায় যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢোকার চেষ্টা কর" শুধু এক হায়দার নয়, এ রকম হাজারো হায়দার রয়েছেন যারা মল্লিকের পরামর্শে এলাকায় শিক্ষকতা বা আইনজীবী পেশায় মান-ইজ্জতের সাথে ভাল আছেন। আর আন্দোলনেও ভূমিকা পালন করছেন। মানুষের উপকারে আসে এ ধরণের পেশাকে তিনি খুবই গুরুত্বেও সাথে দেখতেন। তাইতো যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষকতা, আইনজীবী ও ডাক্তার বানানোর জোর প্রচেষ্টা চালাতেন তিনি।

www.pathagar.com

উদাসিন মল্লিক:

মল্লিক নিজের ব্যাপারে বড়ই উদাসিন ছিলেন। কোন কিছুই নিয়ম মেনে করতেননা। আড্ডা বাজিতে ওস্তাদ মল্লিক দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন কথা বলেই। সে কথা সূর্য অস্তমিত হলেই থেমে যেতো না। এর সীমা ছিল গভীর রাত পর্যন্ত। মাঝে হয়তো বাসায় একটা ফোন করে দিতেন যে আজ বাসায় ফিরবেন না। এভাবে অনিয়মিত খাবার গ্রহণ, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী না চলায় নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছেন। পরিশ্রমকে তিনি হাসি দিয়ে আলিঙ্গন করে নিতেন। বাগেরহাটে দায়িত্বপালন কালে রাত জেগে, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে কাজ করেছেন। খাবার হিসেবে সাথে রাখতেন শুধুমাত্র চিড়ার পুটলি। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা পেটে পথ চলেছেন। এভাবে অনিয়মিত পথ চলায় বড় রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। শুনেছি, পানি না খাওয়ায় কিডনির সমস্যা হয়। কিন্তু মল্লিক প্রতি খাবারের সময় কমপক্ষে আধা লিটারের দুই গ্লাস পানি খেতেন। দুপুরে দীর্ঘদিন যাবৎ খেয়েছেন পানির নাস্তা- মল্লিকের ভাষায় পানির জাউ।

প্রচারবিমুখ এক সৃষ্টিশীল মানুষ:

সব সৃষ্টির ফাউন্ডারের ভূমিকায় পাওয়া যেতো মল্লিককে। নিজেকে যতটা আড়ালে রাখা যায় তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করতেন সমসময়। নিজেকে কখনো জাহির করার মানসিকতা ছিলনা তার মাঝে। সংস্কৃতিকেন্দ্রের অনেক অনুষ্ঠান হতো- কিন্তু তিনি প্রচারমুখী কোনো ভূমিকায় থাকতেননা। অনুষ্ঠানগুলোতে সভাপতিত্বও করতেনা তিনি। অন্যকে বেশি সম্মানিত দিয়ে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যে হাসিলের চেষ্টা ছিল তার চরিত্রের মাঝে। নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করে দেয়ায় ছিল তার স্বার্থকতা। নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নিজেকে এগিয়ে রাখতেন। তরুণ কবি, শিল্পী, লেখক তৈরির অদম্য বাসনায় বিভোর ছিলেন তিনি। তরুণ লেখকদের উৎসাহ দিতে সাপ্তাহিক-মাসিক প্রোগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতেন। অনেক সময় পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন সম্মানি হিসেবে। তিনি ছিলেন- আপদমস্তক একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। কোন অনুষ্ঠানে গেছেন- শ্রোতাদের পক্ষ থেকে গান গাওয়ার আবদার কমন বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কবিতা আবৃতি শোনার দর্শকের সংখ্যাও কম ছিলনা। এমনও দেখা গেছে, অনুষ্ঠানের স্টেজে বসেই কবিতা লিখে তা থেকে আবৃতি করছেন। একজন গীতিকার হিসেবে কবির জুড়ি ছিলনা। নতুন নতুন সুরের ঝংকার শোনা যেতো তার গীতে।

সরল মানুষ:

কোনো ধরণের জটিল বা কুটিল প্রকৃতির মানুষ নন তিনি। তার আশ-পাশের কুটিল মানুষদের চিনতেন তিনি কিন্তু কখনো বুঝতে দিতেননা যে তিনি তার আসল রূপ চিনেন। তার পোশাক-আশাক চলাফেরা, কথাবার্তায় সরলতার প্রতিচ্ছবি ভেসে আসতো। দু'একটি দামি পোশাক উপহার হিসেবে পাওয়া ছাড়া নিজে কখনো দামি পোশাক কিনতেননা। নিজে যে টাকা বেতন পেতেন তার অধিকাংশই মানুষের সাহায্যে ব্যয় করতেন। এ জন্য মল্লিকের দরবারে এ ধরণের সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যার অভাব হয়নি কখনো। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল- যাদের হাত পাতাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিলো, তাদেরও কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না তিনি।

www.pathagar.com

রসিকতা:

এনটিভির দাদুভাই কবি মল্লিক। রমজান উপলক্ষ্যে শিশুদের ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষামূলক দিক নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের দাদুভাই হিসেবে উপস্থাপক ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে মল্লিকের ছেলে মুন্নার বয়সী শিশু-কিশোররাই তাতে দাদু ভাই বলে সম্বোধন করতো। দাদু ভাই মল্লিক তার ছেলের মাঝে এ নিয়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। দাদু ভাই স্টুডিও যাওয়ার আগে বারবার আয়নায় দেখতেন যে, প্রকৃত দাদু ভাইয়ের মত লাগছে কিনা! এ বিষয়ে মজার ছলে তিনি বলেন, " চাচা তোমার চাচিতো এখন আর আমাকেই পাত্তা দেয়না" কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, দাদুভাই চরিত্রে আসার পর আমি নাকি তার কাছে বেশি বুড়ো মনে হয়। সে এতোদিন বুঝতে পারেনি যে, আমি কতটা বুড়ো হয়েছি কিন্তু এখন সে এটা অনুভব করছে।

মল্লিকের ভালোবাসায় সিক্ত বাগেরহাটের কিছু মানুষ:

মল্লিক তার ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছেন হাজারো মানুষের হৃদয়। যে তার কাছে যেত, সেই ভাবতো মল্লিক তাকেই বেশি ভালোবাসে। যার অন্যতম কারণ ছিলো- মল্লিক ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে কাউকে ভালোবাসতো না।

বাগেরহাটে মল্লিকের খাদহীন ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন মুজিব দাদা (অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান), ফকিরহাটের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার, অধ্যাপক হায়দার আলী। আর মল্লিকের ভাষায় কাজ পাগল মানুষ ছিলেন পাইকপাড়ার শাহ আলম ও মোতালেব। মাও: আশরাফ তার বাল্যবন্ধু। এসব মানুষের সাথে তার অনেক স্মৃতি জড়িত। আর ফকিরহাটের আন্দোলনের নেতা হিসেবে অধ্যক্ষ ইউনুস আলীকেও তিনি অনেক ভালোবাসতেন। ঢাকায় মল্লিকের উ-কি-ল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এ্যাড. শামছুজ্জামান।

এই মানুষটি ঘিরে আমার স্মৃতির অন্ত নেই। তিনি অনেকের মতো আমার জীবনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন। এই জীবনে তার অবদান বলেও শেষ করতে পারবো না। একটি সৎ পরামর্শ ও কিছু সময়ের জন্য হাল ধরে অনেককে পার করিয়েছেন তিনি। পৃথিবীতে এখন এই মানুষটি নেই। কিন্তু তিনি আলাদা একটা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বেঁচে রয়েছেন আমাদের মাঝে। তার একটি উপদেশ ছিল- "চাচা! যেখানে থাকোনা কেন সবচেয়ে অসহায় মানুষটির পাশে থাকবে, মজলুম মানুষের পক্ষ নিবে" এ ধরণের অনেক উপদেশ সমাজের চলাফেরায় পাথেয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার একটি উপদেশ মানতে বারবার হোঁচট খেয়েছি। তিনি বলতেন, অভিমান করো না? পারতাম না। পারতো না মল্লিক নিজেও। তাইতো মাঝে মাঝে বাগেরহাটে গিয়ে নিরুদ্দেশও হয়ে যেতেন তিনি। একদিন বললাম পারিনা কেন চাচা? জবাবে যে কথাটি ভেসে আসলো তা হলো- "আমরা যে বাগেরহাটের মানুষ"।

লেখক : সভাপতি, বাগেরহাট ছাত্র ফোরাম।

www.pathagar.com

মল্লিক ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়ের একটি দিন

মারুফ আল্লাম

২০০০ সাল। সে বছর আমি প্রথম ঢাকায় আসি। ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন। এক বুক আশা নিয়ে আব্বা আমাকে ঢাকা নিয়ে এলেন। শিল্পী তারেক মুনাওয়ারের আহ্বানে এটিএন বাংলায় কিছু গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম আমি। তবে আব্বার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল: সুরকার মশিউর রহমানের হাওলায় আমাকে তুলে দিয়ে একটা এ্যালবাম করা যায় কিনা, সেটা যাচাই করে দেখা।

সুরকার হিসেবে মশিউর ভাইয়ার খ্যাতি তখন তেমন একটা শুরু হয় নি। উনি চাকুরি করতেন সাইফুল্লাহ মানসুরের সিএইচপি'তে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে। কোনো এক শুক্রবারের সকালে আব্বা আমাকে সিএইচপি'র অফিসে নিয়ে গেলেন। এক ঝাঁক শিশু-কিশোরকে সেখানে গান শেখাচ্ছিলেন মশিউর ভাইয়া। আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম। যে গানটা শেখানো হচ্ছিল, একটু পর সে গানটা আমাকে গাইতে বলা হলো। আমার কণ্ঠ শুনে মশিউর ভাইয়া আমাকে পছন্দ করলেন হয়তো। আমাকে ঢাকায় তার কাছে রেখে আব্বাকে বাড়িতে চলে যেতে বললেন উনি। উদ্দেশ্য একটা ক্যাসেটে আমাকে দিয়ে কয়েকটা গান করানো।

'উঠল দুলে প্রাণ' নামের একটি এ্যালবামে বেশ কয়েকটা গান আমি গাইলাম সেবার। এরই মাঝে শহীদ আব্দুল মালেক ভাইকে নিয়ে একটি অডিও ডকুমেন্টারি বের করার উদ্যোগ নিল সিএইচপি। মালেক ভাইকে নিয়ে জাকির আবু জাফরের একটা গান সেসময় সুর করছিলেন মশিউর ভাইয়া। গানটা সুর করা শেষ হলে তিনি আমাকে দিয়ে এটি গাওয়াবেন বলে মনস্থির করলেন। আমি যথাসম্ভব আবেগ দিয়ে গানটা গাইবার চেষ্টা করলাম এবং সফল হলাম। গানটার রেকর্ডিং হলো।

সেবারের ঢাকা মিশনের সময়সীমা শেষ হয়ে আসছিল। একদিন মশিউর ভাইয়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোনো একটা প্রোগ্রামে অংশ নিতে 'প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে' যাবেন। সাথে আমাকেও নিলেন। প্রত্যাশা প্রাঙ্গন তখন মোহাম্মদপুরের গজনবী রোডে। আমরা সেখানে সকাল ১০টায় পৌঁছলাম। আমাকে অন্য একটি রুমে রেখে মশিউর ভাই প্রোগ্রামে ঢুকলেন। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু উনাদের প্রোগ্রাম শেষ হচ্ছিল না। ক্ষুধায় আমার পেট চো চো করছিল। এক পর্যায়ে মশিউর ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রোগাম হচ্ছিল যে রুমে, সেখানে। সেখানে মল্লিক ভাই, তফাজ্জল হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজসহ আরো বড় বড় কবি-শিল্পী ছিলেন। মল্লিক ভাইয়ের সাথে সেটাই আমার প্রথম দেখা ছিল না। এর আগে তিনি রংপুরে সাংস্কৃতিক সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তার সাথে আমার পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। তবে উনি আমাকে সেভাবে মনে রাখতে পারেন নি। যাই হোক, প্রোগ্রামে

www.pathagar.com

নিয়ে গিয়ে মশিউর ভাই সবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর আমাকে মালেক ভাইয়ের সেই গানটা গাইতে বললেন। ক্ষুধা পেটেই গাইলাম গানটা:

আমাদের বুকে লেখা মালেকের নাম
হৃদয়ের বাঁকে বাঁকে মালেকের নাম
পৃথিবীর কোথাও যে মালেক আজ নেই
তবু যেন নদী হয়ে বহে অবিরাম...।

অতটুকু বয়সেই গান গাইতে গিয়ে কী একটা আবেগে আপ্লুত হতাম আমি! চোখ বন্ধ করে গাইছিলাম। গানের শেষ অন্তরাটা গাইবার আগে একটু চোখ খুলে দেখি, সকলেই অঝোরে কাঁদছে আর চোখ মুছছে! আমার আবেগ আরো বেড়ে গেল! গান শেষ করলাম। আমাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরলেন মল্লিক ভাই! সবার আদরে সিক্ত হলাম আমি! আজো সে স্মৃতি আমার চোখে ভেসে ওঠে!

দুপুরের খাবার আসতে দেরি হচ্ছিল বলে আমার যে কষ্ট হচ্ছিল, সেটা টের পেলেন উনারা। মল্লিক ভাই হেসে বললেন, "অভুক্ত থেকে দ্বীনের সৈনিক হবার ট্রেনিং নিচ্ছ তুমি!"

দুপুরের খাবারের পর মল্লিক ভাই তার অফিসে আমাকে ডেকে নিলেন। একটা বই তুলে দিলেন আমার হাতে। বইয়ের প্রথম পাতায় উনার চমৎকার একটা অটোগ্রাফ। বইটা ছিল কবি জাকির আবু জাফরের "দোয়েল পাখির গান"।

বইটা আজো আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। তার অটোগ্রাফটি দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। তার অটোগ্রাফটা যে বড় জীবন্ত!

www.pathagar.com

গাজী মোনাওয়ার হোসাইন তামিম

বন্ধু আমার এখানেই ছিল এখন এখানে নেই,
পাওয়া যেত যারে, দুই হাত বাড়ালেই।
যারে পাওয়া যেত এক ডাকে দুই ডাকে,
পাওয়া যেত যারে স্নিগ্ধ হাসির বাঁকে।
বন্ধু আমার মাহফিলে গিয়েছিল, ফিরে আসবার কথাও সে দিয়েছিল।
তাফসীর শেষে ফিরেছে সে বহুবার, আবার ফিরেছে, ফিরবেনা কভু আর .....

কবি মতিউর রহমান মল্লিক এভাবেই লিখেছিলেন তার বন্ধু শহীদ মাওলানা গাজী আবুবকর সিদ্দিকের শাহাদত স্মরণে। আজ এ কবিতাটি তার জন্যে ও প্রযোজ্য, কারণ এই অসীম হৃদয়ের মানুষটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর এমন সব কবিতা ও গানের মাধ্যমে চিরদিন আমাদের মাঝে রয়ে যাবেন ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনের এই পথিকৃত।

২০০৪ সালে আমার আব্বু, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শহীদ মাওলানা গাজী আবুবকর সিদ্দিকের শাহাদাতের পর মোবাইলে আমার সাথে প্রথম কথা হয় মল্লিক চাচার। চাচা বলছি কেন? তিনি আমাকে বাপ বলতেন আর আমি বলতাম চাচা। তারপর একদিন মল্লিক চাচা আমাদের বাড়িতে আসেন আমাদের সমবেদনা জানাতে এবং বন্ধুর কবর জিয়ারত করতে । তিনি তার অফিসে যাওয়ার জন্য ঠিকানা দিয়ে যান। তখন আমি ঢাকায় থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং করছি। ৫/৫ গজনবী রোড মোহাম্মাদপুর "প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে" প্রথম যেদিন আমি গেলাম দেখলাম সেকালের একটি ছোট কাঠের চেয়ারে অফিসের প্রধান ব্যক্তি বসা সাদামাটা একটি টেবিলে। যেমনি ছিল তার ব্যবহার তেমনি মেহমানদারী। আমাকে তার সামনের চেয়ারে বসালেন। তারপর অফিসের সকলকে ডাকলেন। বললেন "এই তোমরা অফিসের সব কাজ বন্ধ রাখ এবং সবাই আমার সামনে এসে বস।" অফিসের সব স্টাফকে এনে আমার চারিদিকে বসালেন। বললেন আজ আমি তোমাদের এমন একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যে আমার অনেক প্রিয় মানুষদের একজন। তার সম্মানে আমি আমার অফিসের কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখলাম। এবং তার মেহমানদারির জন্য সবচেয়ে ভাল খাবার আনার ব্যবস্থা কর। আমি তখন ১৭/১৮ বছরের কিশোর নতুন ঢাকা এসেছি। বুঝতে পারছিনা কার জন্য চাচা এসব বলছে। লজ্জায় খুব জড়ষড় হয়ে বসে রইলাম। অনেক চেষ্টা করেও মুখে কথা আনতে পারছিলাম না। মনে মনে প্রস্তুত করছিলাম আর প্রাকটিস করে দু-একটা কথা বলছিলাম, কাপা কাপা কণ্ঠে।

এবার মল্লিক চাচা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন "আমার সামনে যে বসা সে হলো আমার বাপ। উপস্থিত সকলেই আশ্চার্য হয়ে গেলেন সবাই জানতেন এমন ছেলেতো মল্লিকের

www.pathagar.com

নেই। কেউ প্রশ্ন করতেও পারছে না যে কেমন বাপ? কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন "ও আমার আবুবকর ভাইয়ের ছেলে।" আমার আবুবকর ভাই কবে কবে যে আল্লাহর এত কাছে চলে গিয়েছিলেন আমি বুঝতে পারিনি। আজ থেকে ও আমার বাপ হয়ে আমার কাছে থাকবে। আমার চোখ ছল ছল করে উঠল। মাত্র কদিন আগে আব্বুকে হারিয়ে দুনিয়াটা অন্ধোকার দেখছি ঠিক এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন একটি পিতৃতুল্য মানুষের সান্বিধ্য পাইয়ে দেবেন ভাবতে পারিনি। তার পর অফিসের সবাইকে আব্বু সম্পর্কে অনেক গল্প বললেন। আমাকে বললেন "চাচা তুমি সারা দিন আমার সামনে বসে থাকবে। কারণ তুমি যখন আমার সামনে বসে থাকো আমার মনে হয় আমার আবুবকর ভাই আমার সামনে বসে আছে। হাসছে, কথা বলছে।

আমি যদি কখনো চাচার অফিসে আসতে দেরি করতাম তবে খুব অভিমান করে আমাকে বলতেন "বাপ! তুমি জাননা আমার আবুবকর ভাই আমার কতপ্রিয় মানুষ ছিলেন। আল্লাহর কাছে শহীদি মৃত্যুর জন্য অনেক কেদেছি, কিন্তু সেই ভাগ্যটি আল্লাহ তাকে দিলেন।" প্রথম দিন থেকেই আমাকে ছাড়া কখনই দুপুরের খাবার খেতেন না আমার মল্লিক চাচা। সব সময় তার পাশের চেয়ারে বসা থাকতাম যত লোক আসতো সকলকেই আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। বলতেন "ও আমার বাপ" তার পর আব্বুর প্রশংসা করে আমাকে চিনিয়ে দিতেন। অনেক বড় বড় মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার চাচার মাধ্যমে। আমার লেখা পড়ার খোজ খবর, পরিবারের খোঁজ খবর সবকিছুই তিনি করতেন। আর আমাকে ছায়ার মত আগলে রাখতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও গোটা খুলনা বাসীর আশ্রয়কেন্দ্র ছিল প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ অর্থাৎ চাচার অফিস।

আমাকে একদিন ডেকে বললেন আব্বুর জন্য একটি ফাউন্ডেশন কর এবং একটি সংকলন বের করো। আমি সকল প্রকার সাহায্য করব। বাগেরহাটকে বহুবার বলেছি তারা পারলো না নিজের বাপের জন্য নিজেরই করতে হবে। তৎপর চাচার প্রচেষ্ঠায় প্রায় ৪০টি লেখা সংগ্রহ করলাম এবং প্রেসে পাঠানো হলো। প্রুফ দেখা হলো তারপর আমার চাচা অসুস্থ হয়ে যান আর আমি হয়ে যাই ছায়াহীন, অবিভাবক হীন।

প্রত্যেকদিন ইউনির্ভাসিটি শেষে দুপুরে চাচার কাছে গিয়ে চাচার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতাম। আর আব্বুর সাথে তার অনেক গল্প শুনতাম। প্রাণ ভরে যেত মণ ভরে যেত। আল্লাহকে বহুবার বলতম এই কোমল হৃদয়ের মানুষটি না থাকলে না জানি আজ আমি কোথায় যেতাম। এই মানুষটিকে আমার কাছে রেখে দিও প্রভূ।

আব্বুর শাহাদতের পর বিচারের জন্য যখন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মণ খারাপ করে ফিরে আসতাম তখন আমার চাচা আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনা দিতেন অনেক কথা বোঝাতেন। আর আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতাম। প্রত্যেকটি প্রগামে আমাকে নিয়ে যেতেন এবং সকল বড় বড় মেহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমার কলমের শক্তি এতটা প্রখর নয় তাই হয়তো আমি বোঝাতে সক্ষম হচ্ছিনা যে, ১৭ বছরের একটি কিশোর আকষ্কিকভাবে পিতা হারাবার পর তার মানসিক অবস্থা কেমন হয়। ঠিক তখন আমার মল্লিক চাচা আমাকে যেভাবে তার স্নেহদিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তার পাশে রেখেছেন তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না।

হসপিটালে যখন যেতাম পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। তখন আমাকে বলতেন চাচা তুমি এত লোকের সাথে আস কেন। তুমি একা আসবে, সারাদিন থাকবে। সারা দিন

www.pathagar.com

আমি তোমার সাথে গল্প করব। আজ যদি তোমার বাপ অসুস্থ হত তুমি আসতে না। থাকতে না। আমার দুচোখ ভিজে উঠত। বলতেন "মনে রেখ যত কষ্ঠই হোক তোমাকে ব্যারিস্টার হতেই হবে"। আমার আবুবকর ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। ২০০৪ থেকে ২০১০ এ ছয়টি বছর এমন করে আমাকে ছায়ার মত স্নেহ দিয়ে রেখেছিলেন আমার চাচা কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

ইসলামী সংস্কৃতির এই পুরধা ব্যক্তি এত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন যা দেখে হযরত আবুবকর, হযরত ওমরের (রা:) দৃষ্টান্ত মনে পড়ে যায়। মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন সকলের সেরা। বাগেরহাট খুলনা থেকে লোক আসলে এত সম্মানের সাথে তাদেরকে গ্রহণ করতেন আমি আশ্চার্য হয়ে যেতাম। দান ছদকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসামান্য মনের মানুষ। দুহাতে মানুষকে শুধু দান করতেন। পাশে বসে থেকে দেখতাম কত ধরনের মানুষ যে আসত টাকা নিতে, কাউকেই খালি হাতে ফিরাতেন না এবং কাউকেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। যার একটি কবিতা বা গানের জন্য সারাদেশ অপেক্ষা করত যে গানের মধ্যে থাকত খোদা প্রেম, নবী প্রেম, দেশপ্রেম আবার কঠিন থেকে কঠোর ভাষার ছোয়া। পুরো জীবনটাই ছিল তার দ্বীনের জন্য, তার সব কিছুর মধ্যেই ছিল ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ। খুব কাছ থেকে দেখেছি তাকে, পাশে বসে উপলব্ধি করেছি চলেছি এক সাথে। শুধুই মনে হত আল্লাহর নবী বা তার সাহাবীদের তো দেখিনী তবে এমনই ছিলেন হয়তো।

আব্বুর বিদায় হয়েছে আমার কিছু বুঝে ওঠার আগেই। বড় হয়ে পিতার স্নেহ, পিতার সাথে বড় হওয়া, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া পরামর্শ দেয়া কোন কিছুরই সুযোগ পাইনি। আর এই অভাব পুরোটাই মিটিয়েছি আমি আমার মল্লিক চাচাকে দিয়ে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাকে স্নেহ করেছেন বাপের মতই। আজ তার বড় অভাব বোধ করি। যেমনটি বোধ করি আব্বুর জন্য। হয়তো তারা দুজনই এখন একসাথে ফেরদৌসে অবস্থান করছেন। কৈশরের গল্প করছেন। মল্লিক চাচা আমাকে বার বার বলতেন "চাচা তোমাকে এত ভালোবাসি কারণ তোমাকে দেখলে আমার আবুবকর ভাই আমার সামনে ভেসে ওঠে। তাই তো লিখেছিলেন.....

বোমা মেরে মেরে মারুক মোফাস্সীর
বেঁচে রবে তবু পবিত্র তাফসীর।
যুগ যুগ ধরে তাফসীর কথা বলে,
মুফাসসিরেরা হয়তোবা যায় চলে।
আলেমে দ্বীনেরা হয়তোবা চয়ে যায়
সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুর হামলায়
তবু মরবে না অজেয় চির অমর
মাওলানা কাজী শহীদ আবু বকর।

এমনি ভাবেই তার গান ও কবিতার মধ্যে আমাদের মাঝে চিরকাল রয়ে যাবেন গানের পাখি কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

লেখক : সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাগেরহাট ছাত্র ফোরাম।

www.pathagar.com

শাকিল মাহমুদ

কবিতা; ঝড় সাইক্লোন, বন্যার প্রবল উচ্ছাস, প্রখর রোদের তেজ অথবা রিমঝিম বৃষ্টির আমেজ। যুদ্ধের দামামা, পারমানবিক হাতিয়ার থেকে সময়ের জবান হয়ে যায়। ভালোবাসার প্রবল প্রশ্বাস নিয়ে কখনো মালা তুলে দেয় প্রিয়ার গলায় অথবা বিরহী হৃদয় শুরু হয় রক্তক্ষরণ।

একজন কবিই পারেন তার অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে চিরকাল ধরে লুকায়িত সেসব স্বপ্নের আবরন তুলে দিতে। খসখস শব্দে অবিরাম ঝরাতে পারেন মেঘের গর্জন, আগুন। শিল্পের চৌকাঠ দিয়ে মেপে মেপে রস বিলাতে। তবে তা হতে হবে নান্দনিকতার মানদন্ডে। বাংলা কবিতার গতিপথ এখন অনেক দূর। কবিতায় আধুনিক যুগের সারমর্ম গড়েছিলেন মধুসূদন। তারপর এক এক করে নজরুল, ফররুখ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ। যদিওবা এক্ষেত্রে মান্নান সৈয়দ একজন সাহিত্য সমালোচক হিসেবেই বেশী আলোচিত। এক্ষেত্রে রবীঠাকুরকে উচ্চতর সিংহাসনে বসিয়ে দেন অনেক রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক। সে যাই হোক- তাদের সূচনার এক শতাব্দীকাল পরে বাংলা কবিতা এখন আন্তজার্তিক মানদন্ডে উন্নিত। চর্যাপদের কাহ্নপা থেকে শুরু করে আজকের প্রথম দশকের কবিদের পদচারনা সবকিছুই সময়ের সময়ের নান্দনিকতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। যখন সৈয়দ আলী আহসান বলে ওঠেন-

আমার স্বাধীনতা মৌসুমী বায়ূর প্রত্যুষ/ এবং একজন প্রাচীন মরুভূমির সিদ্ধপুরুষ/ যিনি গুহা থেকে প্রান্তরে নেমে মেষগুলোকে রক্ষা করেছিলেন/তার কুয়াশা তুষার চোখের গভীরে একটি কৌতুক খেলা করেছিলো/

আবার বিচিত্র অনুসঙ্গ নিয়ে কবি আল মাহমুদকে বলতে শুনি-

কবিতা তো মক্তব্যের খোলা চুল মেয়ে/ আয়েশা আক্তার/
আব্বুর সাইকেলের ঘন্টাধ্বনি/ আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিনের বাহুকপাট।

আল মাহমুদকে আমরা সবাই এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিতাকর্মি হিসেবেই জানি। এই বয়োবৃদ্ধ কবিতাকর্মিই একদিন আমাদের কাছে গল্পচ্ছলে ঘোষনা দিয়েছেন, নজরুলের পরে যদি কোন সব্যসাচি সাহিত্যকর্মির ইতিহাস লিখতে হয়, তবে নি:সন্দেহে সেটা কবি মল্লিক। ১৯৫৬ সালের ১ লা মার্চ বাগেরহাটে জন্ম এই কবির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ ৫৪ বছরের দীর্ঘ পরিভ্রমনে এ কবি তুলে এনছেন বহুরুপী শব্দের বাধন। শব্দে শব্দে বিয়ে দিয়ে কবি গড়ে তুলেছেন শব্দপ্রবাহ। গানের ব্যঞ্জনা, কথাসাহিত্য এবং পরীক্ষিত কিছু কবিতার পঠন। তার

www.pathagar.com

মাঝে উল্লেখযোগ্য হল ফলক কবিতা। ছয় লাইনের এ কবিতার গঠনটি চমৎকার। প্রথমে ব্যবহৃত দুই মাত্রার একটি শব্দ এবং এ শব্দের সাথে মিলিয়ে তৃতীয় লাইনে একটি অন্তমিল। ঠিক এরকম-

নারী !/ কখনো খনো চৈত্রের দাবদাহ/ কখনো কখনো আগুনে বানানো শাড়ী/ নারী!? কখনো কখনো বসন্তকাল/ অনন্ত কোন আনন্দ সঞ্চারী। /

একাধারে তিনি লিখে গেছেন গান, কবিতা, কথাসাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ সবকিছুই। সত্তুর দশকে তার হাতেখড়ি হলেও সাহিত্য বিচারে তাকে আশির কবিদের কাতারেই বিবেচনা করা হয়। আশির দশকের অন্য কবিদের গন্ডি থেকে বের হয়ে সম্পূর্ন ব্যাতিক্রম এ কবি। তিরিশের কবিরা মূলত বাংলা কবিতায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের আবহ, ঢং বা স্টাইল পরিবর্তনের কাজ চালিয়েছেন এবং অন্যদিকে রবীন্দ্র বলয় ভেঙ্গে ছন্দের বারান্দা ভেঙ্গে গদ্য কাব্যভাষা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। চল্লিশের ফররুখ, জীবনান্দ, পঞ্চাশের আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দিন, শামসুর রাহমান আর ষাটের আব্দুল মান্নান সৈয়দ। তবে এদের গন্ডি থেকে বের হয় বৃহত্তরের স্বপক্ষে মৌলপুষ্প অর্পন করেছেন আশির কবিরা। আশির কবি বুলবুল সারওয়ার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, হাসান হাফিজ, আবদুল হাই শিকদার, হাসান আলীম, মুকুল চৌধুরী, আসাদ বিন হাফিজ, সোলায়মান আহসান, নাসির হেলাল, মোশাররফ হোসেন খান, আশরাফ আল দীন ও মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ। তবে এসব কবিদের মাঝে ব্যাতিক্রমী একজন, সে হলেন, মতিউর রহমান মল্লিক। নজরুলের পরবর্তীতে মূলত গীতি কবিতায় সিদ্ধহস্ত একমাত্র কবি বলা যায়, মল্লিককে। কথায় কথায় গান বেধে ফেলার কী এক আশ্চার্য্য ক্ষমতা ছিলো, মল্লিকের। মৃত্যুর ২ বছর আগে লেখা তার একটি কবিতা, তখন পুরো দেশ ও দেশের বাইরে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো। সেটা হলো 'পঙ্গপাল গীতিকা-২০০৮'।

কোন আঁধারের গহবর থেকে /অন্ধ পঙ্গপাল/
উড়ে এসে জুড়ে বসে ফসলের/ ক্ষেত করে পয়মাল।
ধান খেয়ে যায় পান খেয়ে যায়/ গান খেয়ে যায় প্রান খেয়ে যায়/
পাট খেয়ে যায় মাঠ খেয়ে যায়/ ভাঁট খেয়ে যায় ঘাঁট খেয়ে যায়।/

-'পঙ্গপাল গীতিকা-২০০৮'

ফখরুদ্দিন আমলের বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে এভাবেই কবি জানিয়েছিলেন, তার প্রতিবাদ লিপি। দীর্ঘ ব্যঞ্জনা দিয়ে কবি তার কবিতার গাঁথুনী দিয়ে সাজিয়েছেন এ কবিতাটি। যা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। নজরুলের পরবর্তীতে জাতির সুরের কোকিল হয়ে তিনি আধুনিক রুপকল্পে আরও আধুনিক কাব্যভাষার গান লিখে চলছেন অনবরত। মল্লিক গানে যতটা খোলামেলা, চিত্রময় কবিতায় ততটা গাঢ়বদ্ব। গদ্য কবিতায় স্বাচ্ছন্দ প্রিয় এ কবির গদ্য কবিতাই বেশী। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্তের পয়ার ছন্দ ও মুক্তক অক্ষরবৃত্তে ও সিদ্বহস্ত এ কবি।

মনোমুগ্ধকর এবং নতুন নতুন চিত্রকল্পে।পরও যাদু আছে তার কবিতায়। যেমন-

তারপর শিশিরের অজস্র চাদরের ভেতর থেকে/ জেগে ওঠে স্বপ্নের গাছ এবং মৌমাছির মত/ অগনিত স্বর্ণের ঘের।/

www.pathagar.com

অথবা 'আর এক সূর্য্যের গান' কবিতায় তিনি লিখেছেন- নদীও তাকে প্রেম প্রেম বলে ডেকে উঠলো/ সমস্ত পৃথিবী তাকে বেঁচে থাকার/ সর্বশেষ অবলম্বন বলে আহবান জানালো/

বিচিত্র সব চিন্তা আর নান্দনিকতা ভরা তার কবিতায়। যেমন তিনি তার 'বস্তির মধ্যে' কবিতায় লিখেছেন-

আর অগ্রন্থিত নদীসিকস্তী মানুষের চরাচর/চরাচরে ছিলো-/
এক একটি সার্বভৌম লুঙ্গি/ এক-একটি সার্বভৌম গামছা/
এক-একটি সার্বভৌম শাড়ী/ এক-একটি সার্বভৌম ব্লাউজ/
এক-একটি সার্বভৌম/ ছোট খাটো খেলনা।

এ যাবত কবির প্রকাশিত কবিতার বই পাঁচটি। অনবরত বৃক্ষের গান, আবর্তিত তৃণলতা তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, চিত্রল প্রজাপতি এবং নিষন্ন পাখির নীড়ে। ছড়ার বইয়ের মধ্যে রয়েছে- রঙিন মেঘের পালকী। গানের সংকলনও রয়েছে। কবির প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার বইই মূলত দেশপ্রেম এবং চিরায়ত মূল্যবোধের অনুষঙ্গে রচিত। প্রকাশিত কবিতার বই বাদেও মৃত্যুর আগে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলো ৮/১০ টি পাণ্ডুলিপি। কবির বিচার তার সৃষ্টিকর্ম এবং তার নির্মিত স্বকীয় কাব্যভাষাই প্রমান করে কবির শক্তিমত্তা। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বেশ কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত কবি মল্লিকের কবিতাগুলা সময়ের নান্দনিকতার বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কবির ' তোমাকে নিয়ে' কবিতাটির ভাষা এরকম-

খুব বেশী আকাশ হয়ে যাচ্ছো তুমি/ মেঘ এবং বিদ্যুতের মতো সংঘর্ষ/ তোমাকে ছাড়বে না/
খুব বেশী বটগাছ হয়ে যাচ্ছো তুমি/ ঝড় এবং বজ্রপাত তোমাকে ছাড়বে না।/

আমরা যে ঘরে বসবাস করি তাকে বলা হয় বাসা আর প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হলেই তা হয়ে ওঠে ভালোবাসা। এই বাসা এবং ভালোবাসা নিয়ে কবির চিত্রকল্পটি ঠিক এভাবে প্রকাশ পেয়েছে-

একটু ভালোবাসা, একটি ভালো বাসা/
পরিবার-পরিজন, কে করে না আশা?/
পাখিও মনের মতো ভালোবাসা চায়/
ভালো বাসা সকলের ভালোবাসা পায়।/

কবি যেমন ভাবেন নতুনের তেমনি সাজিয়ে তোলেন তার সৃষ্টি। প্রবাদ, প্রবচনের মতো মাত্র দুই চরনের কবিতা। নাম দেয়া হলো- 'ছোট্ট কবিতা'। কবিতার ভাষা এরকম-

কার তুলিতে এমন কারুকাজের/ অপরুপ দৃশ্য এসে হাজের/

অথবা কবির এরকম আরও একটি উপমা-

আল মাহমুদের ভাঙ্গা স্যুটকেস/ তার ভাঙ্গা স্যুটকেসের মধ্যে ছিলো আস্ত (একটা) বাংলাদেশ। /

মানুষ যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আবেগে ঘোরপাক খায় তেমনি তার অনুভূতিগুলোও বিভিন্নরুপে প্রকাশ পায়। আর কবিমাত্রই তার সে আবেগ সাজিয়ে তোলেন উপমায়। তার সে কবিতাগুলা প্রকাশ হয় এভাবে-

www.pathagar.com

যে ভাষার টানে মানুষ হয়েছে আগুন/
আগুন হয়েছে মিছিলের লেলিহান/
লেলিহান খুঁজে এনেছে বজ্র-প্রপাত/
(-শিমুল আগুন এবং ভাষার উ"চারন)

আবার এই উদ্বিগ্ন আগুনকে দমানোর আওয়াজ দিলেন সাম্যের কবি-

এবং আগুন চেপে রাখার/
কতটুকুই বা ক্ষমতা রাখে/
একটি নিয়মিত পাহাড়?/ একটি ধারাবাহিক সাগরও কী পারে?/
সমগ্র আগুনের সকল কিছুই/
হাত নাড়িয়ে বিদায় না দিতে?/
অথচ একজন বেদনাবিদ্ধ /
মানুষেরই কেবল আছে/
সমস্ত আগুন চেপে রাখবার মতো/
অসং সক্ত ক্ষমতা/
(-আগুন চেপে রাখার ক্ষমতা)

সৈয়দ আলী আহসানের প্রমিত কাব্যভাষার মতই তার সরব প্রকাশ-

পাতার আকাশ দেখে মন দেয় দীর্ঘায়ূ খুব/
মারাঙা চোখ ভোলে নির্নিত ডুব/
(বৃক্ষঃ সেই পথ)

বসন্ত দিনে যেমন ধুঁয়ে মুছে যায় মনের আকাশ। কবিও নির্ভাবনায় ছন্দ তালে গেথে যান মালা এভাবেই।-

ছন্দে ছন্দে দোলে মন-অন্তর/
আনন্দে জড়ালো গো পথ-প্রান্তর/
ভ্রমরের গুনগুন গুঞ্জরনের /
কবিতা ভরিয়ে দিলো কুঞ্জবনের/
নিবিড় নীড়ের ছায়া, বীথিকা আ-শেষ/
(-রঙে রঙে বাসন্তী)

২০০৭ সালের ভয়াবহ সিডর মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে, ব্যথার জোয়ার। মর্মার্থ কথার গাথুনি দিয়ে ১শ ২৬ চরণে কবি মল্লিক তার 'সিডর' কবিতায় যে দৃশ্যকাব্য নির্মাণ করেছেন, তা অসাধারন-

বৃক্ষ উজাড়/
দুমড়ে-মুচড়ে গেছে বণভুমি/
ভার বইবার নেই সেই প্রকৃতিও/
অবিরাম কান্নার/
হরিণ চিত্রা নেই/
বাঘ বিচিত্রা নেই/

www.pathagar.com

থেমে গেছে কবে/
বণ মোরগের ডাক/
অজানা কত যে প্রানী/
গিলে গিলে খেল ক্রুর বিষখালী বাঁক/
(-সিডর)

অথবা বিপর্যস্ত একটি প্রকৃতির আর্তনাদ তার মাঝে ফুটেছে এভাবে-

সু-সজ্জিত সে-সুন্দরবন/
সাগর- মেখলা, নদী- বিধৌত /
আমার জন্মভূমি/
কোথায় নম্র নয়নাভিরাম নীড়-মৃত্তিকা মূল?/
কঠোর সিডর/ নিয়ে গেছে সব স্বপ্নের মৌসুমী/
(-সিডর)

জীবন যন্ত্রনা কবিকে হতশ করেনি, আবারও স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। তার ভাষায়-

তবুও এ মাটি হবে আরো উত্তম/
তবুও এ ঘাঁটি দেবে আরো উপশম/
ভাটি বাংলার আকাশে উড়বে/
পূর্নিমা চাঁদ, শুক্লা দ্বাদশী চাঁদ/
জোসনা সরাবে সকল আঁধার/
আঁধারের সব বাধ/
(-সিডর)

স্বাধীনতা; আমার দেশ আর মাটি এবং মানুষকে নিয়ে আজ চরম ষড়যন্ত্রের ধ্বণি বেজে উঠছে প্রতিটি সকালে। এই ক্রুর হাসি বন্ধে কবি লিখেছেন তার স্বপ্নের কথা-

এই অন্ধকার বিশ্বাসিত আকাশের পরপার থেকেও/
নামতে পারতো/ কিন্তু তা না নেমে/
এই অন্ধকার একটি কেন্দ্রীভূত অবস্থান থেকে /
লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে/ এই বির্গহ অন্ধকার বহু দূর দেশ থেকে এসে/
অথবা কোন নিকটতর প্রতিবেশ থেকে এসে/
ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার পুরোনো অন্ধকারের /
সঙ্গে সমাক্ষ হয়ে গেছে।/

সময় ইতিহাস হয়। সময়ই মানুষের চির শিক্ষা অভিভাবক, আর সময়ই মানুষকে ব্যঞ্জনা দেয় নতুন কিছু নির্মাণের। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের তার স্বপ্ন জীবনের সৃষ্টিশীল নির্মাণে গানের পাশাপাশি যে কাব্যভাষা নির্মান করেছেন, সত্যিই তা আমাদের নান্দনিক কবিতার গতিপথকে আরো উজ্জল করেছে।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক

www.pathagar.com

সরদার আব্বাস উদ্দীন

বাসায় কয়েকজন মেহমান। মেহমানদেরকে বসতে দিয়ে ঘরের ভেতর গেলেন। আবার ফিরে এলেন। প্রয়োজনীয় কথা বার্তা শেষে মেহমানবৃন্দ চলে যাবেন, এমন সময় বললেন " বাসায় মেহমান আসলে মেহমানদারী করানো সুন্নত, আমার ঘরে তেমন কোন খাবার নেই, যদি সকলে কিছু চাল আর পানি খেয়ে যেতেন তাহলে আমার সুন্নত টি আদায় হত "।

কোন এক সাক্ষাতকারে প্রশ্ন করা হলো আপনি এত নাতে রাসুল (সাঃ) লেখেন কেন? উত্তর দিলেন কঠিন হাসরের ময়দানে যখন মানুষ দিক বিদিক ছুটাছুটি করবে, তখন যেন রাসুল (সাঃ) এসে আমায় বলেন " মল্লিক আমায় একটা নাতে রাসুল (সাঃ) শোনাও " এই স্বপ্ন মনের মধ্যে লালন করি বলেই আমি নাতে রাসূল (সাঃ) লিখি ও গাই।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কার কথা বলছি। তিনি আমাদের বাংলাদেশের কোটি মুসলমানের গানের পাখি কবি মতিউর রহমান মল্লিক। আমি রামপালের বাঁশতলীতে জলপাই নাট্য দল থেকে শুরু করে বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী খানজাহান সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ এর সদস্য অতঃপর পরিচালক থাকাকালীন বেশ কয়েকবার এই গানের পাখির সান্নিধ্য পেয়েছি। তার স্মৃতিচারণ করতে মাত্র ২ টি ঘটনা উল্লেখ করছি যা আমার হৃদয়কে আজো ছুঁয়ে যায়।

বাগেরহাট বিস্‌মিল্লাহ্‌ মাদ্রাসা মিলনায়তনে একটি শিক্ষা শিবিরে আলোচনা রাখছিলেন কবি মল্লিক। সূরা আছর অত্যন্ত সুন্দর আর শুরেলা কণ্ঠে তেলাওয়াত করছেন। " ওতাওয়া সওবিল হাক্কি, ওতাওয়া সওবিস সবরি " এই অংশটুকু প্রায় ১০ বার মধুর শুরে তেলাওয়াত করলেন। আমার মনে হচ্ছিল গানের পাখি তার হৃদয় নিংড়ানো দরদ আর ভালবাসার বহিঃ প্রকাশ করার জন্য ঠিক যতটুকু মধুর শুর দেওয়ার কথা ভাবছেন তার পরিপূর্নতার জন্য বারবার তেলাওয়াত করছেন। প্রত্যেকটি অংশে তিনি নিখুঁদ উচ্চারণ দরদ আর আবেগের মাত্রা ঢেলে দিয়ে অবশেষে তেলাওয়াত শেষ করলেন। আমার জীবনে এত সু-মধুর তেলাওয়াত আর শুনতে পাইনি। কিন্তু গানের পাখি তখনও এক অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তেলাওয়াতে আরো সু-মধুর শুর না দিতে পারার অতৃপ্তি তখনো তার মধ্যে কাজ করছিল। এ যেন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে পাবার এক সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ।

ঢাকায় আলফালাহ্‌ মিলনায়তনে ৩ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষন কর্মশালায় আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় কবি মল্লিক তার জীবনের প্রথম দিকের কিছু কথা

www.pathagar.com

বলেছেন। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। আমি জানতে চাইলাম, যখন আপনি ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করলেন তখন আপনার সহযোগী কে কে ছিলেন ? মল্লিক উত্তর দিলেন আমাকে মিন্টু ভাই ঢাকায় আসতে বলেন, ঢাকায় আসলাম। এরপর আমায় বলা হল ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন আপনাকেই শুরু করতে হবে। কিভাবে ? কাদের নিয়ে ? এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব আপনার। তখন থেকে শুরু করলাম। আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম আজকের সেই আন্দোলনের প্রাপ্তি সম্পর্কে। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় কবি মল্লিকের হাতে গড়া শিল্পি গোষ্ঠী কতটা সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি চ্যানেলে ইসলামী গান আর গায়ক সবখানেই একটি নাম, গানের পাখি কবি মল্লিক। আজ ইসলামী সাংস্কৃতির অডিও, ভিডিও ভিজুয়াল এর দিকে তাকালেও মনে হয় সেই একটি নাম, কবি মল্লিক। যার অবদানের বিনিময়ে তিনি আল্লাহর পুরস্কার প্রাপ্তিকেই অগ্রধিকার দিয়েছেন।

সর্বশেষ যে কথাটা আজো মনে তাড়া করে বেড়ায় তাহল, একজন মানুষ এক মুঠো চিড়া সঙ্গে নিয়ে আল-কোরআনের আন্দোলনের কাজে মাইলকে মাইল হেটে গেছেন। যার উদ্দেশ্যে গেছেন তার কাছে পৌছাতে রাত হয়েছে বলে তাকে ডাকাডাকি না করে মসজিদে ঘুমিয়েছেন। পাত্র না থাকায় পলিথিনের চিড়া ভিজানোর জন্য পলিথিন ছিদ্র করে রশি বেধেঁ পুকুরে ভিজিয়ে রেখেছেন। নফল নামাজ পড়তে পড়তে এক সময় যখন মসজিদের সকল মুসল্লি চলে গেছেন তখন ঐ ভিজানো চিড়া সকলের অগোচরে বের করে খেয়েছেন। এরপরও তার জীবনের কোন স্তরে তিনি অসন্তুষ্টিতে ছিলেন না। আমরা আজ তার রেখে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঠিক কতটুকু আন্তরিক তা এখন আমাদের ভাবা দরকার।

লেখক : সাবেক পরিচালক, খানজাহান সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, বাগেরহাট।

www.pathagar.com

মাসুমা বেগম

২৯ জুন ২০০৯ দুপুর বারোটায় আমি যখন আমার এক নিকট আত্মীয়ার কাছ থেকে অন্যায্যতা পাওয়ার অনুভূতি নিয়ে নীল কষ্টে ভেসে বেড়াচ্ছি ঠিক তখনই সাবিনা মল্লিকের হঠাৎ আগমন আমার অফিস কক্ষে। মুখের দিকে তাকাতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার নীলকষ্টগুলো ঝড়ো বাতাসে কোথায় উড়ে গেল। সাবিনা মল্লিকের কঠিন চাপা ব্যক্তিত্বের মাঝেও সেদিন কষ্টটা পরিষ্কার ভেসে উঠল মুখাবয়বে। মুখের শিরা-উপশিরাগুলো যেন ফুলে উঠেছে। এবং গভীর শূন্যতা ভেসে উঠেছে চাহনিতে। বললেন, 'গতকাল আমাদের সকলের মুরব্বি আপনার ভাই-এর জন্য দোয়া করেছেন। কি হবে এখন? কেন যেন সব কিছু বুঝতে পারছি না।'

চলেনতো সাবিনা আপা এখনই মল্লিক ভাইকে দেখে আসি।

আসলে আমি মল্লিক ভাইকে চিনেছি সাবিনা আপনার চোখ দিয়ে। কখনো কোথাও তার সাথে কথা বলার কিংবা দেখার সুযোগ হয়নি আমার। দুই একটা বই পড়েছি অফিস লাইব্রেরিতে। কিছু গান শুনে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। পারিনি হৃদয়ের উদ্বেলতা লুকিয়ে রাখতে। মনের অজান্তেই গেয়ে উঠেছি অনেকবার,

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয়!!

কিন্তু তখনও আমি জানতাম না এগুলো মল্লিক ভাই-এর লেখা ও সুরকরা গান। অফিসে সহকর্মীদের কাছে শুনেছি উনি চমৎকার করে কথা বলেন। সাহিত্যের উপর সুগভীর জ্ঞান। কথায় কথায় আমরা এক কাছের মানুষের কাছে শুনেছি, তিনি মল্লিক ভাই-এর গানের আসরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। শুনে ভেবেছি, নিশ্চয়ই মল্লিক ভাই চমৎকার মানুষ।

আমারও ইচ্ছা হচ্ছিলো সাহিত্যের স্বীকৃতিবিহীন আমার কিছু কবিতাধর্মী বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করবো মল্লিক ভাই-এর সাথে। কারণ সমাজের অনেক বিষয় নিয়ে, অনেক অন্যায়ের প্রতিবাদ ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে বের হয়ে আসে সাদা কাগজের পাতায় । কিন্তু অনুভব করতে পারি, এগুলো কবিতা হয়নি। অনেক জল্পনা কল্পনা করেও সুযোগ হয়নি মল্লিক ভাই এর সাতে দেখা করার।

ঘন্টা খানেক ছুটি নিয়ে আমি আর সাবিনা আপা ছুটলাম ইবনে সিনা হাস্‌পাতালে। দেখলাম ভক্তকুল পরিবেষ্টিত মল্লিক ভাই। কেউ মাথার কাছে, কেউ পায়ের কিনারে। আমরা

www.pathagar.com

হাস্‌পাতালের ছোট্ট রুমটাতে বসে আছি। এলো সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর একটি ছোট দল মল্লিক ভাই নীচু স্বরে সবাইকে বলে দিলেন 'তোমরা দুপুরের খাওয়া সেরে আস।'

খুব সম্ভব সাবিনা আপা অথবা দুজন নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ। সাবিনা আপা পরিচয় করিয়ে দিতেই বললেন,

-গুণিজনের গুণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অবাক হয়ে ভাবলাম কে গুণিজন? চারদিকে তাকালাম কেউ নেই। বুঝলাম, সাবিনা আপার কাছ থেকে আমার এক আধটু কবিতা লেখার কথা জেনেছেন এবং মনেও রেখেছেন।

হাতে অপারেশন এর কারণে খুব ব্যথা অনুভব করছিলেন। একটু অস্থির মনে হলো। প্রশ্ন করলাম,

-মল্লিক ভাই আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

-রাতে ঘুম হয় নি এক ঘন্টাও। তাছাড়া হাতের ব্যথা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকছে। আবার শুরু হচ্ছে আগের মতো।

তারপর কিছুক্ষণ আধোঘুম চোখে ইস্‌লামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবু নাসের আব্দুজ জাহের স্যার, এবং আরও অনেকের আগমনের কথা বললেন। দেখতে এসে কে কি বলেছেন, কি শান্ত্বনা দিয়েছেন তাও বললেন নীচু স্বরে। তারপর বির বির করে বলতে লাগলেন,

- এদের স্নেহ পেয়ে বড় হয়েছি তো। মীর কাসেম আলী তো কষ্টের কারণে আমার কাছে আস্‌তেই পারেন না। এদের স্নেহ নিয়ে বড় হয়েছি (দু'তিনবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে)

- আমার দিকে ইঙ্গিত করে-

- বুঝলেন ভাবী আমার অসুখটাকে ধন্যবাদ জানাই। তানাহলে এত গুণিজনদের দেখা পেতাম কি করে?

আমি বল্‌লাম, উল্টো বললেন মল্লিক ভাই।

- হাসপাতাল ছাড়া আমার মতো সাধারণ মানুষ কোথায় আপনার পিছনে ছুটে বেরাতাম?

তারপর আমাকে আপ্যায়ন করার জন্য রীতিমত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন সাবিনা আপার সাথে।

- দেখো, ওখানে পরোটা আছে। পরোটা দাও। কলা দাও।

আপেল দাও..... ।

- মল্লিক ভাই ব্যস্ড় হচ্ছেন কেন? আমরা তো নাস্ড় করেই এসেছি। আবার অফিসে ফিরেই লাঞ্চ করবো।

- কিন্তু আপ্যায়ন করা যে সুন্নত।

- রুগীদের ক্ষেত্রেও? জিজ্ঞেস করলাম।

- সবার জন্য সুন্নত। সবার জন্য।

www.pathagar.com

তারপর নিজেই মাথার পাশের একটা প্যাকেট থেকে বের করলেন নতুন একটা কলম, একটা ঐরময lighgter, মিনি সাইজ postage paper। এগিয়ে দিলেন আমার দিকে আমি লজ্জিত মুখে হাত বাড়ালাম। হলুদ রং-এর হাই লাইটার, কালো কলম হাতে নিয়ে কেন ভাল লাগল আমার । বড়দের হাত থেকে কিছু উপহার পেলে ছোট বেলায় আনন্দ পেতাম, তেমনি আনন্দ লাগল আমার। কেন জানি না। ভাবলাম, এভাবেই হয়তো বা মল্লিক ভাই আমার মতো অযোগ্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার প্রারম্ভিক কাজটা শুরু করেন। তা না হলে উনি এত বড় সংগঠক কীভাবে হলেন।

- আমরা কি এখন অফিসে ফিরে যেতে পারি? জিজ্ঞেস করলেন সাবিনা আপা।

- যেতে পার এক শর্তে। ভাবী যদি একটা ফল খেয়ে যান।

অগত্যা একটি আপেল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম আর একদল মল্লিক ভাই-এর রুমের দিকে যাচ্ছেন। সৌজন্য বিনিময় হলো সাবিনা আপার সাথে।

কলমটা হাতে নিয়ে ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠলাম। এই কলম কি আমার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল? এই কলম সমাজের অসঙ্গিতের কথা লিখবে, ন্যায্য অধিকারের কথা লিখবে, কবিতার পংক্তি, গানের গীতি লিখবে এজন্যই কি?

কিন্তু আমার কলমের কালি কি সাদা কাগজের বুক চিড়ে চিড়ে সমাজের দুর্বলতম বঞ্চিতদের কথা লিখতে পারবে যে লেখা সমাজের কঠিন হৃদয়ের অধিকারীদের হৃদয়ের আবরণ তুলে দেবে? এক অদম্য আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে শুনেছি, হাস্‌পাতালেও চমৎকার ঘরোয়া গানের আসর জমে। এক লোভাতুর মন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গানের আসরে মুগ্ধ শ্রোতা হবার জন্য। যদিও সেই ঘরোয়া গানের আসরের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল সাবিনা আপার মনোমুগ্ধকর বিবরণে। কিন্তু কেন জানিনা মল্লিক ভাই সেদিন আমার সাথে একটি কথাও বলেননি। এক অজ্ঞাত কারণে উল্টো দিকে মুখ করে কথা বলছিলেন। ভাব দেখে মনে হয়েছিল উনার সাথে আমার জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিরোধ আছে। নিজেকে অনেক বার প্রশ্ন করেছি, কি কারণ? একটি কথাই বার বার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। কলমের বিনিময়ে একটি লেখা কি প্রত্যাশা করেছিলেন? চেয়েছিলেন কি আমার মতো অযোগ্যরা লিখতে শিখুক।

কিন্তু বেঁচে থাকলে আমি কি করে মল্লিক ভাইকে হতাশ করে দিয়ে লিখতাম আপনি অপাত্রে স্নেহ ঢেলেছেন।

লেখক : ব্যাঙ্কার ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

আমার কিশোর বেলা ও মল্লিক ভাই

সুলতান আহমদ

১৯৭০ সাল। তৎকালীন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নাজেমেআলা খুলনা সফরে আসবেন সে উপলক্ষে যারা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলো তার সে তালিকায় আমিও ছিলাম, বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জে ওলামাগঞ্জ মাদরাসায় হেফজ বিভাগের ছাত্র আমি। তখন ১৭ পারা কোরআন শরীফ মুখস্ত করেছি মাত্র। মাওলানা আমির হোসেন সাহেব তৎকালীন ওলামাগঞ্জ মাদরাসার সুপার। তার প্রেরণায় ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কাজ করতাম। খুলনা শহরের হাজী মহসীন রোডের কার্যালয় আমরা সমবেত হলাম। প্রোগ্রাম শুরু হল। প্রধান অতিথি মতিউর রহমান নিজামী ভাই ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর বক্তব্য রাখলেন। প্রোগ্রামের শুরুতে ঘোষনা করা হয়, ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মল্লিক মতিউর রহমান। তিনি গান শুরু করলেন

"এখানে কি কেউ নেই.....
আল্লাহর পথে জীবনকে বিলাবার
.....
এখানে কি নেই মালেকের মত কেউ-
এখানে কি নেই হামজার মত কেউ-
.....
এখানে কি নেই সালাহদীন সম কেউ
.....
ঐ তো কাফেলা মদীনার পথে
চলেছে দুর্নিবার....
ঐ তো নকীব
হেঁকে যায় শোনো
আল্লাহ আকবর....।

পুরো হল পিনপতন নিরবতা। একটি গানে আমরা সন্তুষ্ট হলাম না। দাবী উঠল আরও একটি গানের, তৎকালিন খুলনা জেলা সভাপতি মতিয়ার রহমান খান আরও একটি গান গাওয়ার অনুমতি দিলেন। এরপর থেকে মল্লিক ভাই ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলেন, এরপর থেকে সকল প্রোগ্রামে মল্লিক ভাই গান শোনার দাবী উঠত শ্রোতাদের পক্ষ থেকে বারুইপাড়া থেকে মল্লিক ভাই, মাওলানা মুজিবর রহমান, মোস্তফা কামাল ভাই এবং কচুয়া থেকে আমিনুল ইসলাম ভাই খুলনায় প্রোগ্রামে যেতেন। আমি ছোট কর্মী ছিলাম, কিন্তু সকলের সাথে বিশেষ করে মল্লিক ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী, এরপর তিন বছরের ব্যবধান, ১৯৭৪ সালে বাগেরহাট সরকারী স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই। মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমানের সহযোগিতায় বাগেরহাটের রাধাভল্লব গ্রামে থাকার ব্যবস্থা হয়। একদিন ছিদ্দিক ভাই বললেন, মল্লিক আসবেন তাই আসরের নামাজ কোর্ট মসজিদে পড়তে হবে। মল্লিক ভাইয়ের কথা শুনে মনের ভেতর সেই পুরনো স্মৃতি আন্দোলিত হতে

www.pathagar.com

লাগল, কখন মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা হবে এবং তার গান শোনার সুযোগ পাব, আছরের নামাজের পরে কোর্ট মসজিদের দোতালায় গেলাম, সেখানে দেখতে পেলাম মল্লিক ভাইয়ের সাথে আরেফিন ভাই, কচুয়ার আমিন ভাই ও আ: রহিম মাকরুম ভাই। দীর্ঘদিন পরে দেখা। মল্লিক ভাই স্বস্নেহে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরলেন। এরপর বৈঠক হল, পরিকল্পনা হল, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনকে কিভাবে বাগেরহাটের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

তার সাংগঠনিক দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে বাগেরহাট মহাকুমায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি বাগেরহাট শহর শাখাকে সংগঠিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শাসছুল আরেফিন ভাই, আমিন ভাই, আ: হামিদ ভাইসহ আমরা বাগেরহাট শহর শাখা সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। তিনি পিসি কলেছের ছাত্র ছিলেন। তারই অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় পিসি কলেজ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুললাম। মল্লিক ভাই মহকুমার সভাপতি হিসেবে বাগেরহাটের সকল থানায় চষে বেড়াতেন। তিনি সুদূর শরণখোলা- মোড়েলগঞ্জ, রামপাল ও মোল্লাহাটে লঞ্চ যোগে অসংখ্যবার সফর করেছেন। কচুয়ায় যেতেন নৌকাযোগে। তিনি কচুয়া থেকে বের করে আনলেন মোস্তাজাব ভাইকে (যিনি বর্তমানে চেয়ারম্যান), মাওলানা আব্দুল লতিফ, মাওলানা ইমরান (যিনি খুলনা উত্তরের আমীর), মাওলানা আলতাফ হোসেন। তিনি বারুইপাড়া, যাত্রাপুর, ফকিরহাট থেকে সৃষ্টি করেন মাওলানা মুজিবুর রহমান, মোশাররফ হোসেন খান, মোস্তফা কামাল, আবু তালেব ভাইকে। এমনিভাবে তিনি পুরো বাগেরহাটের সকল থানা থেকে নেতৃত্ব তৈরি করেছিলেন। ঐ সময় আমাদের সকল প্রোগ্রামের অধিকাংশ সময় খাবারের ব্যবস্থা ছিল মল্লিক ভাইয়ের বাড়িতে। মল্লিক ভাই মা কত কষ্ট করেছেন ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রকর্মীদের আপ্যায়নের জন্য। আমি অসংখ্যবার মল্লিক ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছি। একটি ঘটনা আমি সকল সময় মল্লিক ভাই প্রসঙ্গে নতুন প্রজন্মেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শুনাই। তখন রামপালে লঞ্চে যেতে হতো। মল্লিক ভাইকে সফরে গেলেন লঞ্চে। প্রোগ্রাম করে বাগেরহাট শহরে ফিরবেন কিন্তু পকেটে পয়সা নাই, বর্ষা কাল, বৃষ্টিতের ভিজে প্রায় ১৫ মাইল পায়ে হেঁটে বাগেরহাট শহরে ফিরলেন। এসে কবিতা লিখলেন-

"মোশাররফ না খেয়ে আছে, হাদী পথে পথে ঘোরে, একটা পঁচিশ পয়সায় আর কত দিন চলে? "

এ কবিতাটি প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এমনকি কেন্দ্রীয় সভাপতির দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। এরপরে মল্লিক ভাই খুলনা জেলা সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে বাগেরহাট ছেড়ে গেলেন। তিনি তৎকালীন খুলনা জেলাকে সংগঠিত করলেন। সাতক্ষীরার আনাচে-কানাচে তিনি সফর করেছেন। আজকে সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনে ঘাঁটির পিছনে মল্লিক ভাইয়ের অবদান অনেক। মল্লিক ভাইয়ের সাহচার্যে তৎকালীন খুলনা শহর শাখার নেতৃবৃন্দ আরও সংগঠিত হয়েছিল। মল্লিক ভাইকে এগিয়ে নেয়ার পিছনে, খুলনা শহর শাখার সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম ভাই বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি খুলনা শহর শাখার সাবেক সভাপতি সিরাজ ভাই, রুহুল আমিন খান, শহীদ বেলাল ভাই, সাংবাদিক রেজাউল, রফিকুল ইসলাম দুলাল এবং অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার ভাইসহ অনেক নেতাকর্মীদেরকে অনুপ্রেরণা জুড়িয়েছিলেন। মল্লিক ভাই সাংস্কৃতিক প্রতিভা দেখে মীর কাশেম আলী ভাই মল্লিক ভাইকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং মল্লিক ভাই তার আন্তরিকতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীতে বাঙালী মুসলমানদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর যেখানে বাঙালি মুসলমান আছে সেখানে মল্লিক ভাইয়ের গান ও গানের ক্যাসেট রয়েছে। মল্লিক ভাই বাগেরহাট ফোরামের সভাপতি ছিলেন আমি তার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। তার ই"ছা ছিল বাগেরহাট ফোরামকে শক্তিশালী করে বাগেরহাটে ইসলামী আন্দোলনকে সহযোগিতা করা। মল্লিক ভাই তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এখন বাকি দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বাগেরহাট ফোরামকে শক্তিশালী করা, আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন॥

লেখক : সেক্রেটারী, বাগেরহাট ফোরাম, ঢাকা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চৌকস প্রিন্টার্স লি:

www.pathagar.com

নিবেদিত কবিতা

www.pathagar.com

মানবিক সৌহার্দিক দিব্য ছায়া

আল মুজাহিদী

মানবিক সৌহার্দিক এক দিব্য ছায়া ভেসে ওঠে
আমাদের চোখের সম্মুখে-এই পথ, লোকপদ, রাজবর্ত্ম ধ'রে
হেঁটে যায়; শত কোলাহল-নগর সংসার জুড়ে নীরবে, নিভৃতে;
সাধারণ আটপৌরে সাদা কোর্তা পরা, একেবারে সাদামাটা
কখনও কখনও আত্মার আস্ত্মিনে লুকিয়ে তসবিদানা জপে যেতো
সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্যের পরম্পরা যে-মানুষ
সে তো আমাদেরই লোক। আমাদেরই সুন্দর সজন
সরল শুভৈষী-নিত্য, নিরন্তর–
মৃদুমন্দ, ছোটো ছোটো হাসিকণা ছড়িয়ে দাঁড়াতো যখন
সম্মুখে, সন্নিকটে-চেনা ছিলো বড়ো চেনা ছিলো, সেই লোকপ্রিয়
জনলোক।
তার জীবনের সরোবরে আজো জেগে থাকে টলটল ক'রে
কিছু স্মৃতি মানবিক, সৌহার্দিক।
এক দিব্য ছায়া ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সম্মুখে
বিস্মিত উঠোনে।

মল্লিক

আবুল আসাদ

গতির জগতের
মাটির মল্লিক নেই
আলোর মল্লিক
আছে,
স্থিতির জগতে
আলোর সে পাখি
আলমে আরওয়ার
গাছে।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক

আবদুল হাই শিকদার

মতিউর রহমান
চিরকাল বহমান
আমাদের ভাই মল্লিক,
আমাদের আনন্দ
বেদনার ছন্দ
চলবার পথ দশ দিক।

তাকে নিয়ে তোলপাড়
হয়েছি অনেক বার
তিনি শুধু অবিচল শিখা,
ভয়াল অন্ধকারে
তিনিই তো বারে বারে
জুগিয়েছেন প্রাণের লিখা।

যতোবার হাঙর
ততোবার অস্তর
তার আলোতে পেয়ে গেছে পথ,

সেই পথ ছায়া ঢাকা
শহীদের খুনমাখা
কম্পাস মল্লিকের শপথ।

আমাদের কবি

জয়নুল আবেদীন আজাদ

একজন কবি ছিলেন আমাদের জনপদে
গাঁয়ের মেঠোপথে হাঁটতে হাঁটতে
কতো কী যে ভাবতেন তিনি–

www.pathagar.com

কথা বলতেন ফুল-পাখি প্রজাপতির সাথে
মুক্তোর মতো পবিত্র হাসি বিলাতেন মাঠে-ঘাটে
জনপদের হাজারো মানুষের মাঝে।

আমাদের কবি কথা বলতেন
গ্রহ-নক্ষত্র এবং উদার আকাশের সাথে
কখনো বা উধাও হয়ে যেতেন মেঠোপথের বাঁকে
চলে যেতেন দূরে এবং বহুদূরে
দেশ থেকে মহাদেশে–
গাইতেন মানুষে-মানুষে মিলনের মহাগান।

বিশ্বাসের আলোকপ্রভায় দীপ্ত ছিলেন কবি
তাইতো ছুটছেন অবিরত দিক থেকে দিগন্তে
যেনো আজন্ম এক পদাতিক তিনি,
এভাবেই একদিন হারিয়ে গেলেন সবার স্বজন
রহস্যময় এক অচিনপুরে,
তাইতো আমাদের কবি আর নেই আমাদের মাঝে
নেই চিরচেনা অষ্টপ্রহরের প্রিয়জনপদে।

মতিউর রহমান মল্লিক

সোলায়মান আহসান

সুরের সাধনা মগ্ন চোখ তাঁর আকাশের পানে
তারার মেলায় খোঁজে দীপ্তিমান বোনা নক্সীকাঁথা
রচে তার একে একে অশ্রু-প্রেম-ভালবাসা গাথা
হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় আবেগের সুর-লয়-তানে।
শব্দ দিয়ে খেলা করে, শব্দ দিয়ে গড়ে সৌধ ঘর
শব্দ হয় ঝরনাধারা কল্‌কল্‌ শুধু তড়পায়
শব্দের ভেতর থাকে আন্দোলিত দ্রোহ, ঘুরপায়-
সুরের ঐন্দ্রিক জালে বাঁধে প্রেম, প্রেমময় ডোর।

শুধু নয় সুর গান জীবনের আরাধ্য ঠিকানা
মানুষের মর্মে মর্মে পৌঁছে যাক আল্লার খবর
পেয়ে যাক মতিভ্রষ্ট, জীবনের সঠিক সীমানা
আর যতো পিশাচেরা মানুষের করেছে জবর-
মানবিক বোধগুলো বিকল এবং তা মানা না মানা
তাঁর গান সুরভিতে দূর হবে, পাপের আস্ড়না।

www.pathagar.com

মল্লিক স্মরণে দু'টি ছড়া

আসাদ বিন হাফিজ

এক.
বাগের হাটে যায় না পাওয়া বাঘ
তাই না দেখে মতির হলো রাগ।

রাগ করে সে চলেই গেল ঢাকা
মনটা উদাস ভীষণ রকম ফাঁকা।

মতি হল মল্লিক ঢাকা শহরে
সবার মন করল জয় গানের লহরে।

সেও আজ শামিল ভাইরে বীরের বহরে
ধন্য ধন্য আজকে সবাই তারে কহ রে।

দুই.
বুক ভরা মায়া তার চোখে আলো ঝিকমিক
সকলের প্রিয় ভাই, প্রিয় কবি মল্লিক।

গান গেয়ে চলে গেল অমর সে পাখি
কাঁদে তাই ধরাতল, মানুষের আঁখি।

নষ্ট এ পৃথিবীর পাল্টাতে গতি
চিরকাল বেঁচে রবে আমাদের মতি।

মতিউর রহমান মল্লিক : একটি ভোরের খসড়া

নয়ন আহমেদ

মল্লিকের দিকে তাকালে একটা সম্পূর্ণ ভোর দেখতাম।
সূর্যসমেত লাল উদ্দীপনা–
আঁধার কেটে গিয়ে একটা স্পষ্টতা তৈরি হয়েছে,
কণ্ঠ চিরে চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার মূর্ছনা;
লোকেরা বলে সঙ্গীত–
আর আমি মল্লিক ভাই মল্লিক ভাই বলে একটা কোকিলের
প্রেমে পড়লাম।
ও কালো কোকিল, বাংলাদেশ এইভাবে মাতৃভূমি হয়ে ওঠে
কবিতা ও সঙ্গীতের মতো গুঞ্জরিত হয় মানুষ, প্রেম ও প্রকৃতি।

www.pathagar.com

হায়, প্রেম হারালে মানুষ কী রকম দরিদ্র হয়ে যায়!
মল্লিকের মতো আমাদের আর সূর্য দেখা হবে না?
হায়, আজ অশ্রুপাত ফেরি করছে প্রদীপ্ত রোদ!

মল্লিকের চোখের দিকে তাকালে আমাদের
প্রকৃত বঙ্গোপসাগর দেখা যেতো।
আনন্দ, ছলাৎ ছলাৎ বৈঠাধারী মাঝি, পাশের সবুজ দ্বীপ
আর অনিন্দ্য বপন-প্রণালীর রহস্য উপলব্ধ হতো।

গেরস্তের মতো সজ্জন
এবং বদান্যতায় মোড়ানো অনুভবগুচ্ছের মতো সম্পদ,
একটা পাতার মতো সবুজ ডানহাত
এবং সম্ভাষণযুক্ত পার্থিবতা
আমরা ভুলবো না।
মল্লিক ভাই মল্লিক ভাই বললে একটা জ্যোৎস্না শোভিত রাতের
রহস্য খুলে যেতো।
বড় ভাইয়ের চাহনির মতো
অভিভাবকের স্নেহের মতো
এবং কবিতার মতো প্রতিটি মহান বর্ণমালার তীব্রতায় আকুল
যে জগৎ, তার কল্লোলিত অবগাহন
আমরা ভুলবো না।
মল্লিকের হাত ধরলে আশ্রয় ও নির্ভরতার সংজ্ঞা যথার্থ প্রমাণিত হতো।

আমি দেখবো কুরআনের আয়াতের মতো
অপার্থিবতা
আর আল্লাহর অশেষ করুণা ঝরছে তার জন্য।
আমি দেখবো মল্লিক ভাই মল্লিক ভাই বলে ছুটে আসছে আলোর ফেরেশতা।
আল্লাহু আকবর!
আল্লাহু আকবর!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-মল্লিকের দিকে তাকালে একটা পৃথিবী উঁকি দিতো।

ভালোবাসার ভরা পুকুর

জাকির আবু জাফর

সেদিন তাকে নিঃসঙ্গ যাত্রীর চাদর পেঁচিয়ে
গন্তব্যের দিকে হেঁটে যেতে দেখেছি
এবং চাদরে আতর মাখানো সৌরভ।

www.pathagar.com

নীলের উদারতা সমৃদ্ধ একজন মানুষ,
শরতের নরম সকালের ঠান্ডা বাতাসের মতো প্রশান্ত-চিত্ত।
আকাশ দাঁড়ায় হৃদয়ের কাছাকাছি।
জীবনের জাতহীন বেদনার ডোবাগুলো
শব্দহীন নিঃশ্বাসের মতো গিলে খেয়ে,
লক্ষ্যের সুড়ঙ্গ বেয়ে চলা এক বিরল পথিক।
এবং কাঁচা মাটির গন্ধ শুঁকে
আগামীর ছবি আঁকে সবুজ ডাঙায়।
একজন মানুষ, শুধু লক্ষ্যের কার্নিসে দৃষ্টি তুলে
পার হয় কাদা প্রান্তর, জেগে ওঠা চোরা খাল
আর বৈরী সিন্ধু।
ধানের চারার মতো জেগে ওঠা স্বপ্নগুলো
লালন করে বুকের খামারে।
কখনো হতাশার অনাবৃষ্টিতে ক্ষীণ হয় মুখ,
আবার পুষ্ট হয় আশার জোয়ারে।
কাশফুলের মতো দুলে যায় হৃদয়ের হরিৎ শস্য।
এভাবে তিল তিল গড়ে ওঠা এক নতুন চর,
বিশ্বাসী কৃষকদের সরস ভূমি।
এবং তার ভালোবাসার ভরা পুকুর,
সত্যের প্রতি উন্মুখ।

দিগ্বিজয়ী অশ্বখুরের মতো

আমিন আল আসাদ

আগুনের ফুলকীরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালবার মন্ত্রে
বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
বাতিলের সব ষড়যন্ত্রে
(মতিউর রহমান মল্লিক)

উদ্ভাসিত আলোর ক্যানভাসে নিরাকার প্রতিকৃতি
চেতনার তুলিতে আঁকা দেশ মাটি নদী জলের ছোপছাপ
ফুলপাখি, ধান, নদী, খাল, বাতাস আকাশ নীল

www.pathagar.com

বালিহাস ও বকের মতো ডানা মেলা মেঘের শরীর
সুসভ্য সমাজের সমুদয় সাক্ষ্য শপথ অনাবিল সুর
ঐতিহ্যের কলমে শব্দায়িত বিপরীত উচ্চারণ
আমাদের প্রাঙ্গণে প্রদীপ্ত সূর্য প্রত্যাশার
গোলাপের গন্ধময় দিন, সুবাসিত সাইমুম
উত্তাল তরঙ্গ, রাজপথ, মঞ্চ ও মাঠ
বিপ□ব, সংগ্রাম, বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল-প্রত্নতত্ত্ব
সত্যের টাইফুন, জাগ্রত পাঞ্জেরী
বর্ণাঢ্য যাতায়াত, অনুপম হাঁটাহাঁটি, সৌন্দর্য মিছিল
সব সব সব নিয়ে আমাদের এ গীতিনক্সা
বাণীবদ্ধ ক্যাসেট।
সুনীতির দাবানলে ভস্মীভূত করে দিতে সামাজিক অনাচার
ভেঙে দিতে নিপীড়ক তাগুতের তলোয়ার
আগুণের ফুলকীরা জুটবেই, ছুটবেই
দিগ্বিজয়ী বীরের অশ্বখুরের মতো।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক

মো: মোয়াজ্জেম হোসাইন খান

সমুদ্রের ফেনারাশি নোনা জলে যায় মিশি
'মল্লিক' নাম সেতো তেমনটি নয়।
যতদিন সূর্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে যাবে ডুবে
ততদিন 'মল্লিক' নাম ওগো রবে অক্ষয়॥
দেখেছি লোক কত তোমারই মতো
চলে দুপায়ে করি ভর;
এ ধরার আলো-হাওয়া
বুকে নিয়ে আসা-যাওয়া
করিতেছি এ ধরণী 'পর।
তুমি ছিলে ধ্র্ব সব,
আলো দিতে অনুপম।
সৌরভ ছড়াতে তুমি
সুরভি গোলাপ সম।
স্রষ্টার নামে গান গেয়েছিল অফুরান
স্রষ্টাকে বেসে ভালো বাঁচিয়ে প্রাণ

www.pathagar.com

অসত্য অশালীনে পদাঘাত করি নিজে
আজীবন সত্য ও সুন্দরের গেয়েছিলে গান।
তুলি সুর ঝঙ্কার, হয়ে নিরহঙ্কার,
সরস করেছো কচি প্রাণ
বাংলায় শিশুতোষ সাহিত্য নির্দোষ
উপহার সকলেরে করে গেছ দান।
রচিয়াছ কত তৌহিদী গান
ভরিয়াছ রসে কোটি কচি প্রাণ
রাসূল প্রেমে উদ্বেলিত তুমি
গজলের নদে তুমি এনেছিলে বান।
আজ তোমায় স্মরি
ওগো মল্লিক মতিউর রহমান॥
তুমি অকুতোভয়, ডেকে বলেছে আমায়ঃ
'চলো মুজাহিদ, জিহাদের ময়দানে চলো'!
আমি তোমারই ডাকে হাজির আজি,
হুকুম কর মোরে, কি করতে হবে বলো, বলো।
কি ব্যথায় মুখ ঢেকে,
আড়ালে লুকিয়ে থেকে
চলে গেলে অবশেষে
হয়ে ম্রিয়মান।
মল্লিক মতিউর রহমান॥
আরশের অধিপতি আল্লাহকে ডেকে বলিঃ
আয় খোদা রহমান!
"মল্লিকে" কর ক্ষমা!
তাঁর তরে রহমাত, দাও অফুরান।

দু'টি কবিতা

আহমদ বাসির

কাবার কণ্ঠ

'কাবার কণ্ঠ এক' কাসেল কবি
'কাবার নায়ক' তুমি দীনের ছবি
তোমার সুরে সুধা চারিদিকে আজ
গড়ে তোলে অবিরাম আলোর সমাজ

www.pathagar.com

তোমার কবিতা কথা কোরআনের পথে
দিয়ে চলে উপশম ব্যথাভরা ক্ষতে
মুজাহিদ তাই যত এই বাংলায়
তোমার 'কণ্ঠে' সব 'কণ্ঠ মেলায়'।
আকাশ ছোঁয়া
কেউ কেউ বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকলো
আর কেউ কেউ দেখালো তাদের পিঠ
আর আপনি এটা কী করলেন মল্লিক ভাই
আমাদের বিস্ময়ে বিহ্বল করে
আপন বক্ষ চিরে হৃৎপিন্ডটাই বের করে দেখালেন।

কতদিন ধরে আমরা আকাশ ছোঁয়ার সাধনা করছি
সত্যি সত্যি আমাদের মাথা আজ আকাশ ছুঁলো।

একটা বিষপিঁপড়া

রেদওয়ানুল হক

কতো ক্ষতই তো শুকিয়ে যায় আমার
কতো বেদনাই তো মুছে যায় পথ চলতে চলতে
বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায় দীর্ঘ দুঃখ
কিন্তু এই ক্ষতটি শুকোচ্ছে না কেনো?
কেনো দ্বিগুণ-তিগুণ বেড়ে দগ্ধ হচ্ছি আরো...

মল্লিকভাই, আপনার চলে যাওয়ার কথা কিছুতেই
ভুলতে পারছি না। ভাবি, এখন কে আর
বৃক্ষ কাটার শব্দে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠবে
কে নির্ঘুম পাহারা দিবে স্বদেশের মৃত্তিকা
কে গুঁজে দিবে সাহস আহত পাখির ডানায়
কে অপেক্ষার দরোজা খুলে বসে থাকবে নতুনের...

হ্যাঁ এখন তো সব স্বার্থের দুনিয়া-নিজব্যস্ড় পৃথিবী
মানুষ মানুষের মুখের উপর পা রেখে ঘুমায়
মানুষের কলিজা চিবিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে মানুষই!

মল্লিক ভাই আপনাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না
একটা বিষপিঁপড়া আমার হৃদপিন্ডে, রক্তের শিরায়
থেমে থেমে শুধু কামড়িয়েই যাচ্ছে- কামড়িয়েই যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ধ্রুব নক্ষত্রের মতো

রহমাতুল্লাহ খন্দকার

নক্ষত্র ছিলেন যারা আকাশের
তাদের মতোই আপনার চোখ দুটো হয়েছিল সন্ধ্যাতারা।
নক্ষত্রপতন কত গত হল আকাশে আকাশে,
ঝরতে ঝরতে হৃত হয়ে গেল কত মেঘের কপোল,
কত কত শীতে নুয়ে গেল বৃক্ষপত্র বসন্তের আগে।
মৃৎশিল্পের শরীর থেকে এভাবেই খসে যায় পলেস্তারা প্রত্যহ বিকেলে।
অথচ তোমার চোখ দুটো আলো দেয় আমাদের পথে পথে
ধ্রুব নক্ষত্রের মতো।

আশার কোহল

আশিক রাববানী

তিনি পলি নন পলির পেলবতা
তিনি শিকড় নন শিকড়ের গভিরতা
পর্বত নন, ঠিক পর্বতের গাথুনি
নদী নন তবু নদীর উত্তাল ঢেউ
কবিতাও নন ঠিক কাব্যের মোহনা।

কিন্তু না–
বাংলাভাষা আমায় সাবধান করে
জানিয়ে দিলো
'সে কেবল তারি অহঙ্কার।'
আমি তাই করিনি অনধিকার চর্চা
আমার কবিতার উপমা, উৎপ্রেক্ষাগুলো
নিমেষেই চলে গেল দূরে বহুদূরে বুকে নিয়ে এইটুকু আশার কোহল
যদি দেখা হয় কভু সে মল্লিকের ভিড়ে।

www.pathagar.com

তিনি আজ সুখবানে ভাসছেন

সোহরাব আসাদ

প্রভাতের মৌ-ঘুম ভাঙতেই
পূবাকাশ লালাভায় রাঙতেই
কে তিনি প্রাণখুলে হাসছেন?
সূর্যের দীপ্তিটা ছাড়িয়ে
বন্ধুর মৃত্তিকা মাড়িয়ে
চেয়ে দেখি নকিব এক আসছেন।।

হায়দরী হাঁক শুনি জঙ্গের
সুরপ্রেমী যুব-নিঁদ ভঙ্গের
তারাদের জান্নাতি আড্ডায়
তিনি আজ সুখবানে ভাসছেন।।

মল্লিক ভাই

আতিক হেলাল

মল্লিক ভাই, মল্লিক ভাই
কী করে যে মানি, আজ তুমি নাই!
নদীর স্রোতে, পাখির গানে
তোমারই কবিতা
শুনতে যে পাই।

মল্লিক ভাই, মল্লিক ভাই
প্রত্যাশা নিয়ে সবখানে যাই
প্রাঙ্গণে দেখি শূন্যতা আজ
তোমারই স্বকণ্ঠে
গান তবু চাই।

www.pathagar.com

মানুষের কবি

শহীদ সিরাজী

আল্লাহর প্রিয় যিনি দায়ীর প্রতীক
গীতিকার সুরকার কবি মল্লিক
বিশ্বাসের কবি তিনি কবি সকলের
জীবনের কবি তিনি কবি জগতের।

আপন কলমে লেখা আপন জবানে
ঝংকারে প্রাণ পায় জীবনের গানে
প্রেরণার কাব্যনদী ঢেউ তুলে হাসে
পৃথিবীর সাত রং তাকে ভালবাসে।

সামনে চলার গানে সাহসের কালি
সাদা মন মানুষের ফুল বনমালি
সুরের জবানে আর সুরের ভাষাতে
ঘুম ঘুম জাতি জাগে নতুন আশাতে।

সত্যের কবি তিনি কবি সাহসের
মানুষের কবি তিনি কবি হৃদয়ের
সকলকে দেখান আশা সুবহে সাদিক
নবীর আশিক তিনি কবি মল্লিক।

সৃষ্টি সুখের ঝংকারে

আহমদ সাইফ

তুললে তুমি সুর নদীর, তুললে তুমি ঢেউ
সুরের তারে ছন্দ নাচে দেখেছো কি কেউ?
ছন্দ নাচে ছন্দ নাচে আরো নাচে সুর
ছন্দ এবং সুর ছড়িয়ে হারিয়ে গেলে দূর।
দূর হলেও আপন হয়ে থাকবে সদা তুমি
তোমার প্রেমে হাসছে দেখ সুন্দরের ঐ ভূমি।
ভূমি নাচে, ভূমি হাসে, আরো হাসে দেশ-
দেশের জন্য রেখে যাওয়া সৃষ্টিগুলো বেশ।
যতন করে গড়লে তুমি তোমার সৃষ্টিমালা
সৃষ্টিগুলো থাকবে হয়ে মহাকালের মালা।

www.pathagar.com

হে কাব্যের অধরা বীর

আ র মাহবুব

তাঁর টানে,
মন বিভোর থাকে আবহমান খরতাপে
স্বপ্নগুলো উড়ে অকালে
বৈশাখীর বিদগ্ধ বাতাসে,
ম্লান হয়ে আসে জোছনার বিধুরা;
ঝি ঝির শব্দে বাজে বিষাক্ত অশরীরির সুর
জীবন মায়ায় হৃদমহল বেদনাতুর,
সে বিনে কাব্যজগতে
নিঃশ্বাসে প্রাণ ঝরে শুষ্কতায় হেসে
বিশ্বাসে চাঁদ ক্ষয়ে আসে পৃথিবীর বুকে,
স্বপ্নরা করে ভিড় মরীচিকার চরে॥
হে কাব্যের অধরা বীর
তুমি হীনা আমার কাঁপুনী শরীর
ভীতবিহ্বলতায় শুধু করে অস্থির;
নিঃসঙ্গ হয়ে একা একা পথ চলে
শূন্যতায় আসে যায় বসন্তে,
বিষণ্নতার নীড়ে ভয়ের চাদর জড়িয়ে
জেগে থাকে নগ্নতার নাভিশ্বাসে॥
তুমি বিনে
কবিতারা বেড়ে ওঠে অযন্তে
গায় গান জ্যৈষ্ঠের বিরহে,
বেসুরো হয়ে ঝরে আষাঢ়ে শ্রাবণে;
হে সাহিত্যের সুধাকর
তুমি শুধু সুর নও সুর যন্তে বও
আকাশে বাতাসে
অধরা মাধুরীর মত সে সুরে প্রতিধ্বনিত হও
আমার কবিতার শত ছন্দের কাননে॥
হে অজস্র গানের নৃপতি
তোমাকে পাওয়ার আশ্রয়
আমি রাতবিরাত ছুটি কালেভদ্রে,
তোমার সৃষ্টিতে খুঁজি আমার কবিতার ভবিতব্যকে;

www.pathagar.com

তুমি বিনে আজ আমি-
স্বামী হয়েও আসামী,
এস ফিরে বারেবারে
পৃথিবীর সকল সুরে অসুরে,
উদিত হও নব উদ্যমে
আমার সাহিত্যের প্রভাতে, সায়ংসময়ে।

স্বয়ংক্রিয় আন্দোলন

নাসিম নেওয়াজ

একটি স্বয়ংক্রিয় আন্দোলন
প্রবহমান কবিতা
মল্লিক যার নাম।

সর্বকালের পৃথিবীকে আন্দোলিত করলো, অভাবনীয় স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়ে–
প্রভাতের শিশিরে সিক্ত পতিত ভূঁইগুলোকে পলীযুক্ত বন্যায় ভাসিয়ে;
জাগিয়ে গেলো ঘুম জাগানিয়া গানে অযুত ভক্ত-মিতা,
অদম্য প্রতিভার শাণিত তরবারি, বিশ্বাসের বাঙ্ময় কবিতা।
তুমি স্বয়ং সপ্তসুর, সাত আসমানের উচ্চে সীদরাতুল মুনতাহায়
পৌঁছে যাও অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কোমল গান্ধার সুরের মূর্ছনায়।
একটি স্বয়ংক্রিয় আন্দোলন, মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে ইথারে-
"কী জবাব দিবে, যখন জিজ্ঞাসিত হবে তোমার মেধা আর বৈভবের-"
হৃদয় আন্দোলিত করা, যাদুকরী কার ময় হারমানা সুর কণ্ঠস্বরে।
অহংবোধ ভীত তারে দেখে, তবুও হিংসুটের দল ক্ষতবিক্ষত করে,
ডানাভাঙ্গাপাখির, নি:শব্দ ডানা ঝাপটানো, আহত সুরে
গলে পড়ে লুকিয়ে রাখা কষ্টের দুফোটা অমলীন হাসি,
পরক্ষণেই সুদূরে প্রিয়তমের খোঁজে দৃষ্টি মেলে ধরে–
"আমি সাহস পাই তোমাদের ভালবাসা পেলে তোমাদের ঘিরে।"

কবি মতিউর রহমান মল্লিক

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ

কবিতা ও গানের এমন ধারা পাইনি খুঁজে আর,
বিশ্ব-মাঝে তারকা হয়ে দূর করেছ আঁধার।

www.pathagar.com

মনন ও মেধা বিলিয়ে দিয়েছ তোমার সকল কাজে,
তিলে-তিলে ক্ষয় করেছ জীবন অসীম ত্যাগের মাঝে।
উৎসাহ দিয়েছ নিরাশ হৃদয়ে, দিয়েছ আলো অনন্য,
রঙ্গ-রসের দুনিয়ার লাগি' মোহ ছিলনা সামান্য।
রবের প্রতি তোমার ছিল নিখাদ-গভীর বিশ্বাস,
হতাশার মাঝেও আলো পেতাম পেয়ে তোমার আশ্বাস।
মানব হৃদয়ে তুলেছিলে তুমি 'সাইমুম' নামের ঝড়,
নতুন সফর শুরু হলো বিশ্বে এবং অতঃপর।
মন্থন করে এসব স্মৃতি ভাবছি বসে একা,
লয় হবে প্রাণ এমনি করে হবে কি স্বপ্ন দেখা?
লিখতে গিয়ে এই কবিতা বলতে পারি আমি,
কর্ম-সাধনা-সংগ্রামে তোমার তুলনা তুমি।

ঠিকানা (প্রতিঃ কবি মতিউর রহমান মল্লিক)

ওমর বিশ্বাস

ফিরে গেছ নীড়ে এক শান্ত ভোরে
শান্তির বাগিচায়
আকাশের নীল ডানায়
জোৎস্না ও ঝর্ণায়
সুদূর স্বপ্নালোকে নিজের ঠিকানায়

যে নিশান তুমি খুঁজতে উড়িয়েছ যে নিশান
এক হয়ে মিশে গেছে তা অনন্ত আলোয়
ফিরে গেছ তুমি পৃথিবীর মিনার ছুঁয়ে
যে মিনারের সুর ছুঁয়ে গেছে গৌরবে
সৌরভে যত মনোরম নদী
তোমার স্মৃতি প্রাণিত করছে নিরবধী।

এপারের স্বপ্ন তোমার উদ্গামিত
ওপারের স্বপ্নের ভিতর তুমি
আমি দেখি জীবন চরাচরে
তোমার উ"চকিত হৃদয় ভুমি।

www.pathagar.com

হারানো পাখি

মোল্লা তৌহিদুল ইসলাম

সকাল দুপুর কিংবা বিকাল
গাইতো মধুর সুরে
সেই পাখি মোর হারিয়ে গেছে
অনেক অনেক দূরে
এমন মধুর গান কভ' কেউ
শোনেনিকো হায়
যেই গানেতে পাগল হোতো
সারা ভ'বনময়,
সেই গানেতে এমন যাদু
কোথায় পেল পাখি
আবার যদি পেতাম তারে
বুকের ভেতর রাখি
সেই পাখিটি সারা জীবন
গাইল মধুর সুরে
হাজার ওজুত লক্ষ মানুষ
জমাতো শোনার তরে।
সেই পাখিটির জন্যে পাগল
মন দিওয়ানো মোর
কোথায় গেলে পাবো তারে
হয়না কেন ভোর?
সেই পাখিটি জন্মেছিল
বারুইপাড়ার বাগে
যেই পাখিটি ফিরবে না আর
তাইতো বিধুর লাগে,
পাখি আমার ওপারেতে
চলে গেছে হায়
পাখি বিনে জীবন আমার
কাটা ভারি দায়
যেই পাখিরে আপন হাতে
গড়লে তুমি খোদা
সেই পাখিরে অনন্ত সুখ
জান্নাতি দাও সুধা।
যার গানেতে লিখা ছিল
আঁধার এবং আলো
তার ঘরেতে দাও গো খোদা
নূরের বাতি জ্বালো।
আসবে না সেই গানের পাখি
এই ধরাতে আর
সকল দু:খ কষ্ট ঘুচাও
ওই আঁধারে তার,
সবশেষে মোর এই মুনাজাত
কবি তোমার কাছে
হারানো মোর সেই পাখিটি
কষ্ট না পায় পাছে
তোমার রহম আবে হায়াত
নসিব কর তার
কঠিন বিপদ মুসিবতে
তুমিই নিও ভার॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মতি মল্লিকের গানে

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

কত প্রাণে তুমি জ্বেলে দিলে আলো কাননে ফোটালে ফুল
ভ্রান্ত পথিকে দিলে নবদিশা ভাঙালে গহীন ভুল।
গানের এ পাখির প্রাণবায়ু প্রভু কেড়ে নিলে অবেলায়
পাখির কণ্ঠে পূবের হাওয়ায় রোনাজারি শোনা যায়।
সুরে ও ছন্দে যে পাখির গানে বাজে সদা বিভুনাম,
ফুলে ও ফসলে যার খোলা দিল ভরেছিল অবিরাম।
তারে তুমি আজি ক্ষমা কর প্রভু জান্নাতে দাও ঠাঁই,
দরবারে তোমার মুনাজাত করি ওগো দয়াময় সাঁই!
তোমার গানের পাখিটি প্রভু অসময়ে চলে গেল,
তোমারই নামের সুরের ডালাটি হলো বুঝি এলোমেলো।
শত ফুল আর বনের বিহঙ্গ তার সুরে গেতো গান,
আলোতে আলোতে ভরে যেতো প্রাণ ভুলে শত অভিমান।
হিরে মতি আর মাণিক্য আছে মতি মল্লিকের গানে,
কাননের ফুল বনানীর পাখি একথা সঠিক জানে।
আকাশের তারা নদীদের ধারা তার সঙ্গে সুর সাধে,
সুরে ও ছন্দে নাচে জিনপরি ধবল রূপের চাঁদে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্বরণে

মোঃ শরিফুল ইসলাম মোড়ল

তোমার কাছে তুলেছি হাত হে খোদা দয়াময়
কবি মতিউর রহমানকে ক্ষমা করে তুমি দাও
তেজের দীপ্ত আলোটাকে প্রভু দিয়েছ নিভিয়ে
অপসংস্কৃতির যুগে মোরা চলব কি দিয়ে
আ-আ-আ-আ

জীবনটাকে বিলিয়ে দিলেন দ্বীনেরই পথে
ধোকা দিয়ে অন্ধকারের হাতছানিটাকে
আ-আ-আ-আ

www.pathagar.com

বাতিলটাকে উৎখাত করে সত্যের হবে জয়
এই শ্লোগান সামনে রেখে করেছে জীবন ক্ষয়

আল-কোরানের প্রেমিক তিনি ছিলেন এ ধরাতে
হে প্রভু তাকে মেহমান কর তোমার জান্নাত

লেখনী শক্তি দিয়ে যে মানব কাঁপিয়েছে ভুবন
কণ্ঠ থেকে দিয়েছে ঢেলে কত সুর কত গান
আ-আ-আ-আ
যার তেজেতে জ্বলছে আগুন বিপ্লবী চেতনায়
মানবতা আজ তাকে শুধু চায় তাকে ভুলবার নয়

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে গান

মতিউর রহমান খালেদ

প্রিয় মল্লিক
প্রিয় মল্লিক
প্রিয় মোদের সবার
প্রিয় যেন হোন তিনি মহান আল্লাহর ॥

হৃদয় ছিল তাঁর উদার আকাশ
জান্নাতি মেশক মুখে ছড়াত সুবাস
গানের পাখি ছিল সুরের সাকি
সুরের আকাশে তিনি সেরা রাহবার ॥

গানের পাখি সে যে ভাঙ্গালো সকলের ঘুম
সুরের পরশে তাঁর আলোর নহর ঝরে
কেটে গেল অমানিশা রাত্রী নিঝুম ॥

অথৈ সাগর পাড়ি দিয়েছ একা
বিশ্বাসী প্রাণে কভূ লাগেনি ধোকা
চাওয়া পাওয়া সব তুচ্ছ করে
হৃদয়ে বুনেছো সদা স্বপ্ন কাবার ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক সে তো গানের পাখি

স্বজনদের দৃষ্টিতে

মল্লিকা

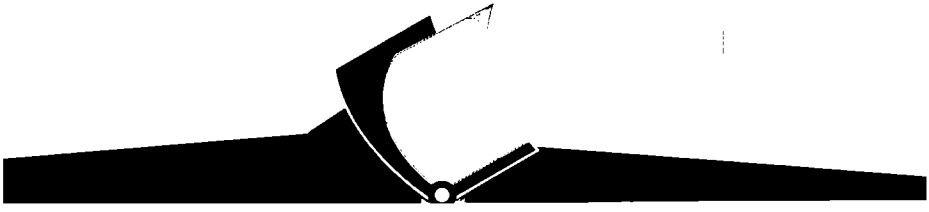

www.pathagar.com

স্মৃতিতো হারায় না

মল্লিক আহ্‌মদ আলী

জীবন ফুরায়ে যায়
কথা তো ফুরায় না
মানুষ হারায়ে যায়
স্মৃতি তো হারায় না।

তাই স্মৃতি গুলো আজ
বেদনার শোভাযাত্রা হয়ে
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে...
চোখ বেয়ে নোনা জল ঝরে
ভাসে বুক। এত স্মৃতি এত কথা...
এত দীর্ঘ স্মৃতি ছবির নীরব মিছিল
আমাকে আচ্ছন্ন করে
আমাকে বিষন্ন করে
ব্যাথায় ভরে আমার ভুবন
কষ্ট ক্লিষ্ট মন
জীবনের ছন্দ শিথিল।

কোথায় ছিলে না তুমি....?
কবি-মেলা গুণী সমাবেশে
বক্তৃতা মঞ্চে...আড্ডায়...মজলিসে...
দরিদ্র বুভুক্ষু দুঃখী ফকির মিসকিন
ব্যাথিতের দুয়ারে দুয়ারে, রুগ্নের শয্যাপাশে
সকলের কষ্ট গুলো নিজ-বুকে বয়ে
সকলের দিতে চেয়ে সুখ
আপনার কষ্ট ক্লিষ্ট মুখ।

কভু দেখি
জায়নামাজ প্রশান্তির দ্বীপ
আল্লাহর নৈকট্য লাভে
ধ্যানমগ্ন...ফান্নাফিল্লাহ
খোদাপ্রেমে পরিসিক্ত হৃদয় অন্তরীপ।

কখনো বা পরিবারে পরিজন পরিবৃত
হাসি ঠাট্টায় রসিকতায়
সকলের মধ্যমনি
সকলের পরিচর্যায় প্রসারিত হাত
সফল গৃহস্বামী।
অতিথি আপ্যায়নে অদ্বিতীয়
গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি
ছোটদের স্নেহের আবিরে রাঙ্গিয়ে
সকলের প্রিয়।

www.pathagar.com

বাজারের ব্যাগ হাতে কখনোবা
মৎসহট্ট তরকারী বিপনীতে হন্তদন্ত
পন্য বোঝাই ব্যাগ
রিক্সায় ঘরে ফেরা গলদঘর্ম।

কখনো নিভৃতচারী কবি
এঁকে যায় প্রকৃতির মোহময় ছবি
আঁকে সিডর বিধ্বস্ত কালমেঘা শরণখোলা
রুহিতার.....
বাদ্রবানুদের দুর্দশার ছবি....
কখনো আবার
চোখে তার রং ফেলে কিংশুক অশোক
নোতুনের স্বপ্ন দেখে চোখ।

কখনো মসজিদে সুকণ্ঠ ইমাম
মধুময় সুললিত শুদ্ধ উ"চারণ
আল্লাহ প্রেমে বিগলিত হৃদয়ের
উচ্ছসিত ধারা।

নামাজীর ভরে দেয় মন
আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে যেন তারা।
কখনোবা স্মৃতির জানালা খুলে
অশ্রুসিক্ত চোখে দেখি বার বার।

জীবনের শেষ পর্ব তার
রোগশয্যা...দীর্ঘ রোগ ভোগ...
নিদারুণ ব্যাধি ও পরাস্ত যেন তার কাছে
দুটি ঠোটে তার
চিরচেনা হাসি লেগে আছে।
বেলা শেষ...প্রতীক্ষাকাতর।
হয়তোবা ফিরে যেতে পরমপ্রিয়
বিধাতার কাছে।
সকলের চোখ ভরা জল
একদিন আকস্মাৎ ষ্ট্রোক হল...
হৃদয় বিকল...
যেতে যেতেও যাওয়া হল না
আসেনি রমজান,
মহা বিদায়ের আসেনি শুভক্ষণ....।
অবশেষে শুভক্ষণ এল-
রমজানের প্রথম প্রহরে
পৃথিবীর মায়া ছেড়ে
চলে-গেল মহিমাময় কীর্তিমান
এক মহৎ জীবন।

www.pathagar.com

এমনি সব ছবিময় স্মৃতির মিছিল
তারা হয়ে ভরে দেয় নীল
হৃদয়ের আকাশ টাকে,
আজীবন সাথী হয়ে থাকে...
কাঁদায় হাসায় কোনদিন মুছে যায় না।

তুমি আজ নেই তবু সর্বক্ষণে
স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছ মানুষের মনে।
তাই মন বলে মানুষ হারায়ে যায়
স্মৃতি-তো হারায় না।

লেখক : কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বড় ভাই

দেয়াল

নাজমী নাতিয়া

আমি প্রতি রাতে কান পেতে শুনতাম
আব্বুর হৃদপিণ্ডের গতি
মাঝে মাঝে বুকের ওঠা-নামা শ্লথ হত,
আর আমি হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে
যেওনা, যেওনা বলে কেঁদে উঠতাম।
একরাশ মৃত্যুভয় অসহ্য লু হাওয়ার মতো
বয়ে যেত আমার শরীরের ওপর।
সেই অশরীরি দমক এড়াতে
আমি দেয়াল ধরে, শক্ত হয়ে দাঁড়াতাম।
সেদিন দুপুরেও আমি আব্বুকে
যেতে দিতে চাইনি।
চোখ বড় বড় করে আব্বু যখন সব কিছু দেখে নিচ্ছিল,
স...ব কিছু,
আমি দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে
অনবরত শুধু ফোন করে যাচ্ছিলাম।
ডাক্তার, নার্স, ইমার্জেন্সি রুম।
আফসোস হচ্ছিল খুব।
ইস!
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একটা ফোন নম্বর
যদি থাকতো,
অনুনয় করতাম।

লেখক : কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ছোট মেয়ে

www.pathagar.com

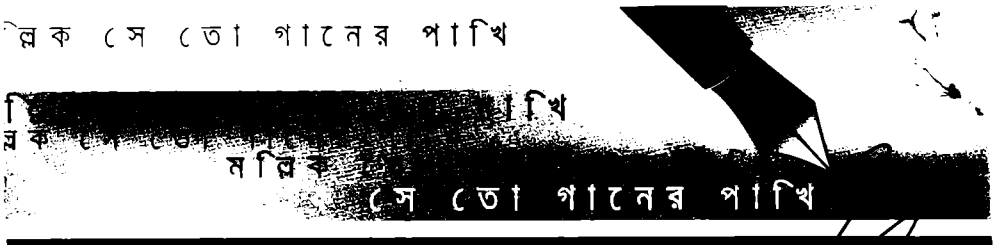

তোমারে লেগেছে এত যে ভালো

সাবিনা মল্লিক

সকালে রুটি বানাচ্ছি, জুম্মি এসে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, 'আম্মু আব্বু অপদার্থ বলেছে।'

তুই তো অপদার্থ। তোকে আবার কি বলবে। খুব নির্লিপ্ততার সাথে ওকে বললাম।

'শুধু আমাকে বলেছে? তোমাকেও তো। বলেছে, তোর মা শুদ্ধ ঘরের সব কয়টা অপদার্থ।'

আমি ভীষণ রেগে শোবার ঘরে ঢুকলাম। কি ব্যাপার? দেখলাম, মানুষটা তোলপাড় করে কি যেন খুঁজছেন। আর গজগজ করছেন, 'ঘরের একটা জিনিসও ঠিকমত থাকে না। ওয়ারড্রোবে রাজ্যের হাবিজাবি। কাপড়-চোপড় সব টেবিলে, চেয়ারে....।' 'কি খুঁজছো?' ওনার তৎপরতা বেড়ে গেল এবং আমাকে নয়, ঘরের ছাদকে বললো, 'একটা গেঞ্জীও খুঁজে পাচ্ছি না। আশ্চর্য সব হাওয়া হয়ে যায় কি করে?' আমিও আশ্চর্য হয়ে আলনায় তাকালাম। সদ্য ধোয়া সাদা গেঞ্জী একেবারে সবার ওপরে। চেঁচিয়ে বললাম, 'ওটা কি?' পরক্ষণে গলার স্বর খাদে নামালাম এবং বেশ শান্ত ভঙ্গীতে ওনাকে শুধলাম, 'অপদার্থ কে? আমি.....?'

ওনার অবশ্য জবাব দেবার সময় নেই। কারণ আবার শুরু হল, 'ঘড়ি? আমার ঘড়িটা কোথায় গেল?' (ঘড়ির তো হাত-পা আছে? ঘড়িতো এমনি এমনি কোথায় কোথায় চলে যায়।)

এই তো এরকমই মানুষটা। ভুলোভোলা, খেয়ালী। তবে অভিযোগ করলে কিন্তু প্রতিবাদ করেন খুব। ডাবল অভিযোগ ফিরিয়ে দেন আমাকে। বলেন, 'সাবিনার মতো অগোছালো মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি।' একদিক দিয়ে ভালই যে, দু'জনের স্বভাবটা আমাদের কাছাকাছি। আমার আম্মার খুব দুশ্চিন্তা, 'দু'জনে এক রকম হলে কি করে সংসার চলবে?' তবে চলছে তো! ভালই চলছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছে, কিন্তু তীব্র ক্ষোভ নেই, আক্রোশ নেই।

উনাকে চিনি সেই ছোট্টবেলা থেকে। ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি। চোখে দেখিনি। কিন্তু, আমার মেঝভাইয়া তার গল্প করতেন সারাক্ষণ। শুধু মল্লিকভাই, মল্লিকভাই-মেঝ ভাইয়ার মনে কেমন করে যে এতটা দখল নিয়েছিলেন? গল্প শুনে শুনে তাঁর চেহারা চরিত্র, আচার-আচরণ জানা হয়ে গিয়েছিল। মনে হত খুব অন্যরকম, অসাধারণ, হাতেম তাঈরের মতো একজন মানুষ।

এখনতো আর তিনি কল্পনায় নেই। বাস্তবের ভালোয়-মন্দয় মেশানো একজন। সাধারণ, সাদাসিধে, কিছু-কিছু দিকে শিশুর মতো সরল আবার কিছু-কিছু দিকে সাঙ্ঘাতিক জটিল।

www.pathagar.com

তবে কুটিল নয়। কুটিলতা, ষড়যন্ত্র আর মতিউর রহমান মল্লিক যোজন যোজন দূরে। সেটি হল কৃপণতা। সে তো- আমার থেকে আপনারাই বেশি ভালো জানবেন। আমাকে খুশি করার জন্য মাঝে মধ্যে ঘরে এসে হিসেবী হিসেবী ভাব করেন। দু'টাকার বাদাম কিনে খাতায় লিখে দেখান (সে খাতার ভলিউম কিন্তু অনেক বড় এবং প্রায়ই হারায় বলে হিসেব রাখার খাতার পেছনে খরচটাও উল্লেখ করার মত)। মানুষকে দিতে পছন্দ করেন, খাওয়াতে পছন্দ করেন। সাধ অনেক। সাধ্য হয়তো কুলোয় না।

তার গোটা অন্তর জুড়ে রয়েছে রাসূলের (সা.) জন্য ভালাবাসা। চেষ্টা করেন কাজে কর্মে সুন্নতকে অনুসরণ করার। তবে, সবচেয়ে বড় যে সুন্নত একামতে দীনের আন্দোলন সেই আন্দোলনে তিনি শরীক জ্ঞান হবার পর থেকে। এই আন্দোলন রাসূলের (সা.) অনুসরণের দিক থেকে সুন্নত যেমনি, তেমনি আইনগত মর্যাদার দিক থেকে ফরজ প্রতিটি মুসলমানের জন্য বোধ তার খুব গভীরে। ফলে আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হবার বিন্দুমাত্র চিন্তা কল্পনাও কখনো তার নেই। যতটুকু করেন আন্তরিকভাবে-আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) মহব্বতের কারণেই করেন। আমার মনে হয় না কোন পার্থিব স্বার্থ, লোভ, ক্ষমতার মোহ কখনও তাকে লালায়িত করেছে। তবে আবেগী মানুষ। থার্মোমিটারের পারদের মত ওঠা নামা করে তার আবেগ। এই দিনরাত কেবল প্রোগ্রাম করছেন আর প্রোগ্রাম করছেন। আবার দেখি তেমন একটা যাচ্ছে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে একরাশ অভিমান ঝরিয়ে বলেন, 'আমাকে দিয়ে কিছু হবে না-আমি তুচ্ছ মানুষ আমি এই কাজের যোগ্য না...।' মানুষের সাথে সম্পর্কও তার ওঠানামা করে। কারো সাথে হয়তো এমন সম্পর্ক উষ্ণতায় ভরপুর-পারলে নিজের কলজেটা কেটে দেয়। দু'দিন পর হয়তো দেখা যাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন কারণে সম্পর্কটা শীতল হয়ে যাচ্ছে। সবার ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। তবে প্রায়শ এমন ঘটছে। আর চাকুরি তো রোজই ছাড়েন দু'বেলা করে। আবার অফিস ঘরে কাটিয়েও দেন দিনকে দিন, রাতকে রাত। যা বলছিলাম। আন্দোলনের জন্য তাকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। বাড়িঘর, দাদাদের (তার বড় ও মেঝভাই) স্নেহ-মমতা, পড়াশুনার ক্যারিয়ার, একটা নিশ্চিত স্বনির্ভর জীবন। কিন্তু এ নিয়ে কখনই তাকে আফসোস করতে দেখিনি। কোন গর্বও করতে শুনিনি যে, এই করেছি সেই করেছি হেন করেছি তেন করেছি। তার দু:সময়ের বেশির ভাগ গল্পই তো শুনেছি মেঝ ভাইয়ার কাছে। দু'দিন তিনদিন না খেয়ে থেকে পথের ফেলে দেয়া কাগজ কুড়িয়ে তাতে লেখা 'চল চল মুজাহিদ পথ যে এখনও বাকী.....।' চোখের পানি ফেলে ফেলে মেঝ ভাইয়া বলতেন এই কাহিনী। অবশ্য তার সময়ের কর্মীদের বেশির ভাগই ছিলেন ত্যাগী, তারা আন্দোলনকে দিতেন। আন্দোলন থেকে কিছু পেতে চাইতেন না।

আল্লাহর ওপর তার তাওয়াককুলটাও বেশ উঁচু ধরনের। অভাব-অনটন তো নিত্যসঙ্গী। কিন্তু, তিনি কখনও ঘাবড়ে যান না। একটা সময় ছিল বিআইসিতে যখন ছিলেন বেতন তো সামান্য এদিকে দুটো বাচ্চা, আমার পড়াশুনা, মেহ্মান, আত্মীয়-স্বজন। বাসায়ও কেউ না কেউ পার্মানেন্ট থাকতোই। কিন্তু তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে সংসারে কি যুদ্ধটাই না চলছে। আমার ভাইরা বলত, 'এ-অবস্থায় মল্লিক ভাই এত ঘুমোয় কি করে? শোয়ার সাথে সাথে ঘুম?' অবশ্য যুদ্ধটাতো আমার। বেতন আমার হাতে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া ঐ যে বললাম তাওয়াককুল। আমি নিজের কানে শুনেছি। একবার আমাদের খুব দরকার

www.pathagar.com

তিন হাজার টাকা। তিনি মোনাজাতে বলছেন, 'আল্লাহ্ তুমি আমাকে এই তিন হাজার টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।' আমিতো হেসে বাঁচি না। এ রকম মোনাজাতও কেউ করে? সত্যি! অবাক কান্ড। লন্ডন থেকে এক ভাই কিছু পাউন্ড পাঠালেন উপহার হিসেবে যা ভাঙ্গিয়ে তিন হাজার টাকাই হল। তিনি বললেন, 'কাউকে বল না। লোকে আবার আমাকে পীরসাহেব মনে করা শুরু করবে। আসলে আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ্পাক ফেরান না।'

তার আর একটি গুণ কৃতজ্ঞতা। কেউ তার জন্য কিছু করলে তিনি পার্থিব প্রতিদান অনেক সময় দিতে পারেন না। কিন্তু কৃতজ্ঞ হন ভীষণভাবে এবং দোয়া করেন তার জন্য। ৯৬-এ তার সেই ভয়ঙ্কর অসুস্থতার সময় বোঝা গিয়েছিল লোকেরা তাকে কি পরিমাণ ভালভাসে। দেশে বিদেশে তার জন্য অনুষ্ঠিত হত দোয়া। কাবা শরীফের গেলাফ ধরে মক্কার ভাইয়েরা তার জন্য দোয়া করেছেন। লন্ডনের ভাইয়েরা পাঠিয়েছেন অর্থ সাহায্য। ইতালীর দুবাইয়ের ভাইয়েরা পত্রিকায় জানিয়েছেন সমবেদনা। তিনি সব সময় বলেন, 'আল্লাহ্র সাহায্যের পাশাপাশি ভাইদের দোয়ার কারণে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পেরেছি। নইলে এ রোগ কখনও এত দ্রুত সারে?' সে সময় তার জন্য কতজনে কত কিছু করেছেন তা ভোলার নয়। তার দু:সময়ের চিরসাথী ভাইদের নাম ধরে ধরে তিনি আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করেছেন, আমি শুনেছি। উপহার পেলে তিনি খুশি হন কিন্তু কোনটি আদরের আর কোনটি অনুগ্রহের তা বেশ টের পান এবং অনুগ্রহের জিনিষ গ্রহণ করতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক।

এবার আসি ঘরের কথায়। তার বিরুদ্ধে আমার সত্যিকারের নালিশ তো তিনি ঘরে সময় দেন না, ধরতে গেলে মোটেই নয়। তখনও না এখনও না। তখন ছিল এক করম কষ্ট। এখন অন্যরকম। ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে। আমি প্রাণপণ চাই ওরা আব্বুর আদর্শে মানুষ হোক। কিন্তু তার জন্য যে সাহচর্য দরকার ওরা সেটা পাচ্ছে না- আব্বুর সাথে বেড়ানো, ছুটি কাটানো, কেনাকাটা করা, একসাথে খাওয়া এসব থেকে ওরা বঞ্চিত। আমার ছেলেটার এ নিয়ে অনেক দুঃখ। বিশেষ করে ওর বাপ প্লেনে করে সফরে গেলে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সেদিন দেখলাম গাল ফুলিয়ে বলছে, 'কি সুন্দর আব্বু প্লেনে করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের একটা মাত্র ছেলের কথা চিন্তাও করে না।'

প্লেনের প্রসঙ্গে মনে পড়ল। আমার বিয়ের পরপর। আমার এইএসসি আর শাকিল (আমার পিঠোপিঠী ছোট ভাই) এসএসসি। উনি ফরিদপুরে গিয়ে ঘোষণা দিলেন, "তোমরা দু'জনেই যদি ফার্স্ট ডিভিশন পাও তবে তোমাদেরকে প্লেনে করে কক্সবাজার ঘুরিয়ে আনব।" আমার জন্য এটা তেমন ব্যাপার না হলেও শাকিলটা ইংরেজিতে কাঁচা ছিল বলে বেচারা ভাবনায় পড়ে গেল। তবু রাত জেগে লাস্ট ফুড হ্যাজ ড্যামাজেড (Last Blood has damaged) কে ও এভাবে উচ্চারণ (আব্বা এজন্য ওকে এত ক্ষেপাত বলার না) করতে করতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গেল। এবার যাবার পালা। কিন্তু উনি বললেন, 'এখন অফ সীজন সামনের বসন্তে।' বসন্ত এলে বলেন, 'এবার গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম মাথায়। প্রোগ্রামটা কাটুক।' আসল ব্যাপারতো সহজে বলেন না। নতুন নতুন পয়সার অভাবের কথা কি আর বলা যায়। শেষে দোনোমানো করে বলেই ফেললেন, 'কষ্ট মষ্ট করে ধার-টার করে তোমাকে হয়তো নিতে

www.pathagar.com

পারি। কিন্তু তিনজন যাব কি করে?' বললাম, একা যাব না শাকিলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে বেচারার মন ভেঙ্গে যাবে, উনিও সায় দিলেন, 'ঠিক কথা। ওকে নিয়েই যাব ইনশাআল্লাহ্, তবে কিছু পয়সা হোক।' সেই যাওয়া আর হয়নি। সুযোগ পেলে স্মরণ করাই। উনি বলেন, 'চলনা এখন চল'। এখন কি আর যাওয়া হয়? আমার চাকরি, বাচ্চা-কাচ্চা, সময়-সুযোগ; সেই আনন্দ সেই মন কি আর ফিরে পাব? তাছাড়া শাকিলকে কোথায় পাব? প্রতিশ্রুতি যে ওর সাথেও? এমনি অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি সাধ স্বপ্ন কোরবানি হয়ে গেছে সাধ্যের কাছে। এগুলো অবশ্য আমার কাছে কোনদিনেই তেমন গুরুত্বের হয়ে দেখা দেয়নি। ওনার কাছে সবচেয়ে বেশি যেটা পেয়েছি সেটা আমার পড়াশুনার প্রেরণা। অনেক অনেক ঝামেলার মধ্যেও উনি আমাকে ড্রপ করতে দেননি একটি বারের জন্যও। নাজমী আমার চিররুগ্না। ছোট্টবেলায় যেমন ভুগত তেমনি কাঁদত। সেই অবস্থায় একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করছি। অনেক সময় এমন হত পড়তে পারছি না মেয়ের পরিচর্যায় ভীষণ ব্যস্ত। উনি আমাকে পড়ে শোনাতেন।

আম্মাকেও অনেক পড়া পড়ে শোনাতে হত (পড়াশুনায় আমি একটু অলস আর ফাঁকিবাজ টাইপের)। ওনার অনেক আশা ছিল আমি ডক্টরেট করি। কিন্তু, আর ইচ্ছে করছে না। চাকরিতে ঢুকে পড়েছি। এতটুকু যে আসতে পেরেছি এজন্যই আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্র সাহায্যের পাশাপাশি ওনার অবদানকে আমি ভুলব না যতদিন বেঁচে থাকি।

আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীন। আদর্শের কারণেই অসংখ্য অসংখ্য মানুষকে বুকে টেনে নেন। মানুষের জন্য হৃদয়কে উজাড় করে দেন। কিন্তু, বাড়িতে চান রেডিমেড কর্মী। এখানেও যে টার্গেট নিয়ে, ভালবাসা দিয়ে কর্মী করে নিতে হবে এটা ভুলে যান। ধমক-ধামকটাকে প্রাধান্য দেন বেশি। তার বকা ঝকা থেকে শালা-শালিরাও বাদ যায় না। আমার আব্বা ইসলামী আন্দোলন করতেন না দেখে কত অভিযোগ। বলতেন, 'আমি সফরে গেলে এলাকার লোকেরা বলে মল্লিক ভাইয়ের শ্বশুর কেন আন্দোলনে নেই? লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়।' আমি বলি, বা-রে তুমি দাওয়াত দিলেই পারো!

"আব্বাকে দাওয়াত দিতে হবে কেন? নিজে বোঝেন না? মেঝভাই সংগঠন করছে, তুমি করছ এসব দেখেও নির্বিকার থাকেন কি করে? টুপী-পাগড়ী এত বোঝেন আন্দোলন বোঝেন না?"

আব্বা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে এসেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এসেছিলেন। হয়তো কোন অভিমান কাজ করেছিল বলে সরাসরি একই কাতারে আসেননি। উনি বললেন, "শেষ পর্যন্ত আব্বা তো এলেন কিন্তু আমরা আব্বাকে পেলাম না। মুলাদীতে আব্বাকে দিয়ে সংগঠনের বিরাট কাজ হত।"

আব্বাকে যে কত ভালবাসতেন বোঝা যায় এখন, আব্বার মৃত্যুর পর। প্রসঙ্গ এলেই বলেন, "আব্বা ছিলেন ফেরেশতার মতো মানুষ। আমরা কাজে লাগাতে পারিনি।" আব্বাও ভালবাসতেন উনাকে। তার গানের ভক্ত ছিলেন আব্বা। তার পড়াশুনার খুব এপ্রিশিয়েট করতেন। আসলেই, উনি কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ী। পরীক্ষাভীতি আছে বলে একাডেমিক দিক থেকে পিছিয়ে। তা বলে জ্ঞান সাধনায় পিছিয়ে নেই মোটেই। রিক্সায় বাসে-ট্রেনে-

www.pathagar.com

স্কুটারে-যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি দিব্যি পড়ে যেতে পারেন। মুখস্থ করতে পারেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। ফররুখ, নজরুল রবীন্দ্রনাথের বিশাল বিশাল কবিতা তার ঠোঁটস্থ। হাফেজ না হয়েও কুরআনের বেশ কিছু অংশ মুখস্থ। কোন কিছু একবার ধারণ করলে সহজে ভোলেন না। দশ বছর আগে মুখস্থ করা কোন কোটেশন তিনি ঠিকই গলগল করে বলে যেতে পারেন। আর বলতে পারেন কথা। একাধারে যাদুকরী ভাষায়। তার মত অধ্যবসায়ী আমি কমই দেখেছি। ছেলেমেয়েরা আব্বুর এ দিকটি পায়নি। ওরা হয়েছে আমার মতো। পড়ালেখার ধার যত না ধেরে পারে।

বাইরে থেকে মানুষটাকে যত নরম দেখা যায় ভেতরে ভেতরে তিনি কিন্তু সাঙ্ঘাতিক বেপরোয়া। যেটা পছন্দ করেন না তো করেনই না। কোন ভয়-ভীতি বা লোভ এক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। এক প্রভাবশালী পীরের দরবারে গিয়ে একবার এমন এক কান্ড ঘটালেন! দুর্দান্ত পীর সাহেবের সামনে মুরীদানদের যেতে হয় দুহাত জোড় করে খুব আদবের সাথে। পীর সাহেবকে কাছ থেকে দেখার জন্য উনিও লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু হাত জোড় করলেন না। একজন সম্রাটের মত বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেলেন যেটা সেখানকার আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। শুধু এতটুকুই নয়। পীরের কাছটিতে এসে তার কি যে হল। পীরের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা.... এবং সঙ্গে সঙ্গে কিউ ভেঙ্গে সরে এলেন বাইরে। আমার মেঝ ভাইয়া সাথে ছিল। ভাইয়া বলল, "আমি তো প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম এই বুঝি মুরীদানরা গণধোলাই শুরু করে। যে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত!" ওখানকার রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ওনার বরদাশ্‌ত হয়নি। এটা অন্যায়। মানুষকে খোদার আসনে বসবার ধৃষ্টতা। ফলে, তিনি ভীত না হয়ে পীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাইরে চলে আসতে পেরেছিলেন।

এ ধরনের মানুষই আমি চেয়েছিলাম। আল্লাহ্‌ আমাকে ঠিক রকমটিই দিয়েছেন। পরিশেষে তার জন্য আমার অফুরন্ত দোয়া।

[কবি ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত "নাবিক"-এর সৌজন্যে]

লেখক : কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সহধর্মিনী

www.pathagar.com

আঁধার আমার আলো দিয়ে কানায় কানায় দাও ভরিয়ে

জুম্মি নাহ্‌দিয়া

একটা মানুষ অবশেষে গল্প হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভাল লাগার কোন গল্প। পড়তে গেলে- শুনতে গেলে- কিংবা ভাবতে গেলে যেমন ভীষণ ভালবাসার অনুভূতি জাগে বুকের ভেতর, কখনো দূর্বার সাহসে পুলকিত হয়ে যাই আবার কখনো আপনাতেই চোখে পানি আসে। কোনো বৃষ্টিবেলা- দুপুরবেলার অবসরকে, রাত্রিবেলার নির্জনতাকে আমি নির্দিষ্ট করতে পারি না। আজকাল সারাবেলাই বড্ড মনে পড়ে।

এই বাসার প্রতিটি জানালা খুলে এক সময়ে সে আকাশ দেখেছে। খুঁজে বেড়িয়েছে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রতিটি ঘরের দেয়ালগুলোতে তেলাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। জায়নামাজের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে তার শরীরের ঘ্রাণ। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে প্রত্যেকটি বইয়ের পাতায় পাতায় মানুষটার আঙ্গুলগুলোর স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে।

অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে মনের ভুলেই হয়ত শুনতে পাই, "ও জুম্মি- ও- বড় মা, ও আমার আম্মু....." আমি দিশেহারা হয়ে যাই। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না, আমাকে কেউ ডাকছে না- , আর কোনদিন ডাকবেও না এভাবে।

আব্বুর ছোট্ট স্টাডি রুমে এলে আকাশে বাতাসে যেন ভেসে বেড়ায় তার পরম প্রিয় কথামালা।

"তবুও কি অদম্য মানুষের স্বাধীনতার গান।
স্বাধীনতা শব্দটি পারত পক্ষে এখন আর উচ্চার্য নয়।
স্বাধীনতা, এক উপত্যকা বাসীর ফিন্‌কী দেয়া রক্তের
চিৎকার।"
লেখক : কবি তনয়া (মতিউর রহমান মল্লিক) প্রাবন্ধিক।
ভরাট কণ্ঠের আবৃত্তি অবিরাম আমার কানে বাজে।
'তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজ
কমবখ্‌তের মেলা..... ।

আমাদের গোটা বসার ঘরটাই আমার কাছে একদিন সংগীতময় ছিল। ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেলেই ব্যস! শুরু হয়ে যত "টিক্ টিক্ টিক্ / যে ঘড়িটা/ বাজে ঠিক্ ঠিক্ বাজে।"

বারান্দায় দাঁড়ালে আজও এক ছাইওয়ালীর দেখা পাওয়া যায়। এই মহিলার "ছাই রাখো..ও..ও... ছা...ই..." আহ্বানে মানুষটা ভীষণ চিন্তায় পড়ে যেত। উত্তরাঞ্চলের কোনো এক খরাক্রান্ত গ্রাম থেকে একদিন যে শহরে এসেছিল তার জীবনের উত্তরণ কি কেবল ঝাঁকা

www.pathagar.com

ভরা ছাই বেঁচার মাঝেই নিহিত কিনা এই ভাবনা মানুষটাকে বেদনাবিদ্ধ করত খুব।

শেখেরটেক এক নম্বরের মোড়ের 'কেনাকাটা' দোকানে গেলেও আমার তার কথা মনে পড়ে। হয়ত স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই বলেই আমি সেখানে যাই। সদাইপাতি এখান থেকেই যেন ওনার কিনতে হত। 'আমার গিন্নী আইসক্রীম ভালবাসেন'- সেই সূত্র ধরেই চললো সপ্তাহব্যাপী নিত্যদিন আইসক্রীম কেনাবেঁচা। "আমার বড় মেয়েটা ভাত খাওয়ার পর টোস্ট বিস্কুট খেতে ভালবাসে- আপনার দোকানের সবচেয়ে ভাল টোস্ট বিস্কুট দিন তো ভাই কয়েক প্যাকেট।" এভাবেই নাজমী নাতিয়ার আচারের বয়াম, শাশুড়ি আম্মার ইস্পাহানী মির্জাপুর, মুনহামান্নার জন্য লাগাতার কলার কাঁদি। মাসের বেতন বিলিয়ে দিয়ে পকেটে যে কয়টা পয়সা অবশিষ্ট থাকত, তার শ্রাদ্ধ হত এভাবেই।

প্রায়ই সে চেহারায় ভীষণ তৃপ্তি এনে বলত, "বুঝেছো .... আমি হচ্ছি দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল বাপ! কারণ আমি তোমাদের তিনজনকেই চমৎকার তিনটি নাম দিয়েছি আর তার চেয়েও চমৎকার একটি মা দিয়েছি ....." তাকে রাগানোর জন্য বলতাম, "আপনি ভীষণ খারাপ বাপ! আপনি শুধু সাইমুমের সাথেই কক্সবাজারে যান- চিটাগাং এ পাহাড় দেখেন! আমাদেরকে চিড়িয়াখানায়ও নেন না- শিশু পার্কেও নেন না" ইত্যাদি কত অভিযোগ।

আব্বু মোটেও রাগতো না। মুচকী হেসে বলত, "মা রে! ভালো করে পড়া লেখা কর- বিরাট মাপের মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর। পুরো পৃথিবী দেখতে পাবে। এই পঁচা আব্বুটার কথা তখন মনেও থাকবে না।"

থেকে থেকে সারাক্ষণই যে আমার পঁচা আব্বুটার কথা মনে পড়বে- অন্তরটা হু হু করে উঠবে কে জানত?

আমাদের নামগুলোর প্রশংসা যখন শুনতে পাই তখন বুঝতে পারি পিতৃত্বের সার্থকতা, যখন একজন আত্ম প্রত্যয়ী নিরাপোষ আম্মুকে দেখতে পাই স্বামীর রেখে যাওয়া তিনটি সন্তানকে আঁকড়ে ধরে সসম্মানে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তখন বুঝতে পারি তার পরিতৃপ্তির কারণ। ছেলে মেয়েদের জন্য তিনি সম্পদ গড়তে পারেননি। বরং সারাটা জীবন চাকরিলব্ধ ক'টা টাকা মানুষের উপকারে কাজে লাগিয়েছেন। ছোট- খাট মান অভিমান, সাংসারিক জটিলতা, চাওয়া-পাওয়া সব কিছুর উর্ধ্বে এই ইচ্ছার প্রাধান্য আম্মু দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা কিভাবে জোড়া মিলিয়ে দেন ভাবতে অবাক লাগে! দু'জনের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে অনেক অমিল আছে কিন্তু আদর্শ-জীবনবোধ, মুক্ত-চিন্তা এই দিকগুলোতে দু'জনে মিলে মিশে একাকার। সে জন্যই আম্মু বুঝতে পারত আব্বুর কবিতার ভাষা–

দূর!
পাখিরা কি চাকরী করে?
কিংবা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা?
দূর!
নদীরা কি হিসাবরক্ষক
নেই বলে
খুলে বসে হিসেবের খাতা?

www.pathagar.com

: : : : : : : : :
দখ্নে হাওয়া কি শেষ পর্যন্ত
কোন অফিসের সদস্য সচিব থাকে?
থাকে নাকি?

সন্তানদের মানুষ করাই দু'জনের জীবনের পরম চাওয়া। আমি জানি, এই মানুষ হবার পথ বহুদূর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আব্বু আম্মুর সন্তান হয়েও আমাদের কোথায় যেন বাঁধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হতে। অন্য দু'জনের ব্যাপারে জানি না- আমার ব্যাপারে আমি বুঝতে পারি কিছুটা আলসেমী, সাহসের অভাব, ধৈর্যের অভাব, খাম-খেয়ালী আর উদাসীনতার জন্য আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-কাজে-কর্মে বারবার পিছিয়ে পড়ছি। আব্বুই এগুলো বলতো। আর চলে যাবার পর তার চিহ্নিত সমস্যাগুলো আমি যেন আরও প্রবলভাবে টের পাচ্ছি।

তবে আমাদের তিনজনেরই একটি বিষয়ে ভীষণ গর্ব-ভীষণ আত্মবিশ্বাস। আমরা স্বনির্ভর হয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকব ইনশাল্লাহ্। আমরা আব্বুর কাছ থেকেই প্রথম জেনেছি কীভাবে শুধুমাত্র সেই চিরন্তন সত্যের দরবারেই মাথা নোয়াতে হয়। রাসূল (স.)-এর জীবন থেকে কীভাবে অনুপ্রেরণা পেতে হয় জেনেছি।

তিনি এখন দায়মুক্ত। বাদবাকি দায়ভার আমাদের কাঁধেই। আল্লাহর কাছে আর্জি হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিটি ভাল কাজের সওয়াব আব্বুকে দিও। আমাদের গাফেলতীর এক কণাও যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে। আর আমাদেরকে তুমি তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল কর। আমিন।

নিজেই যখন নিষণ্ন পাখির নীড়ে

জুম্মি নাহ্দিয়া

'মতিউর রহমান মল্লিকের কথা কী আর বলব? উনার সম্বন্ধে কিছুই বলার নাই, উনার যদি জ্ঞান না ফেরে তাহলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হয়তো এভাবেই থাকতে হবে, আমরা লাইফ সাপোর্ট দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি কিন্তু ব্রেইন যদি কাজ না করতে পারে সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার নাই।"

-কিন্তু সিস্টার যে বলল ইনজেকশন দিলে চোখ খোলে.....

-সেটা যে উনি কিছু বুঝে খোলেন বা ব্যথা পেয়ে খোলেন এমনটা না,

-আজকে যে দেখলাম শরীরটা ঝাঁকুনি দিচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর?

-সেটা সাধারণ হিক্ আপ। হেঁচকি, বাই দ্য ওয়ে, উনি আপনার কী হন?

-আমার আব্বু,

-হুম..... শোনেন, পৃথিবীতে অনেক মিরাকল ঘটে, মেডিকেল সায়েন্স যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবার আল্লাহ তা'য়ালা রোজ রোজ আমাদের মিরাকল দেখাবেন-

www.pathagar.com

এটা ভাবাও ভুল। সুতরাং দোয়া কালাম পড়েন- আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেন।

-আর আমরা যদি উনাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাই?

দ্যাখেন, আমি যত দূর জানি.... কোনো হাসপাতাল তার এই কন্ডিশনে তাকে নিতে চাইবে না। টানাহ্যাঁচড়া করে কী লাভ বলেন? আপনারা যেটা করতে পারেন তাহল রিজনেবল কোনো হসপিটালে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে রেখে দিতে পারেন। কারণ আমরা স্পেশাল কিছুই.....

গত দিনের ব্রিফিংজুড়ে, এই ভাঙা রেকর্ডখানা বেজেই চলেছে। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ব্রিফিং রুম থেকে বের হলেই জানি উৎকণ্ঠিত আপনজনরা প্রশ্ন করবে,

'ও জুম্মি..... ডাক্তার কী বলেছে? ছোটমণির অবস্থার কোনো উন্নতির খবর-টবর বলল নাকি?

কী জবাব দেবো তাদের? বরাবর তো আর বলতে ইচ্ছে করে না যে আপনাদের ছোটমণির অবস্থা আগের মতোই..... দোয়া কালাম পড়েন, আল্লাহ আল্লাহ করেন..... ।

আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছি। একটা মানুষ একা একা অসহায়ভাবে ঘুমিয়ে আছে। আদৌ ঘুমিয়ে আছে কিনা জানি না। সম্পূর্ণ অচেনা একটা জগতের কতটুকু সে টের পায়? সে কি বুঝতে পারে কত গল্প নিয়ে আজকে বিকেলে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার বিছানার পাশে? কত অপেক্ষা করেছি যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমার বাবা বলবে, 'ও বড় মা! এসেছ? একটু বস আমার কাছে। বলো তোমার জার্মানি সফরের গল্প। কিছু বাদ দেবে না। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু করে তোমার সংসার.....আদনান..... না, আমার বাবাটা কিছু বলে না। সারা গায়ে অভিমান মেখে ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ি বুকের ভেতর। আর আকুল হয়ে মাফ চাই। আব্বুরে..... কত জ্বালিয়েছি আপনাকে, গত দুইটা বছর দেখেছি, কতটুকু পাথর হলে একটা মানুষ তিলেতিলে নিজের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া সহ্য করতে পারে, অমানুষিক যন্ত্রণা হয়েছে শরীরের ভেতর কিন্তু কাতরাতে দেখিনি এক দিনও। খুব বেশি কষ্ট হলে নিস্পলক তাকিয়ে থেকেছে অথবা চোখ বুঝে থেকেছে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেছে ধৈর্য ধারণের দোয়া। মাঝখানে আব্বুর সাইকোলজিক্যাল কিছু সমস্যা হয়েছিল। কাউকে চিনতে পারত না। এমনকি আমাকেও না। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, এক সময় সেই কঠিন মূহূর্তগুলো থেকে ফিরে এসেছে।

টানা নয় মাসের হাসপাতাল-জীবন। মাঝে একদিন বুঝি রোজার ঈদে বাসায় এসেছিল আব্বু, কোরবানির ঈদটাও কেটেছে হাসপাতালে। আর আমার বিয়েতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি পেয়েছিল। বামরংগ্রাদ থেকে ফিরে চার মাস এক রকম জোর করেই বাসায় থেকেছে আব্বু। দেখেছি একটা কবিতা লেখার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা। ঝপসা হয়ে আসা দৃষ্টি দিয়ে বইয়ের অক্ষরগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা আমি দেখেছি। আরো দেখেছি কিভাবে একটা মানুষের শরীরের কলকব্জাগুলো ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায় কিন্তু হৃয়টা ঠিক আগের মানুষের শরীরের কলকব্জাগুলো ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায় কিন্তু হৃদয়টা ঠিক আগের মতোই আকাশচারী থাকে।

যেদিন প্রথম ধরা পড়ল যে আব্বুর কিডনির প্রায় ২৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে গেছে, সে দিন

www.pathagar.com

থেকেই আব্বু আল্লাহর কাছে সারাক্ষণ দোয়া করতেন। আল্লাহ যেন তাকে আর্থিক দিক দিয়ে কারো কাছে সাহায্যপ্রার্থী না করেন।

আল্লাহ তার কথা শোনেনি। একটা পর্যায়ে এসে মানুষের সুবিশাল ভালোবাসার কাছে তাকে ভীষণভাবে পরাজিত হতে হয়েছে। যে যেখান থেকে যেভাবে পেরেছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাদ-প্রতিবাদের উর্ধ্বে ছিল এবং এখনো অব্যাহত আছে তাদের ভালোবাসা।

প্রতিটি পর্যায়ের মানুষ তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে রেখেছে সব সময়ের জন্য। আর সাধারণ মানুষের ভেতর রিকশাওয়ালা, চা দোকানদার, হকার, নাপিত থেকে শুরু করে কার ভালোবাসা পায়নি আমার বাবা? এবং এটা নিঃস্বার্থভাবে বুঝতে পারি, কোন খাদ মেশানো নেই তাতে।

সাইমুম, অনুপম, সন্দীপনসহ শিল্পীগোষ্ঠীগুলো রাত-দিন কী পরিমাণ শ্রম দিয়েছে এ মানুষটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য। একটি সত্যিকারের আন্দোলন যে হাজার হাজার বাবা-মায়ের চক্ষুশীতলকারী সন্তানের জন্ম দিতে পারে এরাই বুঝি তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সেদিন হঠাৎ করেই কয়েকটা লাইন চোখে পড়ল-

'জীবনের মানে হলো- তারকাঁটার বেড়া ভেঙে ফেলা

জীবনের মানে হলো প্রতিটি ফারাক্কা।

প্রচন্ড ধাক্কা,

শত্রুর বুকে কড়া বুমেরাং।'

কথাগুলো তো কী অদ্ভুত শক্তি! রক্ত নেচে ওঠে ঝড় তোলার জন্য ! একটি হৃদয় থেকেই তো একদিন এই শক্তি এসেছিল। একটি মেধাই তো বিনির্মাণ করেছিল উদ্দীপনের কথামালা !

আজকে ওই বুকজুড়ে কতশত কলকব্জা ! আর মস্তিষ্কও রক্ত পাচ্ছে না- অক্সিজেন পাচ্ছে না। কোষগুলোও দিনকে দিন অকেজো হয়ে পড়েছে। এটাই হয়তো আল্লাহর ফয়সালা, আমি শতভাগ আস্থা রাখতে চাই আল্লাহর ফয়সালার ওপর, মানুষের বুকে যে বিপ্লবের বীজ বুনে দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, সে বিপ্লব এখনো চলছে-চলবে।ং

লেভেল ফোরের নয় নম্বর বেড থেকে প্রায় প্রতিদিনই নিঃসীম অনিশ্চয়তাকে সাথে নিয়ে বের হই। তবুও যখন ভাবি, আমার আব্বু যেখানেই আছে মানুষের দোয়া তাকে ঘিরে রেখেছে আর আল্লাহও তাকে ইনশাআল্লাহ অনেক আদরে রেখেছেন তখন কেমন যেন একটা নির্ভরতা পাই। সত্যি অনেকটা পথ পাড়ি দেয়ার সাহস জাগে। আর তার অসমাপ্ত কাজগুলোকে নিয়ে ভাবার প্রেরণা জেগে ওঠে বুকের ভেতর।

www.pathagar.com

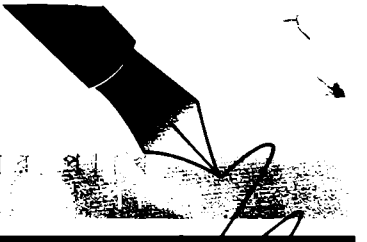

এগার জুলাই দুই হাজার দশ

নাজমী নাতিয়া

এক মোহময় উপন্যাস এর দুয়ারে দুয়ারে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। মাথার ভেতর ডায়ালাইসিস রুমের টেনশন। আমার আর ভাল লাগেনা। এক ঘেয়ে, একরকম জীবন পার করে দিচ্ছি। সকালে টেনে চোখ খোলা, আম্মুর কাজের চাকা আমার পায়ে নিয়ে আব্বুর পেছনে চরকির মত ঘোরা। আম্মু যদ্দুর পারে আব্বুর সব প্রয়োজন মিটিয়েই অফিস যায় তারপরও কত আবদার, কত ফুট ফরমায়েশ! জুম্মি আপু জার্মানিতে মাত্র একুশ দিন হল। এই একুশ দিনেই আমি বুঝে গেছি কিডনি রোগীর সেবা করা ভীষণ কঠিন। আটটা থেকে একটা ইবনে সিনায় প্রতি সপ্তাহে তিন দিন কাটাই। মাহিন মামার গাড়ি পেলে আলহামদুলিল্লাহ আর না পেলে রোদে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খোঁজো, ভাড়া ঠিক কর, আব্বুকে কোলে করে গাড়িতে তুলে দেয়ার রিকোয়েস্ট কর! আমি তো একটা মানুষ নাকি? বইটা ছুঁড়ে ফেলি। বিরক্ত হই। কাপড় পাল্টে দৌড়াই হাসপাতালে অভ্যাসমত। এক হাতে খাবারের বাক্স, আরেক হাতে আজকের পত্রিকা।

আব্বু গভীর ঘুমে ছিল। ডায়ালাইসিস রুমে একবার চোখ বুলাই। সিস্টারদের হাতে সাগর কলা। সবার হাতে। গুষ্টিসুদ্ধ সব কলা খাচ্ছে কেন? রফিক চাচা আমাকেও একটা দিলেন। আমার অবাক চাহনি দেখে হেসে বললেন 'মল্লিক ভাই সবার জন্য আনিয়েছেন রনি ভাইকে দিয়ে। তুমিও খাও। আমরা আরও খুশি হব।' আমার আব্বুটা যে কি! ক'দিন পর পর টুকিটাকি ট্রিট এর ব্যবস্থা করতেই হবে যেন। আমিও হেসে ফেললাম।

আলতো হাত রাখি আব্বুর কপালে। কি বড় বড় আমার বাপের ভুরু দু'টো। আমার ভাল লাগে। মায়ার উদ্রেক হয়। কপালে একটা চুমু দিতেই উঠে যায়। 'ছোট মা এসেছেন?' ছেলেমানুষি আহ্লাদ করে আব্বু।

রুটি ছিঁড়ে, ভয়ে ভয়ে, ভাজি দিয়ে আব্বুর মুখে দেই। 'আজকেও বুয়া লবন দেয় নাই! তুই কোথায় ছিলি? লবন চেখে দেখিস নাই কেন?' আমার যে কি হয়। প্রতিদিন ভুলে যাই লবন চেক করে দেখার কথা।। আব্বুর সামনে খাবার আনলেই সব মনে পরে যায়। কি বলবো? কিছু বলিনা। আব্বু বিড় বিড় করে যায়। 'আমি আর পারিনা। আমি তো একটা মানুষ...!' আমার চোখ ভরে পানি চলে আসে। আমিও আর পারিনা। ছোট্ট একটা দায়িত্ব তাও অবহেলা করি। ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আবার আব্বুর মুখের সামনে রুটি তুলে ধরি। 'আম্মু! আপনার জেসমিন আপুকে একটা ফোন করেনতো'। কি বিচিত্র স্বভাব আব্বুর। একবার 'তুই' আরেকবার 'আম্মু'। আমি ফিক করে হেসে দেই। বড় চাচার মেয়ে জেসমিন আপুর নাম্বার ডায়াল করে আব্বুর কানের কাছে মোবাইল ধরি।

www.pathagar.com

'ছোট মা, জেসমিন বাড়ি থেকে কিছু সবজি পাঠিয়েছে আমার জন্য। নাসিম দিয়ে যাবে। তুমি একটু নাসিমকে ফোন করে বলে দাও এখনি যেন সেগুলো পৌঁছে দেয়'। আমার আব্বুটা চোখ বন্ধ করে কত গুছিয়ে যে কথা বলতে পারে। কিন্তু আজকে কেমন হাঁফিয়ে উঠল। 'ইয়ে মানে আব্বু, নাসিম ভাইয়া খুলনা থেকে আজকেই আসবে আর আজকেই আবার টানাটানি করাটা কি ঠিক হবে?' 'কিচ্ছু হবেনা'। আমার টাটকা সবজি খেতে ইচ্ছে করছে। ওকে বলে দাও আসতে। আব্বু আজকে কি একটু অবুঝ? আমার রাগ হল।

খাবার খেতে খেতে গুটুর গুটুর বাপে মেয়েতে বেশ গল্প চললো। সাইমুম থেকে একদিনও যদি কেউ না আসে তাহলে আব্বুর মন কেমন কেমন করে, ওরা কত কষ্ট করছে আব্বুর জন্য, কাকে দেখলে আব্বুর মন ভাল হয়ে যায়...আরো কত গল্প। খেয়াল করলাম আব্বুর আজকে আসলেই মন খারাপ।

ডায়ালাইসিস শেষ হবার আগেই মামা হাজির। 'মল্লিক ভাই, একদম টাইমলি আসতে পারলাম।' আব্বু আমুদে মানুষের মত চেঁচিয়ে উঠলো 'খুব ভাল করেছো মাহিন। আল্লাহ্ তোমাকে জাযাহ দিক।' সিস্টার বলে দিল প্রেসার ২০০, উপরেরটা। দুপুরের খাবার দিয়েই যেন ওষুধ দেই।

আকাশ ফাটানো তাপ রাস্তায়। শত শত গাড়ির চাপে গরম আরো বেশি গায় লাগে। এসিটা আজকেই নস্ট হয়েছে জানাল মামা। আব্বুর দিকে ফিরতেই দেখি ঘামছে খুব। অল্প কিছু বাতাসের উছিলায় চুলগুলো একটু এলোমেলো। ব্যান্ডেজ করা হাতটা সোজা করে কুঁজো হয়ে বসে আছে। সাদা কাল চুলে চিরুনি চালালাম আঙুল দিয়ে। ভদ্র ছেলের মত মাথা ঝুঁকে হাতের স্পর্শ নিল আব্বু।

কি যেন হল এরপর। একদম ঝড়ের মত। আব্বু একবার মাথা সামনে নেয় আবার হেলান দেয়। ভাল লাগছেনা বলে। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। প্রেসারের জন্য বোধহয়। বাসায় ঢুকতেই বলে মাথায় পানি দিয়ে দিতে। মামার ড্রাইভার দৌড়ায়। মামা আব্বুকে শুইয়ে দেয়। আমি ছুটি ওষুধ আনতে। ডক্টর মুকিত চাচ্চুর নাম্বার ডায়াল করি। ফোনটা রিসিভড হয়না। নামাজের সময়। ডায়ালাইসিস ইনচার্জকে ফোন দেই। বেজেই যায় শুধু। আম্মুকে ফোন দেই। 'মা চলে আসো, জলদি!' এরপর কত যে চেষ্টা করি পাঁচটা মিনিট। অক্সিজেন লাগাই, সুগার চেক করি, প্রেসার মাপি। আব্বু হেঁচকি দেয়। মুখ বিকৃত করে ফেলে। আমি ডাকতেই থাকি। জবাব নেই।

মামা আর ড্রাইভার মিলে আব্বুকে কোলে তুলে গাড়িতে ওঠায়। মামার কোলে আব্বুর মাথা, আমারে কালে আব্বুর দুটো বুড়িয়ে যাওয়া পা। পথে আম্মুকে তুলে নেই। ছুট, ছুট! শঙ্কর কি এত দূরে? এত মানুষ কেন? এত জ্যাম। ইয়া আল্লাহ্।

আম্মু সামনে বসা। আম্মুর মুখটা আয়নায় দেখছি আমি। বিধ্বস্ত, বিবর্ণ। অনবরত পানিতে আম্মুর স্কার্ফ ভিজে গেছে কখন। আমার পাথরের মত আম্মুটা কেমন ঝুর ঝুর করে ভেঙে পরছে। আব্বুর দিকে তাকাই। এত সুন্দর আমার আব্বু, এত সুন্দর। থেমে গেছে আব্বুর শরীর। হাত এর ফিস্টুলাতে কোন রক্ত চলাচল নেই। আমি পাগলের মত আব্বুকে ডেকে উঠি। শুনিনা, কিচ্ছু শোনা যায়না। আয়নায় তাকাই আবার। আমার আম্মু কবে এত অসহায়

www.pathagar.com

ছিল? মামাকে দেখি। আব্বুর মুখটাকে কি অদ্ভুত ভাবে আগলে রেখেছে। যেন আজরাইলকেও এসে থমকে যেতে হয়। কাঁদছে মামা। খুব। পুরুষ মানুষ এভাবে কাঁদতে পারে?

আমার পৃথিবীটা কি রংহীন হয়ে গেল? জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এখন ইবনে সিনায় পৌঁছান। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশটা খুঁজলাম কেমন। মনে মনে ওয়াদা করলাম, আর কখনো বিরক্ত হবনা, আর কখনো লবন চেখে দেখতে ভুল করবোনা।

আব্বুকে যে উঠতেই হবে। জেসমিন আপুর সবজি খাবে বলে বায়না ধরেছিল। প্রতি রবিবার হাসপাতালের সিস্টাররা অপেক্ষা করে থাকবে আব্বুর চিকিৎসার আশায়। জুম্মি আপু কত গিফট কিনে রেখেছে আব্বুর জন্য, ওগুলোর কি হবে? আমি আর কোথাও তাকাতে পারিনা। আব্বুর পায়ের পাতায় চুমু খেয়ে যাই। আমার চোখের বাঁধ ভেঙে যায়।

লেখক : কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ছোট মেয়ে।

www.pathagar.com

মো: আব্দুল্লাহিল হাদী

'কবি মতিউর রহমান মল্লিক' ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বাতিঘর। ইসলামী সংস্কৃতি বলে যে একটি জগৎ বা কোন বিষয় আছে তার ধারণাটাই মানুষের মাঝে তৈরি হয়েছে তাঁরই মাধ্যমে। সারাটা জীবন ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সফলতার স্বপ্নই তিনি দেখেছেন। তিনি একজন অসম্ভব স্বপ্নচারী মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন এবং মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে জানতেন, স্বপ্ন দেখাতে পারতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বন্ধু বাৎসল, দায়িত্ববান এবং দৃঢ় চেতা ছিলেন। এই অসাধারণ মানুষটির সাথে কবে কখন পরিচয় হয়েছিল তার, দিনক্ষণ এখন আর স্মরণ করতে পারছি না, তবে এতটুকু স্মরণ আছে আমি যখন দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ি তখন তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আসতেন আমার বড় ভগ্নিপতি ষাটগম্বুজ মসজিদের খতিব মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের সাথে। তিনি মল্লিক ভাইয়ের সম্পর্কে নানা হতেন। সেই সুবাদে আমাকেও নানা ডাকতেন। সম্ভবত সেখান থেকেই শুরু। তারপর ভিতরে ভিতের কখন যে নানা নাতির দুই আত্মা একাকার হয়ে গেছে। তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কতমাস-কতসপ্তাহ-কতদিন-কতক্ষণ যে এসাথে কেটেছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। কোরআন হাদিস নিয়ে আলোচনা করে, কবিতার পঙক্তি উচ্চার করে, খানজাহান আলী দিঘির সান বাধান ঘাটে বসে আল্লামা ইকবালের লেখনির অংশ বিশেষের শুরে শুরে কিংবা আমাদের বাড়িতে আমার খাটে পাশাপাশি শুয়ে রাতভর গল্প করে।

খানজাহান আলী (রহ.) এর স্মৃতিধন্য বাগেরহাট জেলার এমন কোন গলি বাকি ছিলনা যেখানে আমরা দুইজন পায়ে হেঁটে কিংবা মোর সাইকেলে যাই নাই। যখনই কোন একটা জায়গায় যেতাম তখনই ঐ স্থান বা জায়গা সম্পর্কে তার জীবনের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেন। যা ছিল অত্যান্ত মজাদার। হাসির কিংবা বেদনার। তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। ভোরে ফজরের নামাজ শেষ করে প্রায়ই বলতেন হাদি চল একটু বিলের দিকটা থেকে ঘুরে আসি। আমরা যেতাম। ধান ক্ষেতের মাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া আকা বাকা পথ দিয়ে হাটতাম। তিনি গাইতেন তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর। ঢাকা থেকে যখনই বাগেরহাট এ আসতেন তখন হঠাৎ হঠাৎ কারো সাথে সাক্ষাতের, কোথাও যাওয়ার অথবা কোন কিছু খাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করে একগাল হাসি দিতেন। প্রায়ই বাদোখালী মাওলানা আলী আহমাদ খান যাকে তিনি আলী আহম্মাদ মিঞা ভাই বলে ডাকতেন। তার বাড়ীতে যেয়ে নারিকেল আর তেঁতুলের গুড় দিয়ে আতপ চাউলের জাউ খেতে পছন্দ করতেন। মল্লিক ভাই আজ নেই আর কোনদিন আলী আহম্মাদ মিঞাভাই

www.pathagar.com

এর বাড়িতে যেয়ে জাউ খেতে চাইবেন না। মল্লিক ভাইয়ের জীবন নিয়ে কর্ম নিয়ে না হয় অন্য একদিন আলোচনা করা যাবে। আমাকে অসুস্থতার সময়ের কথা লিখতে বলা হয়েছে তাই আজ তার অসুস্থতা এবং জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে কিছু কথা বলা সমীচিন মনে করছি।

মল্লিক ভাই খুবই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। খবর পেলাম অফিসে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে হাসপাতালে না যেয়ে অফিসেই গেলাম। অফিস থেকে ফেরার পথে হাসপাতালে। কেবিনে ঢুকতেই একগাল হাসি দিয়ে বললেন তোমার কথাই ভাবছিলাম। বসলাম। পারিবারিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন জিজ্ঞেস কলাম শরীরের সমস্যটা কি আসলে বললেন কিছুদিন আগে মিন্টু ভাইয়ের নির্দেশে পুরো চেকআপ হয়েছে। আমার শরীরে কোন রোগ ধরে পড়ে নাই। এখন শরীর দুর্বল পেটে সমস্যা ডা: মুকিত ভাই ভর্তি হতে বলেছেন তার সম্মানে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। তোমাকে খুচ্ছিলাম পায়খানা বন্ধ হওয়ার জন্য হামদর্দ এর পেচিশ না পিচাশ কি যেন আছে ওটা আনার জন্য। এই কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করবে না। তারপর অনেক কথা হল বাসায় চলে আসলাম। রাতে ভাবলাম, অনেক ভাবলাম হাসপাতালে ভর্তি মুকিত ভাই ডা: বিষয়টা আসলে কি? ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। আমি আসছি আপনি রেডি থাকবেন পরদিন অফিস থেকে মাহিন ভাইকে ফোন করলাম পরিবারের পক্ষ তেকে আলোচনা করা দরকার। মাহিন ভাই মূলত মল্লিক ভাইয়ের মৃত্যু পূর্ব মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন, কাছে ছিলেন আমরা দুইজন গেলাম ডা. আ: মুকিত ভাইয়ের কাছে মল্লিক ভাই সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, ওনার সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। বললে উনি বকা দিবেন। বলতে পারি আমি বলেছি এটা ওনাকে না জানানোর শর্তে আমরা শর্তে রাজি হলাম তিনি যা বললেন তার সার সংক্ষেপ হল তার ডায়াবেটিক ছিল যা তিনি নিজেই জানতেন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই। যার ফলশ্রুতিতে তার দুটি কিডনিই আক্রান্ত হয়েছে। চিকিৎসার জন্য প্রথমত ডায়ালাইসিস করতে হবে নয়ত কিডনি সংযোজন করতে হবে। সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যয়টা মল্লিক ভাইয়ের জন্য কোন ব্যাপার নয়। যদি তিনি সম্মতি দেন। বাসায় আসলাম রাতে ঘুম হলা না ভবিষ্যত কিন্তু করলাম মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। তারপর চিকিৎসা চলতেই থাকল চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতিষ্ঠিত সাইমুমের নবীন প্রবীণ কয়েক কর্মীরা। কয়েক দফাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাসায় এসেছেন কিন্তু অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। অবশেষে স্থায়ী ভাবেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। সাথে ডায়ালইসিস অব্যাহত থাকল এবং কিডনি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকল। অনেকেই কিডনি দিতে চাইলেন কিন্তু গ্রুপ মিলল না কারো অবশেষে ২ জনের সঙ্গে গ্রুপে মিললেও অনেক নাটকীতার পর একজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল সেখানে ও নাটকীয়তার শেষ ছিল না। সিদ্ধান্ত হল থাইল্যান্ডে চিকিৎসা হবে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হল এবং থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে হাসপাতাল থেকে রওনা হলেন। বিমানবন্দরে গেলাম। অনেকেই গেলেন। বিদায় নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, বিদায়ের সময় অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। কারো কিছু বল হল না, মুখে ভিতরের সব ফর্মালিটিজ শেষে বিমানে ওঠার

www.pathagar.com

ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমার সাথে ফোনের সংযোগ করিয়ে দিলেন এক ভাই আমাকে বললেন ভাল থেকো। আমিও ক্ষমা চাইলাম তারপর তিনি শুধুই বলতে পারলেন আমি যাচ্ছি বাসার সবাইকে দেখে রেখ তারপর। অনেকক্ষণ চুপ। চোখ মুছে বিদায় নিলাম বিমান বন্দর থেকে ওখানে পৌছানোর পর নতুন করে হার্টে ব্লক ধরা পড়ল। ব্লক অপসারণ না করে কিডনি প্রতিস্থাপন করা যাবে না। হার্টে রিং পরানো হল এবং বেশ কিছু চিকিৎসা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হল। বল হল ৬ মাস পর কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য আবার যেতে হবে। দেশে আসার পর মল্লিক ভাইকে খানিকটা সুস্থ মনে হচ্ছিল। লাঠি ভর দিয়ে হাটতেও দেখলাম। সামান্য কটা দিন। তারপর আবারও অসুস্থতা হাসপাতাল এবং বাসা যাওয়া আসার মধ্যেই ছিলেন। একদিন দুইদিন পরপর ডায়ালাইসিস করতে হত খুব উৎকণ্ঠার মধ্যেই থাকতাম সারাক্ষণ।

রাজ্যের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন অফিস সেরে সন্ধ্যায় স্বপরিবারে যেতে ভুল করতাম না প্রিয় মানুষটির কাছে টুকি টাকি কথা হত অনেক বিষয় নিয়ে কথা হত বাগেরহাট নিয়ে। কথা হত পরিবার নিয়ে কথা হত দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। কথা হত তার সন্তানদের নিয়ে। মল্লিক ভাই এই দুই মেয়ে এক ছেলে এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি তার বড় মেয়ে যোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ করতে পেরেছেন। এ নিয়ে তার একটি প্রশান্তি ছিল। তিনি তার সন্তানদের যেমনটি দেখতে চেয়েছেন, আল্লাহ তেমনটিই কবুল করেছেন। তিনি তার দুই মেয়েকে বড় মা এবং ছোট মা বলে ডাকতেন বড় মায়ের জন্য যেমন এবং পরিবার চেয়েছিলেন আল্লাহ তার সেই আশা ও কবুল করেছেন। খুব কম লোকেরই তাকদিরে এমন সু সন্তান জোটে। কার্ডিয়াক স্টাইকের পূর্বের দিন ওনার বাসা থেকে আমার বাসায় ফেরার পূর্বক্ষণে কি কারণে যেন আমার মেয়েটা কাদছিল ওকে তিনি খুব পছন্দ করতেন আদর করে হযরত খান জাহানের পত্মী সোনাই বিবির নামের সাথে মিলিয়ে ওকে সোনাই বিবি বলে ডাকতেন। হঠাৎ দেখলাম যে মানুষটা হাটতে পারে যাকে ১০ মিনিট আগে কাধে ভর করে শুইয়ে দিয়ে এসেছি সেই মানুষটি একহাতে লাঠি অন্য হাতে দেওয়ার ধরে ছুটে আসছেন সোনাই বিবির দিকে। আর বলছেন ওকে কান্দাও কেন? হাতের মুঠোর তার কাছে থাকা সর্বশেষ টাকার একটা নোট। টাকাটা ওর হাতে গুজে দিলেন এবং কান্না থামানোর চেষ্টা করলেন। প্রসঙ্গত তার বাসায় এ অবস্থায় এ সময় যারা এসেছেন তাদের প্রায় সবাইকে কিছু টাকা হাতে গুজে দিয়ে বলেছেন, এটা তোমার যাতায়াত খরচ, না নিলে ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে। এটাই ছিল তার চিরাচরিত স্বভাব। আমরা রাতে বাসায় ফিলে আসলাম অফিসের কাজেই পরদিন ভোরে আমি কুমিল্লা চলে গেলাম কুমিল্লা পৌছে বাস থেকে নামা মাত্রই আমার শাশুড়ির ফোন তিনি জানতেন না আমি কোথায়। ফোন রিসিভ করলাম ওপার থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসল। তিনি বললেন হাদী তুমি কোথায় মল্লিক নাই। আমি কি করব, কি বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি দুইটা ফোন করলাম, একটা আমার অফিসের এমডিকে, অন্যটি মাহিন ভাইকে এমডি সাহেব আমাকে বললেন, আপনি এখনই বাসে উঠুন। মাহিন ভাই বললেন ঘটনা ঠিক। আমি বাসে উঠলাম এবং ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম আধা ঘন্টা পর মাহিন ভাই ফোন করলেন মল্লিক ভাই এর পালস ফিরে এসেছে কিন্তু জ্ঞান ফেরে নাই। কুমিল্লা থেকে সোজা ইবনে সিনা হাসপাতালে। এসে দেখলাম সবাই ভেজা নয়নে উদ্বিগ্ন হয়ে আইসিইউএর বাইরে অপেক্ষা করছে। একটু পরে লাইফ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য স্কয়ার

www.pathagar.com

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বড় মেয়ে মুম্মি নাহদিয়া জার্মান থেকে ইতোমধ্যেই রওয়ানা করেছে দেশের উদ্দেশ্যে। ভাল মানুষ কথা বলছেন মাহিন ভাই এর গাড়িতে করে তার সাথে ডায়ালাইসিস করতে গিয়েছেন এবং বাসায় ফিরেছেন পথে ড্রাইভার কে বললেন দুই ডজন কলা কিনতে সে দুই ডজন না কিনে ১ ডজন কিনলেন ১ ডজন দেখে তিনি রেগে গেলেন এবং আবারও পাঠালেন আরও ১ ডজন কলা কেনা হল বাসায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নামার সময় ১ ডজন কলা ড্রাইভার এর হাতে দিলেন এটা তোমার বাকিটা নিয়ে বাসায় এলেন। বাসায় পৌঁছে কলা খেতে চাইলেন। কলা খেতে খেতেই কেমন অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। মাহিন ভাইকে বললেন, খারাপ লাগছে সাথে সাথে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে আবারও রওয়ানা করা হল গাড়ীতে বসে মাহিন ভাইয়ের হাতের উপর মাথা রেখে দুই তিনটি খিচুনি দিয়ে চিরদিনের জন্যে নিস্তেজ হয়ে গেলেন। ইবনে সিনায় পৌঁছানোর পর ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করলেন তবুও তাকে বুকে পাঞ্চ করা হচ্ছিল। প্রায় ৩০ মিনিট পর হঠাৎ করেই হৃদ স্পন্দন ফিরে এল। ডাক্তাররা এটাকে বললেন মিরাকল। একজন মানুষ কার্ডিয়াক স্টাইকের ত্রিশ মিনিট পর হৃদ স্পন্দন ফিরে আসা অভাবনীয়। আইসিইউ থেকে বের করা হল শত শত মল্লিক ভক্ত ইবনে সিনার গেটে। ইবনে সিনার ডাক্তার, কর্মচারীরা, নার্স, আয়া, সবার চোখ অশ্রু সিক্ত। আমি দাড়িয়ে ছিলাম গেটের ঠিক পাশেই। ট্রলি নিয়ে যাওয়ার সময় একটু ধাক্কা লাগল সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। (ধাক্কা লেগে অচেতন চোখ খুলে গিয়েছিল)। মোট ত্রিশ দিন। স্কয়ার হাসপাতালে ছিলেন অবচেতন অবস্থাতেই কৃত্রিম ভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল হয়ত তিনি আবারও কথা বলে উঠবেন। আরও লিখবেন, আবারও গাইবেন আবারও বড় মা, ছোট মা সাবিনা কে ডেকে উঠবেন কিংবা এ দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে ভাববেন। কিন্তু তার আর হলো না, আসলে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আইরিন আপা জুম্মি নজমীসহ পরিবারের কারোই কোন স্বাভাবিক জীবন ছিলন না প্রতিটা মুহূর্তেই কেটেছে শংকা আবেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনই অফিস শেষ করে সোজা চলে যেতাম স্কয়ারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার বা ব্রিফিং দিনে রোগী সম্পর্কে একরাশ হতাশা নিয়ে বাসায় ফিরতাম সবাই। মল্লিক ভাই জীবনে সবচেয়ে বেশী যার নির্দেশ মেনেছেন এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থেকেছেন তিনি এলেন ভিতরে ঢুকলেন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এ বেরিয়ে এলেন চোখ মুছতে মুছতে। পরিবারের লোকদের সাথে কিছু কথা বললেন। চলে গেলেন। আমরাও ফিরে এলাম যে যার বাসায় পরদিন ১লা রমজান সেহরী খেতে হবে। বাসায় এসে সবাই শুয়ে পড়ল আমি মোবাইলটা কাছে না রেখে একটু দূরে ডাইনিং এ রাখলাম। গভীর রাতের কলিং বেলের আওয়াজ, মোবাইলের রিংটোন এগুলি আমার কাছে অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার কিন্তু মোটেই ভয়ংকর ঘটনাটাই ঘটে গেল। ডাইনিং টেবিল এর উপরন মোবাইল বাজছে বিছানা ছেড়ে মোবাইল রিসিভ করলাম, বড় মা জুম্মি নাহদিয়ার ফোন "খালু হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে এখনই যেতে হবে আমরা রওয়ানা করলাম আপনি আসেন" আমার কোন কিছু বুঝতে বাকি রইল না। আমার মাথা ঘামছে শরীরে কাপুনি দিচ্ছে অষাড় হয়ে আসছে হাত পায়ের শিরা উপশিরা। গলা শুকিয়ে আসছে ২/৩ মিনিট চুপ করে বসে রইলাম সামান্য একটু পানি মুখে দিলাম এবং ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাহে রাজিউন বলে চিৎকার করে উঠলাম। যত দ্রুত সম্ভব বউ বাচ্চা মল্লিক ভাইয়ের বাসায় রেখে হাসপাতালের দিকে

www.pathagar.com

ছুটলাম, হাসপাতালে পৌছে দেখি মুন্না লিফটের পাশে পা ছড়িয়ে ফ্লোরে বসে আছে চোখ বন্ধ করে। জুম্মি, নাজমি অশ্রু সিক্ত নয়নে নিচু স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করছে। আইরিন আপা আই.সি.ইউ এর দরজার ঠিক সামনে একজন স্বাভাবিক মানুষের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না মল্লিক, ভাই আর নেই। ডাক্তার মুকিত ভাই কোন দিন মতিউর হরমান মল্লিক তাকে সাধনা বলে ডাকবেন না। দেওয়ালের সাথে মুখ রেখে হু হু করে কাঁদছে। ভিতের ঢুকতে চাইলাম বলঅ লাশ নিচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনারা নিচে যান। আমরা নিচে এলাম লাশের মুখ খুলে দেওয়া হল। তাকিয়ে আছি। আমি আইরিন আপা, মাহিন ভাই, জুম্মি, নাজমি, রাহিদ ভাই, কবি আসাদ বিন হাফিজ সবাই। সেই চির চেনা মুখ সেই দাড়ি গোফ চোখ নাক এবং একজোড়া ঠোটের মাঝ দিয়ে এক অসাধারণ হাসি দ্যুতি ছড়াচ্ছে। আমরা দেখছি একজন জান্নাতি মানুষকে লাশ মচুর্য়ারীতে ঢোকান হলো আমরা বাসায় ফিরে এলাম, সকালে লাশ বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হল। সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত লাশ বাসায়ই ছিল তারপর আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়া হল জানাযার জন্যে। তিন দফা জানাযা শেষে কালসী গোবরস্থানে তাকে দাফন করা হল। মুন্না আমি এবং আরও দুইজন কবরে নামলাম আলত করে সাদরে আর কোনদিন তাকে সাবিন বলে ডাক দিবেন না। চারিদিকে কর্পুর এর ঘ্রাণ কালেমা শাহাদাৎ এর আওয়াজ। সব মিলিয়ে এক ঘোরের মধ্যে কবর এর ভেতর থেকে উপরে উঠে এলাম। বাশের চটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। হাজারো স্মৃতি, লাখো মানুষের অনুভূতি এবং আকুতি, স্নেহ, শাসন, মায়া-মমতা। তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে তার মাবুদের কাছে, পিছে পড়ে রইল হাজারো স্মৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি বিপ্লবের আজন্ম স্বপ্ন।

'পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা না নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়'

E-mail : hadi_islam77@yahoo.com

www.pathagar.com

সায়মা ইয়াসমিন সোমা

মল্লিক ভাইকে নিয়ে লেখার দু:সাহস আমার নেই। তবুও লিখতে বসেছি, আমি একজন সাধারণ শিল্পী মাত্র। লেখার ভাষা আমার জানা নেই। মল্লিক ভাই বেঁচে থাকলে হয়তো আমার লেখা পড়ে হাসতেন। ছোট কাল থেকেই মল্লিক ভাইর কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ হয়েছি। আইরিন আপার যখন বিয়ে হয় তখন আমরা অনেক ছোট। আর তাই মল্লিক ভাইকে দুলাভাইয়ের আসনে বসাতে পারিনি। প্রচন্ড ভয় পেতাম তাকে।

তিনি যখন ঢাকা থেকে ফরিদপুরে যেতেন আমাদের বাসায় তখন আমার ছোট বোন উর্মি আর আমি বুঝতেই দিতাম না আমরা কতটা দুষ্ট, সারাক্ষণ পড়ার টেবিলে বসে থাকতাম। তারপর আর একটু যখন বড় হই, মানে ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি তখন থেকেই পর্দার ব্যাপারে কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেল। এই জন্য তাঁর পরিবারে মল্লিক ভাইয়ের অবদান সবথেকে বেশি, আজ যখন কোন ভাল কাজ করে ফেলি, তখন তাকে বার বার মনে পড়ে। আমি মল্লিক ভাইয়ের একজন চরম ভক্ত। তার গান, তার সুর আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। মল্লিক ভাইয়ের গান এবং সুর একটু ভিন্ন রকম। তাই যখন তার গান কেউ বিকৃত ভাবে গায় অথবা সুর পাল্টিয়ে গায় আমি ভীষণ রেগে যাই।

যাই হোক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে তো আর সব গুন দিয়ে তৈরি করেননি। মল্লিক ভাই আমাকে শাকিলা জাফর (গায়িকা) বলে ডাকতেন। আর উর্মিকে ডাকতো শমি কায়সার (অভিনেত্রী) বলে। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে কত হাসাহাসি করতাম। সব মানুষের সাথে মেশার মত ক্ষমতা ছিল তার। তিনি বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসতেন। বাচ্চাদের সাথে যখন তিনি মিশতেন তখন তিনিও বাচ্চা হেয়ে যেতেন। বাচ্চাদের নিয়ে কত গান, কত যে ছড়া লিখেছেন, তার হিসেব নেই। আজ মল্লিক ভাই নেই, আছে শুধুই স্মৃতি, কত কিছু যে মনে পড়ে।

১৯৮৫ সাল তখন আমি অনেক ছোট মল্লিক ভাইয়েরা তখন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বাসায় ভাড়া থাকতেন। তখনকার কথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত যেসব প্রতিযোগিতা হত তার সব কটাতেই অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতাম। একবার জাতীয় পর্যায়ে এসে দেখলাম মল্লিক ভাই সেখানকার বিচারক। আমি একটু গায়ে জোর পেলাম। ভাবলাম দুলাভাই থাকলে আর চিন্তা কি। কিন্তু না তিনি আমাকে সব থেকে কম নম্বর দিলেন। বাসায় এসে তিনি আমাকে সরি বললেন, আমি সেবার সেকেন্ড হয়েছিলাম। অনেক কেঁদেছিলাম, মল্লিক ভাইয়ের উপরও রাগ করেছিলাম। কিন্তু সেদিন হয়তো বুঝতে পারিনি বা চিনতেও পারিনি তিনি কতটা তাকওয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

এরকম অনেক ঘটনা আছে যা আমাদের জন্য ছিল শিক্ষণীয়। প্রচন্ড অভিমানী ছিলেন তিনি, প্রায় এক বছর অসুস্থ্য থাকার পর জীবনের সমস্ত অভিমান বুকে চাপা দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে এক মাস অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। স্কয়ার হাসপাতালে মনে হত প্রতিদিন তাকে এক পলক দেখে আসি, আজ লিখতে বসে আমি আমার আবেগ ধরে রাখতে পারছি না। চোখের পাতা বার বার ভিজে যাচ্ছে। প্রায় দুই বছর হয়ে গেল মল্লিক ভাই নেই আমাদের পাশে, ভাবতে অবাক লাগে। আমরা ভুলতে চাইনা আর চাইনা বলেই লিখছি। আবার সেই মাহে রমজানন এসে গেছে যে মাসে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাকে নিয়ে গেছেন দুনিয়া থেকে।

পহেলা রমজান, তার আগের রাতে তখন বারোটা বাজে হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল-লাফ দিয়ে উঠলাম ভাবলাম সেহরী খেতে ওঠার জন্য কেউ হয়তো ফোন করছে। ফোনটা ধরা মাত্র জুম্মির কণ্ঠ (মল্লিক ভাইয়ের বড় মেয়ে) সোমা খালা মনি আব্বু আমাদেরকে রেখে জান্নাতে চলে গিয়েছে। আমি ফোনটা কেটে দিলাম। আর তখনই আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলাম, হে আল্লাহ আমার মল্লিক ভাইকে তুমি জান্নাতবাসী কর। সারাটা জীবন ইসলামের পথে থেকেছে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেরিয়েছে, তাকে তুমি ক্ষমা করো, তারপর নানা প্রশ্ন আমাকে তাড়া করতে লাগলো। আমার আপা যাকে তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন, জুম্মি, নাজমী, মুন্না প্রতিটা বাচ্চা আমার চোখের সামনে বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশেষে আমরা শীতের রাতে মোটর সাইকেল করে পৌছালাম জুম্মিদের বাসায়। ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল, মল্লিক ভাই সব থেকে বেশি যে সোফায় শুয়ে বসে থাকতেন সেদিকে বুকটা হু হু করে উঠল তার পর গেলাম, মল্লিক ভাইয়ের বই ঘরে। সেখানে যা দেখলাম তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মল্লিক ভাইয়ের সমস্ত কোরআন হাদিস বই পুস্তক মল্লিক ভাইয়ের জন্য কিভাবে কাঁদছে। আমি নিজেকে আর বুঝাতে পারলাম না। আমিও কাঁদতে লাগলাম আলতো করে মল্লিক ভাইয়ের শোকেচ খুললাম, একখন্ড তাফহিমুল কোরআন বের করলাম। কিছুক্ষণ মল্লিক ভাইয়ের সব থেকে প্রিয় তাফহিমুল কোরআন পারলাম, মনে হল মল্লিক ভাই দূরে দাড়িয়ে হাসছে। মল্লিক ভাই বেঁচে থাকলে সাহসও পেতাম না তার সোকেচে হাত দিতে। মল্লিক ভাই গোছানো ছিল না তবে খুবই যত্নশীল ছিলেন বইয়ের ব্যাপারে। তার পর সেহরীর সময় হল পানি খেলাম খেজুর খেলাম, একটু ভোর হতেই মল্লিক ভাই আসলেন তবে সেই মল্লিক ভাই আর এই মল্লিক ভাইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। সেই কবি কবি চোখ দেখতে পেলাম না, সে এখন ঘুমুচ্ছে প্রচন্ড অভিমানী হয়ে কারণ সে তো বাঁচতে চেয়েছিল। মনে মনে সেই গানটা গাইতে থাকলাম (মল্লিক ভাইয়ের) সেই অভিমানী মনে করে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবেনা।

একটু পরেই মল্লিক ভাইকে নিয়ে যাওয়া হল, মল্লিক ভাইয়ের বিদায়ের স্মৃতি আমি কোনদিনই ভুলবো না, আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

www.pathagar.com

মল্লিক সে তো গানের প.

কবি
মতিউর
রহমান মল্লিকের

প্রকাশিত অপ্রকাশিত লেখা

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক

"রাসূলের মধ্যে, রাসূল (সা:)-এর জীবনাচরণের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ'-এই আয়াত খুবই ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। রাসূলে মাকবুল (সা:) সবার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। পৃথিবীতে যত মতের, যত পথের, যত ধরনের মানুষ আছে , যত ধরনের কাজ তারা করছেন, সবার জন্যে রাসূল (সা:) হচ্ছেন উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ। কবিদের জন্যে, সাহিত্যিকদের জন্যে, সুন্দরের চর্চা যারা করেন তাদের জন্যেও রাসূলের মধ্যে উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। আমি প্রায়ই একটা কথা বলে থাকি যে, কবিদেরকে, বিশেষ করে রাসূলের এতো এত গভীরভাবে পৃথিবীর আর কোন মানুষ ভালবাসেনি, আমি যতটুকু লেখা-পড়া করেছি, যতটুকু রাসূলকে জানার চেষ্টা করেছি, এতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, আজকে যারা কবি সাহিত্যিক এবং এ জগতে যারা বিচরণ করেন তাদেরকেও রাসূলের চেয়ে বেশি করে ভালবাসার মানুষ পৃথিবীতে আসবেন না। আমাদের কাছাকাছি সময়ের একটু অতীতের বা বর্তমান সময়ের কোন নেতাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, কোন নেতাকে যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাদের মনে কবিদেরকে ভালবাসার যে আগ্রহ, যে ব্যাকুলতা তা রাসূল (সা:)-এর আগ্রহ এবং ব্যাকুলতার কাছে কোনদিনই ঠাঁই পায়নি। পাবেও না। পাওয়া সম্ভব না। আসলে সমস্যা হয়েছে কী, এদেশে রাসূল (সা:)-কে সাহিত্যের অঙ্গনে যাদের তুলে ধরার কথা ছিলো, তারা সব সময় রাসূলকে অন্যভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে, কোরআনের 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন' এই আয়াতাংশকে কেন্দ্র করে রাসূলকে, কবিতাকে, সাহিত্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা খুবই আপত্তিকর, 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন' এর অর্থ হলো- কবিরা বিভ্রান্তির উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়।' এখন আমদের দেশের অনেকেই এই আয়াতাংশটুকু সামনে রেখেই সব সময়ের জন্যে কবিদেরকে বিতর্কিত করেছে, কবিদেরকে জাহান্নামী করেছে, কবিদেরকে অপাঙক্তেয় করেছে, কবিদেরকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় একটি অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে। একদা এদেশেরই প্রখ্যাত আরবী জানা বিখ্যাত এক আলেম শিল্পকলা একাডেমীতে বসে কবি আল মাহমুদের সামনে "আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন" এর ব্যাখ্যা করছিলেন। ব্যাখ্যা করতে করতে সে আলেম এমন এক পর্যায়ে চলে গেলেন যে, আল মাহমুদ ভাই ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'মল্লিক, কবিদের অবস্থান যদি এই হয়, তবে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, এতকাল বসে কী করলাম! আমি চুপচাপ শুনছি- 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন' এর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। নাম বলতে আপত্তি কি? তোহা বিন হাবিব। শেষের দিকে যখন মাওলানা

www.pathagar.com

থামলেন এবং মাহমুদ ভাই ঐ রকম বললেন, তখন আমি মাওলানাকে বললাম, আপনি এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত কেন এখানে আল মাহমুদ ভাইয়ের সামনে ব্যাখ্যা করলেন না? শেষের দিকে 'ইল্লাল্লাজিনা আমানূ ওয়া আমিলুসসালিহাত' বলা হয়েছে। অর্থ, কবিদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে কল্যাণের কাজের সাথে জড়িত করেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তারা অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যাবে। চট করে সেই মাওলানা আমাকে বললেন, আপনি কি মাদরাসায় পড়েছেন? আমি বললাম যে, মাদরাসায় পড়ি আর না পড়ি, আপনি একটা আয়াতকে বিশ্লেষণ করবেন আর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তা বিকৃত করবেন, এটা কি করে হতে পারে?

আসলে এই যে আয়াত, এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল করিম (সা:) কবিদের সাথে খুব মজাও করেছিলেন। কবিদের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেলো, এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যে আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কবিরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (সা:) বললেন, হ্যাঁ তাই তো এ রকমই তো আয়াত নাজিল হয়েছে।' সবাই তখন কান্নাকাটি শুরু করলো। শেষের দিকে রাসূল (সা:) হাসতে হাসতে বললেন,'আয়াতের শেষ পর্যন্ত তো যাও। আয়াতের শেষ পর্যন্ত কী বলা হয়েছে, শোন, ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসালিহাত।' এ আয়াতের শেষাংশ শোনার সাথে সাথে কবি-সাহাবী যারা ছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে যারা এসেছিলেন, হাসতে হাসতে তারা চলে গেলেন। আসলে রাসূল (সা:)-কে এবং রাসূল (সা:)-এর কাব্যপ্রীতিকে, রাসূলের (সা:) কাব্যদর্শনকে সব সময়ের জন্যেই আমাদের দেশে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি বলবো, শুধু বিকৃতভাবেই নয় এসব সম্পর্কে দেশের তথাকথিতরা খুব কমই জানেন। এই না জানার কারণে এবং একটা বিদ্বেষের কারণে সব সময় বিকৃতভাবে রাসূল (সা:) সম্পর্কে, রাসূলের (সা:) কাব্যপ্রীতি সম্পর্কে, রাসূলের (সা:) কাব্যাদর্শ সম্পর্কে এখনও ঐ বিষয়গুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কবি এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে একজন মানুষই শুধু এসেছেন যিনি কেবল দিয়ে গেছেন এবং দিয়ে গেছেন। রাসূল (সা:) শুধু মানুষকে দেয়ার জন্যেই চেষ্টা করেছেন। সারা জীবন তার সাধনাই ছিলো মানুষকে কেবল দিয়ে যাওয়া আর দিয়ে যাওয়া। আর তোমরা যারা, তোমরা কেবল পৃথিবী থেকে নিতেই এসেছো। তোমাদের কাজ হলো একটা, শুধু একটাই তা হলো কেমন করে নেয়া যায়। তোমরা এই মানুষটির দিকে দেখো, যে মানুষটি সারা জীবনের সাধনার মধ্যদিয়ে কেবল পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করেছেন। আসলে পৃথিবীতে একজন মানুষই এসেছেন যিনি কেবল দিয়ে গেছেন, ভালবাসা বিলিয়ে গেছেন, সবাইকে। শুধু যে কবিদেরকে তা-ই নয়। এজরা পাউন্ডের কথাটা এখানে কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেই বললাম।

একজন চাষীর সাথে রাসূলের (সা:) খুব ভাল সম্পর্ক ছিলো, সেই চাষী (সাহাবী চাষী) থাকতো গ্রামে। যখন চাষী রাসূলের (সা:) কাছে যেতো, গ্রামের যে-সব মূল্যবান জিনিস যেমন-টাটকা তরিতরকারী, ফলমূল নিয়ে রাসূল (সা:)-এর দরবারে আসতো। যে-সব পেলে রাসূল (সা:) খুব খুশি হতেন। গ্রামের মূল্যবান জিনিস বলতে যা বোঝায় আর কী। আর রাসূল (সা:) তাকে দিয়ে দিতেন শহরের এমন সব মূল্যবান জিনিস যে-সব পেলে গ্রামের লোকেরা খুশি হয়। তাহলে দেয়া এবং নেয়ার যে পদ্ধতি, সে পদ্ধতি কি ধরনের হবে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি। সে চাষীর সাথে রাসূলের (সা:) এতটা গভীর সম্পর্ক হয়েছিলো

www.pathagar.com

যে, একবার রাসূল (সা:) দেখলেন, চাষী বাজারের একটি দোকানে কি যেনো দেখছে, বা কিছু কেনার জনে দরদাম করছে। রাসূল (সা:) চুপি চুপি গিয়ে তার দু'টি চোখ ঝাপটে ধরলেন। সে চাষী মনে করেছে যে, তার কোন সহযাত্রী বা তার কোন বন্ধু দুষ্টুমী করে তার চোখ চেপে ধরেছে। সে চিৎকার শুরু করেছে, 'এই চোখ ছাড়ো, চোখ ছাড়ো, ছাড়ো আমি চিনতে পেরেছি। তুমি অমুক' যা আমরা বন্ধু- বান্ধবের সাথে করে থাকি। রাসূল (সা:) তার হাতটা একটু ফাঁক করেছেন, চাষী দেখে কী যে রাসূল (সা:) পেছন থেকে চেপে ধরেছেন এবং মজা করছেন। তৎক্ষণাত রাসূল (সা:) মুচকি হেসে চাষীর একটি হাত ধরে উপরে উঠিয়ে চিৎকার করে বলছেন, 'এই কে আছো? একটা গোলাম আছে, একটা দাস আছে, বিক্রি হবে, বিক্রি হবে। একটা দাস, একটা গোলাম আমি বিক্রি করবো। 'তখন সে চাষী মুচকি মুচকি হেসে বলছে, ইয়া রাসূল্লাহ, আমার স্বাস্থ্য তো ভালো না, দেখতেও আমি সুবিধের না, আমাকে বিক্রি করে দাম তেমন পাবেন না। বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে না। তখন রাসূল (সা:) বললেন,'তোমার যে কত দাম আল্লাহর দরবারে, একজন ক্রেতা যদি বুঝতে পারতো তাহলে সে খুব দ্রুতই তোমাকে কিনে নিতো।' এভাবেই এক একজন চাষীকে, এক একজন গ্রামের মানুষকে রাসূল (সা:) ভালবেসেছিলেন। হাদীসটি আমি হুবহু না বলে ব্যাখ্যা করে বললাম।

আর কবিদেরকে যত ভালবেসেছিলেন, আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি তাতে বুঝতে পেরেছি যে, সত্যিকার অর্থেই যে কবিদের একটা আলাদা মূল্য, আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তা রাসূল (সা:)-ই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রাসূল (সা:) শুধু কবিদেরকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তা-ই নয়। খুব সহজেই, তিনি যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি কথাও বলেছিলেন।

শুদ্ধতম শব্দ আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। একজন মানুষই শুধু তাঁর নিজের সম্পর্কে শুদ্ধতম কথাটি বলেছিলেন। রাসূল বলেছেন 'আনা আফসাহুল আরব'। ওয়া ইন্নি মিন বনু সাদ বিন বকর' 'এবং আমি বনু সাদ বিন বকর সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছি।' দুটো কথা তিনি বলেছিলেন, 'আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বনু সাদ বিন বকর গোত্রে লালিত-পালিত হয়েছি।' বনু সাদ বিন বকরের গোত্র হলো সম্মানিতা হালিমার গোত্র। এই গোত্রটি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতো। আর কুরাইশদের সাহিত্যজ্ঞান, সাহিত্যের ব্যাপারে তাদের পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিলো অসাধারণ। যার ফলে চিন্তা, চেতনা ও ভাবনা এবং ভাষার দিক থেকে রাসূল (সা:) ছিলেন শুদ্ধতম। রাসূল (সা:) যখন বক্তব্য রাখতেন তখন সাহাবীরা অবাক হয়ে যেতেন। একবার আবু বকর (রা:) জিজ্ঞেস করছেন, 'ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার চেয়ে সুন্দরভাবে কথা বলার মতো আর একজনও আরববাসী নেই। এমন কোন মানুষ নেই, যে সুন্দরভাবে আপনার মত কথা বলতে পারে। আপনি তা শিখলেন কোথায়? কিভাবে আয়ত্ত করলেন এই মোহনীয় ক্ষমতা- ভাষার মধ্যে এবং ভাষার ব্যবহারের মধ্যে?' রাসূল (সা:) তার জবাবে বলেছিলেন, আমার ওপরে কোরআন নাজিল হয়েছে না? পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী একজন ডক্টর এই 'বনু সাদ বিন বকর' গোত্র সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি অনুবাদ হওয়া দরকার, চেষ্টা করা হচেছ, যাতে অনুবাদ করা যায়। রাসূল (সা:)-এর সাহিত্য ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে যে পরিসর দরকার, সে পরিসর

www.pathagar.com

এখানে আমাদের নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে এসব সম্পর্কে যদিও আলোচনা করা যায়।

রাসূল (সা:) কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, যে দু'টি মনোরম আচরণে কোন বিশ্বাসীকে আল্লাহ সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি'। অর্থাৎ, কোন বিশ্বাসীকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য কবিতার অপরিহার্যতাকে রাসূল (সা:) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং খুবই উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন। রাসূল (সা:) আরো বলেছিলেন আরবদের সম্পর্কে:

'আরবদের সুসংবদ্ধ কথা হলো এদের কবিতা। কবিতার ভাষায় কিছু চাইলে ওদের মন ভরে যায়। ওদের রোষের আগুন নির্বাপিত করে কবিতার অন্তসলিলা প্রভাব। 'আরবদের যে মনোবৃত্তি, আরবদের যে চেতনা, যে সৌন্দর্যবোধ তা রাসূলের চেয়ে চমৎকারভাবে আর কেউ বলতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। আরবদের যে রাগী স্বভাব, আরবদের যে মেজাজ, আরবদের বেপরোয়াভাব তাকে রহিত করতে পারে কবিতা।

রাসূল আরো বলেছেন, 'উট তার সকরুণ ক্রন্দন থামাতে পারে, কিন্তু আরবরা তাদের কবিতার সুর থামাতে পারে না।' কবিতার প্রতি আরবদের যে টান, যে মমতা; সে মমতা কখনো নি:শেষ হতে পারে না। এভাবে রাসূলে করীম (সা:) আরবদের কবিতা প্রেমকে আবিষ্কার করেছিলেন। কী ধরনের কবিতা রাসূল পছন্দ করতেন, সে সম্পর্কেও তিনি কথা বলেছেন, 'কারো মর্জির তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে গ্রথিত কথামালা মানুষকে দান করে অসীম মর্যাদা। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে লেখা কোন কথা তাঁকে পৌঁছে দেবে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে।' লেখকদের এটা জানা উচিৎ, সেই লেখকই অপরিসীম মর্যাদা লাভ করতে পারে, যে কারো তোয়াক্কো না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে লেখে। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে শুধু মানুষের মনোহরণের জন্য লেখা কোন কথা তাকে জাহান্নামের দরোজায় পৌঁছে দেবে। যে কোন কিছু রচনা করার সময় আল্লাহর শাস্তির কথা চিন্তা করে না, তার লেখাই তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

রাসূল (সা:) আরো বলেছেন, 'শুধু মানুষের হৃদয় কেড়ে নেবার জন্যে যে মনোহর কথা বানানো শেখে, কিয়ামতের মাঠে তার কোন বিনিময় গৃহীত হবে না।'

শালীনতা সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর বক্তব্য হচ্ছে, কবিতা ও সাধারণ কথা-বার্তার বিচার একই নীতিতে হবে। অনাবিল এবং পরিমল কথাবার্তার যে মূল্য, শ্লীল কবিতার সেই একই নীতিতে হবে। অনাবিল অপ্রীতিকর, অশ্লীল কবিতাও তেমন। এ প্রসংগে রাসূল (সা:) আরো বলেছেন, যে ইসলাম গ্রহণের পরও অশ্লীল কাব্য ছাড়তে পারলো না, সে যেনো তার জিভটাকে নষ্ট করে ফেললো।' তিনি আরো বলেছেন, "মুমিন কোনদিন মিথ্যারোপ করতে পারে না, পারে না অভিশাপ দিতে; সে কখনও অশ্লীল হতে পারে না, পারে না নির্লজ্জ হতে।" এভাবেই রাসূলে করীম (সা:) সব কিছুকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের একজন আরবী ভাষার পন্ডিত, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ ওয়ালিদ কাসসাব সাহিত্য সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর বেশ কিছু বক্তব্য ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। সাহিত্য সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রাসূলের রয়েছে। এগুলো পড়ে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। রাসূল (সা:) পুরুষ কবিদের কবিতাই শুনেছেন তা নয়। তিনি মহিলা কবিদের কবিতাও

www.pathagar.com

শুনতেন। একজন মহিলা কবি যার নাম হচ্ছে কবি খানসাকে (রা:)। তিনি ছিলেন আরবেরী একজন নামকরা মহিলা কবি। কবি খানসা (রা:) কখনো কখনো রাসূল (সা:) বলতেন, 'কবিতা শোনাও তো দেখি।' এই মহিলা কবি খানসা (রা:) রাসূল (সা:)-কে কবিতা শোনাতেন।

বদরের যুদ্ধে যখন সাহাবীরা জয় লাভ করলেন, বদরের যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ শহরে পৌঁছে দেবার জন্যে দু'জন কবিকে বেছে নিয়েছিলেন; একজন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:), আরেকজন খুব সম্ভব কা'ব বিন মালিক (রা:)। এ দু'জনকে বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ পৌঁছে দেবার জন্যে রাসূল (সা:) নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মক্কা যখন বিজিত হলো, রাসূল (সা:) যখন মক্কায় প্রবেশ করছেন, সে সময়ও একজন কবিকে সংগী নিয়োজিত করেন তিনি। আর তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ পৌঁছে দেবার জন্যেও রাসূল (সা:) কবিকে সাথে রাখছেন, আবার মক্কা বিজয়ের সময়েও রাসূল (সা:) একজন কবিকে তার পাশে পাশে রাখছেন। এই আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:) অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন, যোদ্ধা ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন। রাসূল (সা:) তার উপর এতোটা আস্থা স্থাপন করেছিলেন যে, যখন রাসূল (সা:) বাইরে গেছেন যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় সফরে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে কখনো কখনো রেখে গেছেন তাঁকে। শুধু কথায় রাসূল (সা:) কবিদের মর্যাদা দেননি, কার্যকরণগত ব্যাপারেও রাসূল (সা:) কবিদেরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কবিদেরকে পাগল, উৎকট ব্যবসায়ী কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে রাসূল (সা:) মনে করেননি। আজকে যারা কবিদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে মনে করেন তারা রাসূল (সা:)-এর সুন্নতকে অবহেলা করছে। তারা কিছুই জানে না; অথচ সবকিছু জানে বলে মানুষের কাছে নিজেদেরকে পরিচিত করছে। এসব আহমকদের কবল থেকে জাতি যেদিন রেহাই পাবে, সেদিন জাতির সত্যিকারের মুক্তি আসবে আমাদের মনে হয়।

রাসূল (সা:) এতোটা বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, কোন কবি ভালো কবিতা লিখতে পারে- সে খবরও তাঁর ছিলো। যখন বাতিলপন্থী কবিরা ও ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে, নবীর বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে লাগাতার কবিতা লিখে যাচ্ছে ও লাগাতার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তসলিমা নাসরীনদের মতো লাগাতার প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। লাগাতার বিভিন্ন জায়গায় তারা কথা বলে বেড়াচ্ছে। এই রকম সময় রাসূল (সা:)-কে একজন সাহাবী ধরে বসলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জবাব দেওয়া উচিৎ। তখন রাসূল (সা:) বলেছেন, 'তোমরা যারা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছো, তোমাদেরকে কে নিষেধ করেছে, কবিতা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে? তারপর আলী (রা:) এলেন।

আলী (রা:) আসার পর রাসূল (সা:) বললেন, আলীকে দিয়ে সম্ভব নয়। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:) এলেন। রাসূল (সা:) বললেন, রাওয়াহাকে দিয়েও সম্ভব নয়। তারপর এলেন হাসসান বিন সাবিত (রা:)। হাসসান বিন সাবিত (রা:) আসার পর রাসূল (রা:) খুশি হয়ে বললেন, 'তোমাকে কে পাঠালো ভাই? আর তোমার কবিতার শব্দ তো সিংহের লেজের মতো।' অর্থাৎ তার কাজ তো সিংহের কাজের মতো, সিংহের গর্জনের মতো। তার উচ্চারণ বিষধর সর্পের মতো যা ছোবল মারে। আমার কি মনে হয় জানেন? হাসসান বিন সাবিত

www.pathagar.com

(রা:) যেন লজ্জায় জিভ কামড়ে দিচ্ছেন। লজ্জায় রেঙে গেছে তার গাল দুটো। আসলে কবিদের স্বভাবত একটু লজ্জা থাকে। জিহ্বা নাড়াতে নাড়াতে তিনি বলেছেন, 'আমার একটা জিহ্বাই যথেষ্ট এসব কিছুর মোকাবেলা করার জন্যে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, হাসসান বিন সাবিতের জন্যে রাসূল (সা:) মসজিদের ভেতরে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে কবিতা পড়ার জন্যে আলাদা মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা:) যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন, সে মঞ্চ রাসূলের জন্যে ছিলো। কিন্তু কবি হাসসান বিন সাবিতের (রা:) জন্যে আলাদা একটি মঞ্চ করে দিয়েছিলেন রাসূল (সা:)। রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পরে কোন এক সময় হাসসান বিন সাবিত (রা:) দলবল নিয়ে মসজিদে নববীতে কবিতা পড়েছিলেন। খলিফা ওমর ফারুক (রা:) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হৈ, চৈ দেখে চিৎকার করে উঠলেন, মসজিদের মধ্যে আবার এ ধরনের শোরগোল কেন? বর্তমান সময়ের ভাষা অনুযায়ী দুনিয়াদারী কাজ। হাসসান বিন সাবিত দাঁড়িয়ে বলেন, 'তুমি কে কথা বলার? আমি হচ্ছি সেই হাসসান, যার জন্যে রাসূল (সা:) নিজে মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি নবীর মসজিদের ভেতরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছি। তুমি কে কথা বলার? খলিফা ওমর (রা:) মাফ চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কবিরা অনেক সময় একটু গীবতপ্রিয় হয়। এর্ কবিতা পড়তে শুরু করলেন। সাহাবীরা বলছেন-' মরে যাচ্ছে একটা মানুষ, তার সামনে কি এখন কবিতা পড়ার সময়? এখন তো কোরআন পড়ার সময়।' আয়েশা (রা:) কেঁদে দিয়ে বললেন, 'আব্বা কবিতা খুব পছন্দ করতেন। আমার ধারণা, এই কষ্টের মুহূর্তে যদি কবিতা শোনানো যায় আব্বা একটু আরাম পাবেন।' এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সা:)-এর স্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর পিতার কাবপ্রেম সম্পর্কে কা'ব বিন মালিক (রা:) একবার রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন রাসূল (সা:) বললেন, 'ইন্নাল মুমিনা যুজাহেদু ফি সাইফিহী ওয়া লিসানিহ'- অর্থ 'একজন মুমিন যুদ্ধ করে তরবারী দিয়ে ভাষা দিয়ে।' রাসূলে আকরাম (সা:)-এর কবি ও কবিতার প্রতি যে ভালবাসা, সে ভালবাসা সম্পর্কে ডঃ ওয়ালিদ কাসসাব ৪৬টি হাদীস সংগ্রহ করেছে।

আজকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে রাসূলের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আবিষ্কার করা। রাসূল (সা:)-এর যে বিশ্বাস, রাসূল (সা:)-এর যে ধারণা, রাসূল (সা:)-এর যে উক্তি রাসূল (সা:)-এর যে বক্তব্য, সে বক্তব্য সরাসরি আবিষ্কার করা। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে আমাদের দেশেরই কয়েকজন ছাত্র। যাদের কাছে মনে হয়, আরবী বাংলাভাষার চেয়ে সহজ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে সালাম আজাদী অন্যতম। আমার সাথে তাদের চিঠির আদান-প্রদান হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তাঁদের পাঠানো একটি চিঠি পড়ে। লিখেছেন গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। গল্প সম্পর্কে রাসূল (সা:)-এর যে দিক নির্দেশনা, সে দিকদর্শন সম্পর্কে। আল্লাহর রাসূল কতটা আধুনিক ছিলেন যে, সেই সময়ে গল্প সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। আজকের দুনিয়াতে সাহিত্য ক্ষেত্রে গল্পের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করছি। গল্প সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্পের যে গুরুত্ব সেটা লক্ষ্য করছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সামনে রেখে রাসূল (সা:)-এর যে বক্তব্য, যে উক্তি সেগুলো যদি আজকে আমরা বিশ্লেষণ করতে

www.pathagar.com

পারি তাহলে সত্যিকার অর্থে আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবো- সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাসূল (সা:) যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সে দিক নির্দেশনাই হচ্ছে সত্য-সুন্দরের ক্ষেত্রে যথার্থ সাধনার পদ্ধতি ও নীতিমালা।

শুধু ওই প্রবন্ধই নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বড় বড় বেশ কয়েকটি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলো আমাদের দেশে এসে গেলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো, আমরা এই আস্থা স্থাপন করতে পারবো, রাসূলের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাষণ এবং অভিভাষণ, বক্তব্য এবং বাণী ও দিক-নির্দেশনা কত চমৎকার। কত অমূল্য।

আমি কার্লাইলের একটা বিষয় কিছু দিন আগে পড়ছিলাম। পড়তে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, যখন ইউরোপ রাসূল (সা:) সম্পর্কে মনীষীরা নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তখন কার্লাইল খুব বলিষ্ঠভাবে রাসূল (সা:)-এর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যখন রাসূলের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দুনিয়ার ইউরোপ ও বৃটেন বুদ্ধিজীবীরা কুৎসা ও কটূক্তি করছে তার জবাবের জন্যে টমাস কার্লাইল দাঁড়িয়েছিলেন। টমাস কার্লাইল অসম্ভব সাহসিকতার সাথে পাশ্চাত্য মনীষীদের কটূক্তির জবাব দিয়েছিলেন।

জার্মানীর মহাকবি গ্যেটে তো মহানবী (সা:)-এর প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তিনি মহানবী (সা:)-এর জীবনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। সুন্দরভাবে মহানবীর চরিত্রকে ব্যাক গ্রাউন্ডে রেখে তৎকালীন আরব পরিস্থিতি এবং মানব সভ্যতার রাসূল (সা:)-এর ভূমিকা টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জার্মানীতে কোন মঞ্চ সে নাটক গ্রহণ করেনি।

অবাক লাগে যখন পড়ি বিধর্মী বিবেকসম্পন্ন পন্ডিতগণ রাসূল (সা:)-এর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবা খলিল জিবরানের মতো কবি, যিনি খ্রিস্টান হয়েও রাসূল (সা:)-এর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন; তখন আমাদের সমাজেরই সন্তান, আমাদের দেশেরই সন্তান, দাউদ হায়দারের মতো কবি কি করে লিখতে পারে: বধির্দ্রুত ছায়াতলে বসে আছে বুদ্ধ, মুহাম্মদ তুখোড় বদমাশ/চোখে মুখে রাজনীতি (নাউজু বিল্লাহ মিন জালিক)।

আজকে যদি রাসূল (সা:)-এর সমস্ত দিক ও বিভাগ জনগণের কাছে পরিষ্কার এবং পরিচিত থাকতো, তবে দাউদ হায়দারের জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতো এদেশের মানুষ এবং রাসূল (সা:), কোরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য তসলিমা নাসরীন গোটা দুনিয়ায় দিয়ে বেড়াচ্ছে, রাসূল (সা:) সম্পর্কে আজকের এই সমাজের মানুষ, সাহিত্য- সংস্কৃতি সেবকরা যদি জানতো রাসূল (সা:) কতটা আধুনিক ছিলেন, কতটা মানবকল্যাণকামী প্রগতিশীলতার অধিকারী ছিলেন, যে প্রগতি ও আধুনিকতা মানুষকে প্রকৃত আশরাফুল মাখলুকাত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বয়ে আনে কল্যাণ, তবে তসলিমা নাসরীনের জায়গা হতো ড্রেনে। ড্রেনের কীটদের খোরাক হতো সে, এটাই হতো তার শেষ পরিণতি।

আমাদের দু:খ হলো আমরা রাসূলের কোন দিকই স্পষ্ট করে জানি না। রাসূল (সা:)-এর অর্থনীতি, রাসূল (সা:)-এর সমাজনীতি, রাসূল (সা:)-এর রাজনীতি, রাসূলের সমরনীতি, রাসূল (সা:)-এর খাদ্যনীতি, রাসূলের সাহিত্যনীতি, রাসূল (সা:) -এর পথচলার নীতি,

www.pathagar.com

রাসূল (সা:)-এর অভিভাষণের নীতি, রাসূল (সা:)-এর বক্তব্য রাখার নীতি কোনো একটা নীতি সম্পর্কেও আমাদের খবর নেই। সেই জন্যে এতো বড় একটা জাতি হওয়ার পরও আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো বিপুল জনশক্তির অধিকারী হবার পরেও আমরা থরথর করে কাঁপছি প্রতিদিন আমরা ভারতের ভয়ে কাঁপছি, আমরা গোটা দুনিয়ার ভয়ে কাঁপছি। যদি কারো একবার কাঁপন শুরু হয়ে যায়, যে দিক থেকেই ভয় আসে তার উল্টো দিকে গড়িয়েই সে কাঁপতে থাকে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করে আমরা যেদিক থেকেই ভয় আসছে তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে কাঁপছি। এর একটি মাত্র কারণ, তা হলো রাসূল (সা:) যে ধরনের মানুষ ছিলেন, সেই একজন রাসূলকে আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। আমাদের উচিত, যে যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়েই রাসূল (সা:)-কে সার্বিকভাবে উপলব্ধি করা।

যে অধ্যাপক, সে আবিষ্কার করুক রাসূল (সা:)-এর শিক্ষানীতি কী? যে আইনজীবী, সে আবিষ্কার করুক রাসূল (সা:)-এর আইন কী? যে শিল্পী সে আবিষ্কার করুক আঁকিঝুকির ব্যাপারে রাসূল (সা:)-এর কী সিদ্ধান্ত? সাংবাদিক আবিষ্কার করুক তাঁর সংবাদনীতি, সাহিত্যিক আবিষ্কার করুক তাঁর সাহিত্যনীতি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন, রাসূল (সা:)-কে আবিষ্কার করার এবং যে বেদনা অনুভব করেছিলেন কবি নজরুল, সে বেদনা আমাদের মাঝেও আল্লাহ পাক জাগ্রত করুন-সম্ভবত বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে; বাংলার কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাসূলকে চিনতে পেরেছিলেন নজরুল। তিনি বলেছেন-

'পাঠাও বেহেশত হতে হযরত পুনঃসাম্যের বাণী

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মলি□ক

পঙ্গপালগীতিকা ২০০৮

কোন আঁধারের গহবর থেকে
অন্ধ পঙ্গপাল
উড়ে এসে জুড়ে বসে ফসলের
ক্ষেত করে পয়মাল!

ধান খেয়ে যায় পান খেয়ে যায়
গান খেয়ে যায় প্রাণ খেয়ে যায়
পাট খেয়ে যায় মাঠ খেয়ে যায়
ভাঁট খেয়ে যায় ঘাঁট খেয়ে যায়
মেঘ খেয়ে যায় ভেক খেয়ে যায়
রেক খেয়ে যায় রেখ খেয়ে যায়
পাতা খেয়ে যায় মাথা খেয়ে যায়
বাতা খেয়ে যায় রাতা খেয়ে যায়
ফুল খেয়ে যায় কুল খেয়ে যায়
কূল খেয়ে যায় মূল খেয়ে যায়
গরু খেয়ে যায় চরু খেয়ে যায়
তরু খেয়ে যায় মরু খেয়ে যায়
ঘাস খেয়ে যায় শাঁস খেয়ে যায়
হাঁস খেয়ে যায় মাষ খেয়ে যায়
পাখি খেয়ে যায় রাখি খেয়ে যায়
হাসি খেয়ে যায় বাঁশী খেয়ে যায়
খায় বন- বনোতল
খেয়ে খেয়ে সারা করে দেয় যত
সবুজের অঞ্চল।

হাট-ঘাট খায় কাঠ-খাট খায়
গাঁঠ-গাঁত খায় আঁট-সাঁট খায়
চাল-ডাল খায় তাল-ঝাল খায়
আজকাল খায় হালচাল খায়
দর্জিও খায় মরজীও খায়
সবজিও খায় কবজিও খায়
মুড়কিও খায় সুরকিও খায়

www.pathagar.com

মুরগিও খায় গুড়-ঘিও খায়
লংকাও খায় টংকাও খায়
সংজ্ঞাও খায় জংঘাও খায়
বাজারও খায় মাজারও খায়
খাঁজারও খায় সাঁঝারও খায়
অন্দর খায় বন্দর খায়
ঘরদোর খায় অন্তর খায়
আমদানী খায় জামদানী খায়
রফতানী খায় রথ-রাণী খায়
আসনও খায় শাসনও খায়
বাসনও খায় ভাষণও খায়
খাই-খাই-খাই-কল
খায়রে আকাশ খায়রে বাতাস
খায়রে জলস্থল।

অংশও খায় বংশও খায়
অংগও খায় সংঘও খায়
আধুলিও খায় মাদুলীও খায়
গা-ধূলিও খায় পা-ধূলিও খায়
ছন্দও খায় গন্ধও খায়
খন্দও খায় নন্দ্যও খায়
পদ্যও খায় গদ্যও খায়
মদ্যও খায় বৈদ্যও খায়
তথ্যও খায় সত্যও খায়
পথ্যও খায় বস্তুও খায়
অন্নও খায় বস্ত্রও খায়
সৈন্যও খায় অস্ত্রও খায়
অর্থও খায় শর্তও খায়
স্বর্গও খায় মর্ত্যও খায়
ইজ্জত খায় হিম্মত খায়
কুওয়ত্ খায় উখ্ওয়ত্ খায়
তখ্তও খায় রক্তও খায়
শক্তও খায় ভক্তও খায়
খেয়ে করে রসাতল
উড়ে এসে বসে সব জায়গায়
এ-কোন গন্ড-গল।

www.pathagar.com

দধি যার খায় গদি তার খায়
অধিকার খায় অঙীকার খায়
অলিগলি খায় তলি-থলি খায়
কলবলি খায় খল-খলি খায়
ফলাফল খায় চলাচল খায়
জলা-জল খায় হলাহল খায়
রাজনীতি খায় কাজনীতি খায়
মাঝনীতি খায় তাজনীতি খায়
ঘরনীতি খায় পরনীতি খায়
চর-নীতি খায় ঝড়-নীতি খায়
জননীতি খায় গণনীতি খায়
ধননীতি খায় রণনীতি খায়
পাঠনীতি খায় আর্টনীতি খায়
ঠাটনীতি খায় ডাঁটনীতি খায়
খোদ্ নীতি খায় রোধ-নীতি খায়
বোধ-বোধি খায় নদ-নদী খায়
মিডিয়াও খায় পিডিয়াও খায়
চিরিয়াও খায় ছিঁড়িয়াও খায়
ধর্মও খায় বর্মও খায়
কর্মও খায় ঘর্মও খায়
খেয়ে করে পেট ডোল
এ-জাতির ঘাড়ে চাপলো এ-কোন
বেতমীজ বেক্কোল।

চিকিৎসা

অনেক রঙের জোয়ার-ভাটার পর আমি
ডাক্তার মুকীতের ডাঙ্গায় উঠে দাঁড়ালাম
অসহায়
বিব্রত
বিধ্বস্ড়
তারপর মুঠো মুঠো নিরাময়ের মধ্যে
মুখ গুজে শুয়ে থাকলো
বোবা কান্নার মতো সময়
তরজমাহীন ব্যথা
বিস্ড়রিত বেদনার খরগোশ

www.pathagar.com

অর্থাৎ চিকিৎসার গোটা অর্থই এখন দাঁড়িয়েছে
একবোঝা ইনজেকশন, অপারেশনের তোড়জোর
ক্ষমাহীন পর্যবেক্ষণ এবং মাঝে মাঝে
কাটা-ছেড়ার মতো তৎপরতা
হায়! আমার কোনো ডানা নেই
যেনো জন্ম হয়েছিলো বিছানায় পড়ে পড়ে
কালান্তরের কংকাল গণনার জন্য
মাবুদ, চিকিৎসার সমুদয় দায়িত্ব তুমিই নাও
আমি আর পারছি না।

শহীদ অধ্যাপক গাজী আবুবকর স্মরণে

অজেয়

বোমা মেরে মেরেমারুক মুফাস্‌সীর,
বেঁচে রবে তবু পবিত্র তাফসীর;
যুগ যুগ ধরে তাফসীর কথা বলে,
মুফাসইসরেরা হয়তোবা যায় চলে।

আলেমে দ্বীনেরা হয়তোবা চলে যায়,
সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুর হামলায়!
ন্যায়বাদীদের হয় জানি জান দিতে-
গডফাদারের খুনখেকো ইংগিতে।

বাড়ুক না যত ওৎ পেতে থাকা গ্রাস,
বেড়াকনা ঘুরে নির্মম সন্ত্রাস,
উঠুক না মেতে হন্তারকের দল,
তবু শাশ্বত আদর্শ অবিচল।

তবু মরবে না অজেয় চির অমর-
মাওলানা গাজী শহীদ আবু বকর।

শোধ

বন্ধু আমার এখানেই ছিলো, এখন এখানে নেই,
পাওয়া যেতো যারে দুই হাত বাড়ালেই,
যারে পাওয়া যেতো এক ডাকে, দুই ডাকে,
পাওয়া যেতো যারে স্নিগ্ধ হাসির বাঁকে।

www.pathagar.com

সংগী আমার মাহফিলে গিয়েছিলো,
ফিরে আসাবার কথাও সে দিয়েছিলো,
তাফসীর শেষে ফিরেছে সে বহুবার,
আবার ফিরেছে-ফিরবে না কভু আর।

হৃদয় আমার বাকহীন হয়ে আছে,
অশ্রুও নেই দুচোখের ধারে কাছে,
বাঁচাবার নেশা ছড়ায় না কোন রঙ,
ঘর-সংসার শূণ্য সব বরং!

তবু বাঁচবোই জীবনের সংগীতে,
আমার লোকের রক্তের শোধ নিতে।

বীজ

নিহত মানুষ তলোয়ার হতে পারে-
আঁধারবিনাশী সাহসের বিদ্যুৎ-
তপ্তলহুও সাহসই কাটে ধারে,
খুন খেয়ে যেই হয়েছে ডোল তাগুত।

আমরণ এক আজীবন হয়ে যায়,
আল-কোরানের দু-ধারী অধ্যাপক,
বাঁক ঘুরে ঠিক শাহাদাৎ খুঁজে পায়;
অথচ বাতিল ঢেলেছিলো হেমলক।

সমূহ অচেনা সব চেয়ে চেনা আজ,
জেহাদে যখন জিন্দেগী খোয়া গেছে,
এবং অশেষ ঈমানের কারুকাজ-
যেখানে অথৈ অশ্রুও থোয়া গেছে!

জেহাদে যখন জিন্দেগী খোয়া গেছে-
বিজয়ের বীজ অগণিত রোয়া গেছে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম

আমাদের মাঝে অনেকের প্রিয় মানুষ অনেক আছেন কিন্তু সবার প্রিয় মানুষ ক'জন? আসলে সবার প্রিয় মানুষ হওয়া খুব সহজ নয়। আমাদের চারপাশে সবার প্রিয় মানুষের সংখ্যা সত্যিই হাতে গোনা। ইসলামী আন্দোলনের কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই সেই সবার প্রিয় মানুষদের অন্যতম। এমন একজন মানুষ যাকে সকলে ভালোবাসে, নিবিড়ভাবে ভালোবাসে, বিপুলভাবে ভালোবাসে, সবার সামনে ভালোবাসে এবং সবার অলক্ষ্যে ভালোবাসে। মল্লিক ভাই আমাদের সকলের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। স্বার্থপর একটি সমাজে সারাটা জীবন অতিবাহিত করার পরও একজন বঞ্চিত মানুষ কতটা পরার্থপর হতে পারেন, হিংসাকাতর একটি সমাজের সদস্য হয়েও একজন মানুষ কতটা অহিংস হতে পারেন এবং একটি পংকিল সমাজে দীর্ঘকাল বসবাস করেও একজন সত্যপ্রিয় মানুষ কতটা পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন তার একটি আদর্শ মাপকাঠি হতে পারেন আমাদের সকলের প্রিয় মল্লিক ভাই।

মল্লিক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় চার দশকের বেশী সময় ধরে। প্রথম পরিচয়ের সময়ে দুজনেরই কিশোর বয়স। সে পরিচয়ের সূত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর প্রতি ভালোবাসা, জান্নাতের অদম্য আকাংখা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়। এ সম্পর্ক ছিল একত্রে পথ চলার সম্পর্ক; নিরন্তর ছুটে চলার সম্পর্ক। এই চলার পথে প্রতিবন্ধকতা কেবলই হার মানে; স্বপ্ন ও সংকল্পের প্রবল স্রোতের তোড়ে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। সেই সম্পর্কের ছবি নিজের ক্যানভাসে এঁকেছেন প্রিয় কবি মল্লিক ভাই;

'আমাকে দাও সে ঈমান আল্লাহ মেহেরবান
যে ঈমান ফাঁসির মঞ্চে অসংকোচে গায় জীবনের গান।.....
সেদিন যেমন পেরিয়ে গেছি সকল বাঁধাগুলো
সকাল সাঝে থাকতো লেগে পায়ে পথের ধুলো।'

হ্যাঁ পাঠক, এ গান শুধু কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠেই মানায়। এ তো আসলে গান নয়-প্রিয় কবির আত্মজীবনীর একটি স্বপ্নময় অধ্যায়। মল্লিক ভাইয়ের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তারা জানেন কত ধুলা পায়ে মেখে তিনি এই গান লিখেছিলেন। এক দিনের কথা সারা জীবন আমার মনে থাকবে। সে ছিল রমজান মাস। দু'জনেই রোজা রেখেছি। ইসলামী দাওয়াতের কাজে বাগেরহাট থেকে যেতে হবে মোরেলগঞ্জের কাছিকাটা গ্রামে। সুদীর্ঘ পথ যেতে হবে পায়ে হেটে। তখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে পয়সা থাকতো না। অনেক সময় নাস্তা বা খাবার জুটতো না, এমনকি ট্রেন-বাসে টিকেট

www.pathagar.com

কাটার পয়সাও যোগাড় হতো না। যাহোক, দিনভর মল্লিক ভাই ও আমি রোজা রেখে হেটে চলেছি। পথের দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের দু'জনেরই কোন ধারণা নেই। আগে কখনো ঐ এলাকায় যাইনি। হাটতে হাটতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মল্লিক ভাই নিজের কথা ভাবছিলেন না; মনে হচ্ছিল তাঁর সমস্ত দূর্ভাবনার কারণ আমি। নিজের ক্লান্তি শিকেয় তুলে রেখে তিনি কেবল আমাকে সান্তনা দিচ্ছিলেন। এইতো এসে গেলাম- কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব ইত্যাদি। এক সময় সন্ধা ঘনিয়ে এলো, মানে ইফতারের সময় হলো। ইফতার করার তেমন আয়োজন ছিল না। বেশ মনে আছে, দু'ভাই কিছু মুড়ি এবং কলা কিনে হাটতে হাটতেই খেয়ে নিচ্ছিলাম। সন্ধা হয়ে যাওয়ায় কিছুটা ভয়ও লাগছিল। কারণ অপরিচিত জায়গা। আর তখন দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিও খুব নাজুক ছিল। সন্ধার পরও এভাবে ৩/৪ ঘন্টা হাটলাম। কিন্তু গন্তব্যের দেখা আর মেলে না। এক সময় সত্যি সত্যিই আমি বেশ ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম। মল্লিক ভাই বেশ বুঝতে পারছিলেন আমার অবস্থাটা। এক সময় কোথাও সামান্য বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করলাম বলে মনে পড়ছে। কিন্তু সত্যি বলতে বিশ্রামের সুযোগ ছিল না কারণ রাত ক্রমে গভীর হচ্ছিল। মাঝে মধ্যেই কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করছিলাম গন্তব্য আর কত দূরে। অনেক দূরে কোন পথের বাঁক চোখে পড়ছিল আর মনে মনে ভাবছিলাম, এর পরই হয়তো শুনবো কাছিকাটা গ্রামে পৌঁছে গেছি। এই কষ্টের মধ্যে কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাকে চাঙ্গা রাখছিলেন তাঁর সুমধুর কণ্ঠে স্বরচিত গান শুনিয়ে যার কয়েকটি লাইন এখনো কানে বাজে।

'চলো চলো, চলো মুজাহিদ পথ যে এখনো বাকী
ভোল ভোল ব্যথা ভোল, মুছে ফেলো ঐ আঁখি
ক্ষুধায় কদম চলতে চায় না
দৃষ্টি পথের সীমা পায় না
বাঁকের পরে বাঁক যে এসে দূরের সাথে বাঁধে রাখি।'

এই স্বভাব কবি গানটি তখনই রচনা করেছিলেন কি না জিজ্ঞেস করিনি। তবে সেদিন তাঁর দীর্ঘ পথ চলার সাথী হিসেবে এই গানটিকে আমি যে ভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তা আর কারো ভাগ্যে জুটবে কি না জানি না। রাত দশটার দিকে আমরা গন্তব্যে পৌছলাম।

অর্থকড়ির আধিক্য ইসলামী আন্দোলনের জন্য ভালো না খারাপ তার সমাধান আজো করা যায়নি। মল্লিক ভাইয়ের অসাধারণ সাহচর্যে আমরা যখন কাজ করেছি তখন অর্থের আকাল ছিল কিন্তু কাজে বরকত ছিল প্রচুর। জনশক্তির মধ্যে লোভ ছিল না মোটেই-উপরন্তু ত্যাগের প্রতিযোগিতা ছিল। বিশেষ করে মল্লিক ভাইয়ের মত ত্যাগী সিপাহসালার যখন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তখন সাধারণ কর্মীদের ত্যাগ তো একটা ভিন্ন মাত্রা পাবেই। বেশ মনে আছে, সে সময়ে ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার পায়ে হেটে এসে প্রোগ্রামে অংশ নেয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। কপর্দকহীন পথযাত্রার উদাহরন তখন মোটেই দুস্প্রাপ্য ছিল না। শুধুমাত্র চিড়ে মুড়ি সম্বল করে দিনের পর দিন মফস্বলে সফর করা এমনকি প্রয়োজনে অনাহারে থেকেও কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কঠিন শপথ ছিলো প্রায় সকলের মধ্যে। অভিযোগ অনুযোগ ছিলনা; ত্যাগ ও তিতিক্ষার নতুন মাইল ফলক নির্মানের প্রতিযোগিতা ছিল। এই প্রতিযোগিতার পুরোভাগে ছিলেন আমাদের প্রানপ্রিয় মল্লিক ভাই। এমনও কখনো

www.pathagar.com

হয়েছে যে, পয়সার অভাবে কর্মীদের ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজে কয়েক কিলোমিটার হেটে গেছেন শুধু ট্রেনভাড়া যোগাড় না হবার কারণে।

দায়িত্ব কখনো নিতে চাননি কিন্তু অর্পিত দায়িত্ব পালনে শিথিলতা ছিলনা কোনকালেই। তাঁর কর্মীরা ছিলো বরাবরই সৌভাগ্যবান। কারণ, এত নেগাহবানী এত যত্ন এবং আদর দেবার মত নেতার জন্ম খুব কমই হয়েছে। কর্মীদের যে কোন কষ্ট তাঁকে ভীষন পীড়া দিত। একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন,

'হাদী না খেয়ে আছে
মোশারফ পথে পথে ঘোরে
একশো পঁচিশ টাকায় কয়দিন চলে?'

হ্যা, একশো পঁচিশ টাকায়ই দিন-মাস চলেছে আর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নতুন নতুন ইতিহাস। এই ইতিহাসের কাঠগড়ায় আজ আমরা সবাই আসামী। প্রাচুর্যের আকাঙ্খা, সম্পদের প্রতিযোগিতা আমাদের ঈমানের নূরকে অনুজ্জ্বল করে দিচ্ছে কি না তা পূনর্বিবেচনার সময় এসেছে।

এমন ক'জন মানুষ আছে আমাদের মাঝে যাদের সমালোচনা হয় না, প্রায়শঃ যাদের কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক খুঁজে পাওয়া যায় না? অল্প ক'জনের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক যিনি মাত্র কিছুদিন আগে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন তাঁর রবের কাছে। সাদাসিধে জীবন, অমায়িক ব্যবহার, বিশুদ্ধ পথচলার কঠোর সাধনা, জ্ঞানলাভের জন্য দুর্নিবার আকাংখা, মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা ও শুভকামনা এবং সকল ক্ষেত্রে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার প্রদানের মত অসাধারণ কিছু গুনের সমাবেশ ঘটেছিল প্রানপ্রিয় এই মানুষটির মধ্যে। তাঁর সম্পর্কে কাউকে কোন দিন কোন সমালোচনা করতে শুনিনি। সবাই প্রশংসা করেন মল্লিক ভাইয়ের নির্মোহ সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রশংসা করেন তার ক্ষুরধার লিখনীর।

নিরবে কাজ করা, অন্যকে সামনে দিয়ে নিজে পিছনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের যে ক'জন প্রানপুরুষ আমার কাছে ঈর্ষনীয় হয়ে আছেন প্রিয় কবি ও সাথী মতিউর রহমান মল্লিক তাদের অন্যতম। আরো অনেকের কথা বলতে ইচ্ছে করে। শহীদ আব্দুল মালেক, আব্দুল মান্নান তালিব, সিদ্দিক জামাল ভাইদের মধ্যে আমি কোন তুলনা করতে চাই না তবে তাদের মত আরো কিছু মুখলিস মানুষকে স্মরন করে প্রেরণা লাভ করতে চাই। শহীদ আব্দুল মালেক ভাই তো কবি মল্লিকের স্বপ্নপুরুষ ছিলেন যা তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে।

'কোন এক শহীদ আমার সুনীল আকাশ জুড়ে
হাজার তারার জ্বালতো প্রদীপ.....'

কবিদের জীবন প্রায়শঃ খুব গোছালো হয় না। মল্লিক ভাই এর ব্যতিক্রম ছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু অবাক হয়েছি যখন ব্যক্তিগত জীবনে ভয়ানকভাবে অগোছালো এই মানুষটি তার সাংগঠনিক দায়িত্বকে আলনায় সাজানো কাপড়ের মত পরিপাটি করে রেখেছেন। এটি তিনি পেরেছেন সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি কর্মী সাথীদের প্রশ্নহীন ভালোবাসা ও

www.pathagar.com

সহমর্মিতার কারণে। অনুরোধের সুরে আদেশ করতে পারার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কোন অনুরোধ ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য খুব কম মানুষেরই ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁর কর্ম ও পরিশ্রমপ্রিয়তা বাকী সাথীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করতো।

বিনয় ও আত্মমর্যাদাবোধের মাঝে একটা চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেন তিনি। ছোট বড় সকলকেই মানুষ হিসেবে সম্মান করতেন । ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তিনি। একটি শিক্ষিত অথচ বৈরী পরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর সংগ্রামী সত্তার। বড় ভাইও একজন কবি। বড় ভাই মেঝ ভাই তাঁর ছন্নছাড়া (?) আন্দোলনী জীবনকে পছন্দ করতে চান নি। কিন্তু মল্লিক ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তির কাছে এসব বেরীতা কখনো পাত্তা পায় নি। ব্যক্তি 'মতি'র (কবির পরিবারের সদস্যদের উচ্চারিত নাম) জন্য পরিবারের সকল সদস্যের ভালোবাসা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আদায় করে ছেড়েছেন তিনি। তাঁর পড়শী, গ্রাম তথা এলাকার মানুষ সবাই তাকে ভালোবাসতেন। সবার কাছে তাঁর একটা বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সমবয়সী বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো ছিলোই কিন্তু সবার উপরে তাঁর জন্য বন্ধুদের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল যা বিশেষভাবে উল্যেখ করার মত। সত্যি বলতে, পরিবার ও লোকালয়ের উর্ধে এক সময় নিজের অজান্তেই তিনি সকলের হয়ে গেলেন এবং কোটি মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থায়ী আসন পেতে বসলেন। তাঁকে সুস্থ দেখার প্রার্থনা ও সহযোগিতায় এই যে অগনিত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ তা কি একটি ইতিহাস হয়ে রইবে না?

তাঁর অকাল মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তার সাথে দেখা করতে ইবনে সিনা হাসপাতালে গেলাম। আমাকে কাছে পেয়ে তিনি এতটা খুশী হলেন যা পরিমাপযোগ্য ছিল না। তাঁর সাথে দেখা করা তখন অবারিত ছিলনা তবু আমার জন্য সে সুযোগটুকু তাঁর পরিবারের সম্মানিত সদস্যরা সহজেই করে দিয়েছিলেন বোধ করি মল্লিক ভাইয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই। সাথে আমার স্ত্রী ছিলেন যিনি মল্লিক ভাইয়ের ভক্ত সংগত কারণেই। মল্লিক ভাই যেন ক্ষনিকের জন্য নতুন জীবন পেলেন। গল্প করতে লাগলেন স্বতঃস্ফুর্তভাবে। ফিরে গেলেন সেই চল্লিশ বছর আগের দিনগুলিতে। দু'জনে একসাথে কিভাবে মাঠ চষে বেড়িয়েছি এবং এমনি এক দিনে দূরের পথে এক রাতকানা মাঝির নৌকায় চড়ে যে বিড়ম্বনা ও বিপদ হয়েছিল সেসব কথা তিনি বলে যাচ্ছিলেন আর আমি স্মৃতির সরোবরে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিলাম। তার হাসি দেখে বুঝার উপায় ছিল না যে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী এক ইসলামী সৈনিক। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে একদিন তাঁর বাসায় গেলাম। সেদিনও আমার উপস্থিতিতে তাঁর বাঁধভাঙ্গা খুশী আরেকবার জানান দিয়ে গেল, আমার সমস্ত অপরাধ, সীমাবদ্ধতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা করে দিয়ে কতটা ভালো তিনি আমাকে বেসেছিলেন।

তাঁর কাব্য প্রতিভা নিয়ে শুরু থেকেই আমার একটা দারুন প্রত্যাশা ছিল এবং আবেগমিশ্রিত একটা ভবিষ্যদ্বানী ও ছিল। মাঝে মধ্যে প্রিয় বন্ধু কবি তাঁর লেখা নতুন কোন কবিতা আমাকে শোনাতেন, মাঝে মধ্যে আমি কোথাও বুঝতে না পারলে খানিকটা শিক্ষকের মত বুঝিয়েও দিতেন। একদিন তিনি 'আলোকের পথে রাসুলের পথে' নামে একটি নতুন কবিতা আমাকে পড়ে শুনালেন। ভীষন ভালো লাগলো কবিতাটি আমার। কবিতাটির এক জায়গায় তিনি প্রিয়নবী (সঃ) এর সাথে মার্ক্স, এঞ্জেলস ও লেলিনের তুলনা করেছেন এইভাবেঃ

www.pathagar.com

'সে আর মার্ক্স
সে আর লেনিন
সে আর এঙ্গেলস
ঠিক যেন আলো আর কালোর মতো'

আমি বললাম, মল্লিক ভাই আপনি অনেক বড় কবি হবেন। আমার এই বলার মধ্যে ভালোবাসা ছিল, অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল আর ছিল সমস্ত অন্তর নিংড়ানো মুনাযাত। মল্লিক ভাই খুব লজ্জিত হলেন এবং স্বভাবসুলভ একটা হাসি দিয়ে প্রসংগটি ইতি টানার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে করে তাঁকে নিয়ে আমার প্রত্যাশা এতটুকুও হ্রাস পেল না।

পরে যখন সত্যিই তিনি বড় কবি হলেন তখন আমার সে কথাটি তাকে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও তা আর হয়ে ওঠেনি।

১৯৭৬ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। সাংগঠনিক বৈঠকাদিতে তখন কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী গান পরিবেশনের জন্য আমাকে বলা হতো। আমি মূলতঃ মল্লিক ভাইয়ের গানগুলিই গাইতাম। মল্লিক ভাই তখনো বাগেরহাটে থাকেন। বনে বাঘ না থাকলে শেয়াল রাজা। আমি ও মল্লিক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে জনপ্রিয়তা কুড়াচ্ছিলাম। অথচ গায়ক হিসেবে নিজের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানতো না। তাই আমি এবং অন্য দু'একজন ভাই উর্ধতন দায়িত্বশীলদের মল্লিক ভাইকে ঢাকায় আনা এবং তার নেতৃত্বে ইসলামী সংগীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের পরামর্শ দিলাম। পরামর্শ গৃহীত হলো। মল্লিক ভাইকে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো এবং এভাবেই সাংস্কৃতিক অংগনে আমাদের বহু দিনের অনুপস্থিতির যবনিকাপাত হলো। মল্লিক ভাই একাই সব। সংগীত রচয়িতা, সুরকার, শিল্পী ও সংগীত পরিচালক সব তিনি একাই করতেন। তখন ইসলামী সংগীত লেখার মত লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আমার মনে আছে প্রথম দিকে একটি গান আমি লিখেছিলাম যা প্রথম দুটি লাইন ছিল;

'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রসেনানী যারা
নারায়ে তাকবীর দিয়ে সামনে দাঁড়াও
কাফেলার নিশান যদি নিজ হাতে ধরবে তুমি
বজ্র মুষ্টিতে দুহাত বাড়াও।'

মল্লিক ভাই যে আমাকে কতটা প্রশংসা করেছিলেন এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন তা বলে বুঝাতে পারবো না। মল্লিক ভাইয়ের উৎসাহ আমার ক্ষেত্রে কাজে আসেনি। তবে তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় অনেকেই গান লিখেছেন,গেয়েছেন, সুর করেছেন এবং পরবর্তীতে সংগীত পরিচালক হয়েছেন। সত্যি বলতে মল্লিক ভাই ইসলামী সংগীতের একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। আমার জানামতে তাঁর আগে বাংলা ভাষায় ইসলামী সংগীতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের এত প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ আর কেউ ঘটতে পারেন নি। সেজন্যই আমি তাঁকে ইসলামের কবি না বলে ইসলামী আন্দোলনের কবি বলে অভিহিত করতে চাই। কবিতায় গানে তিনি ইসলামী আন্দোলনকে এত প্রবলভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সত্যিই অতুলনীয়। মল্লিক ভাইয়ের এক একটা কবিতা গান আমার কাছে মনে হয় একটা স্বতন্ত্র বক্তৃতা। তাঁর গানের ভাব পরিস্কার, বক্তব্য স্পস্ট, ভাষা অত্যন্ত জোরালো এবং আবেদন

www.pathagar.com

চিরন্তন। তাঁর একটি অনবদ্য গানের কটি কথা

'আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালবার মন্ত্রে
বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
মানুষের মনগড়া তন্ত্রে।'

অথবা মল্লিক ভাইয়ের সেই বিখ্যাত গানটি যা আমার গলায় (অবশ্যই মল্লিক ভাই ঢাকায় আসার আগে)বারবার শুনতে চাওয়ার কারণে সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক সদস্য সম্মেলনে সিপি নাসের ভাই ব্যক্তিগতভাবে এক সদস্যের এহতেসাবের মুখোমুখী হয়েছিলেন।

'কে আছিস বীর আয় ছুটে আয়, খোদার পথে জীবন বিলাই
কারবালার এই প্রান্তরে ফের, বালাকোটের এই মাঠে ফের
ইসলামেরই নিশান ওড়াই।'
ভীরুর তরে নয়কো কুরআন, খোদার দেয়া জীবন বিধান,
আলফেসানী বেরলভী আর তীতুর মতো বিপ্লবী চাই।'

জিহাদের জন্য এত সরাসরি এবং জোরালো আহবান এর আগের কোন কবির গানে কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনি বহু গান ও কবিতা লিখেছেন তিনি আমাদের উদ্দীপ্ত করার জন্য। আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য। যুগ যুগ ধরে তাঁর গান ও কবিতা ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা যোগাবে সকল প্রতিবন্ধকতা দুপায়ে দলে কাবার পথে এগিয়ে যেতে। আসুন আমরা সবাই এই প্রিয় মানুষটির মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

লেখক : অধ্যাপক, ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[বিঃদ্রঃ লেখাটি দেরীতে পাওয়ায় সবশেষে ছাপতে হয়েছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। - সম্পাদক]

www.pathagar.com

বাগেরহাট ফোরাম, ঢাকা
কেন্দ্রীয় কমিটি, সেশন- ২০১১-১৩

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি	:	অধ্যক্ষ মাওলানা মশিউর রহমান
উপদেষ্টা	:	ড. গোলাম আলী ফকির প্রফেসর মুজাহিদুল ইসলাম অধ্যক্ষ মানজুরুল ইসলাম
সভাপতি	:	ডা: আতিয়ার রহমান
সহ-সভাপতি	:	অধ্যক্ষ মাও: মোশাররফ হোসেন প্রভাষক রফিকুল ইসলাম মুহিববুল্লাহ আজাদ
সেক্রেটারি	:	সুলতান আহমদ
যুগ্ম সম্পাদক	:	এ্যাড. মো: শামছুজ্জামান
সহ-সম্পাদক	:	হাফেজ মাও: মাসুদুর রহমান বেলায়েত হোসেন সুজা
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	এস. এম. শাহজাহান তারিক
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	:	ইফতেখার আল-আমিন জুয়েল
অর্থ সম্পাদক	:	সরদার আব্বাসউদ্দিন
অফিস সম্পাদক	:	মো: শফিউল্লাহ
প্রচার সম্পাদক	:	মো: ইলিয়াছ হোসেন কাজী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	শেখ আরাফাত হোসেন
প্রকাশনা সম্পাদক	:	মনজুরুল আহসান তাওহীদ
ধর্মবিষয়ক সম্পাদক	:	মাও: রেজাউল করিম
বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	:	ফজলুর রহমান খান
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	মোল্লা তৌহিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক	:	মু. সাইফুল ইসলাম
সদস্য	:	মিজানুর রহমান এস. এম. রিয়াদ আলী এ্যাড. তৌফিকুল ইসলাম (মামুন) মো: শহিদুর রহমান মো: নাজমুল হোসেন মো: মহিউদ্দিন মল্লিক নাসিম আহসান মো: মনিরুজ্জামান মো: নাজমুল হাসান আলী ইমরান মো: মোহিব্বুল্লাহ সুমন

www.pathagar.com

ছাপ

www.pathagar.com

বাগেরহাট ছাত্রফোরামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপমহাদেশের পূন্যসাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ.) এর স্মৃতি ধন্য খলিফাতাবাদ, কালের খেয়ায় এখন যাকে বাগেরহাট নামেই চেনে বিশ্ব। এখনে রয়েছে, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট খ্যাত অনন্য বৈচিত্রের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য নিদর্শন ষাট গম্বুজ মসজিদ, রয়েছে বিশ্বের একমাত্র ম্যাগ্রোভ বন সুন্দরবন। এ দুটি অনন্য সৃষ্টি বাগেরহাট নামটিকে পরিচিত করে তুলেছে, সারা বিশ্বময়। এখানে জন্ম নিয়েছে, অনেক সাধক, মনীষি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমুজ্জল পেশাদার মানুষ। আজকে যারা বিভিন্ন পেশায় সমহিমায় উজ্জল তাদের অনেকের জন্ম এই বাগেরহাটেরই কোন না কোন প্রত্যন্ত গ্রামে। ধীরে ধীরে তাদের অনেকেই জাতীয় পর্যায়ের মহিরুহে পরিনত হয়েছেন। আর তাই, ঢাকা অবস্থানরত বাগেরহাটের বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০০৭ সালে গঠন করা হয়, বাগেরহাট ছাত্র ফোরাম, ঢাকা। সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো আমাদের কর্মকান্ড।

বাগেরহাট ছাত্রফোরাম

''বাগেরহাট ছাত্রফোরাম, ঢাকা'' একটি অঞ্চলভিত্তিক ছাত্রকল্যাণমূলক সংগঠন। বাগেরহাট জেলা অর্থাৎ বাগেরহাট সদর, কচুয়া, ফকিরহাট, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, রামপাল, মোংলা, মোল্লাহাট ও চিতলমারী উপজেলাকে বুঝাবে। ঢাকা কেন্দ্রীক সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে এ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হইবেন। তবে সদস্য বলিতে শুধু তাহাদেরকে বুঝাইবে যাহারা নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী অথবা প্রচলিত শিক্ষাজীবন শেষে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন।

মূলনীতি

বাগেরহাট ছাত্রফোরাম, ঢাকা বাগেরহাট ফোরামের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ইহা একটি সেবামূলক সংগঠন যাহা সদস্যদের মাঝে পারস্পারিক সুসম্পর্ক ও ছাত্রকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হইবে।

www.pathagar.com

বাগেরহাট ছাত্র ফোরাম, ঢাকা

কেন্দ্রীয় কমিটি, সেশন ২০১১-১২

সভাপতি	:	আসাদুল্লাহিল গালিব
সিনিয়র সহ-সভাপতি	:	গাজী মোনাওয়ার হোসাইন তামিম
সহ-সভাপতি	:	মো: ইব্রাহিম
		হাওলাদার আহম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক	:	মুহা: এনামুল কবির
যুগ্ম সম্পাদক	:	মাহ্‌ফুজুর রহমান দোলন
		শাকিল মাহমুদ
সহ-সম্পাদক	:	মো: নিশাত জামান
		রিয়াজউদ্দিন
		মো: আশিকুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মো: রেজাউল কবীর
কোষাধ্যক্ষ	:	মো: মনিরুজ্জামান
দফতর সম্পাদক	:	আব্দুল্লাহ আল-মামুন হাওলাদার
প্রচার সম্পাদক	:	আব্দুল্লাহিল কাফি
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	আবু বকর সিদ্দিক
বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্র		
সহায়তা বিষয়ক সম্পাদক	:	মো: হাসিবুর রহমান
শিক্ষা সম্পাদক	:	মো: হাসানুল বান্না
ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক	:	মো: খুরশিদ আলম শিমুল
প্রকাশনা সম্পাদক	:	মো: মুবাশ্বির
আইনবিষয়ক সম্পাদক	:	মো: আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	:	হাসিবুর রহমান

www.pathagar.com

নির্বাহী সদস্য : ১. সোহেল পারভেজ শাহিন
২. মোঃ সিফাতুল্লাহ
৩. মোঃ সাব্বিরুজ্জামান
৪. আয়াতুল্লাহ খোমেনী
৫. হাফিজুর রহমান
৬. মোঃ শরিফুল ইসলাম
৭. আব্দুল্লাহিল মুজাদ্দেদী
৮. বদিউজ্জামান সোহেল
৯. হেদায়েতুল ইসলাম
১০. মোঃ জিহাদুল ইসলাম
১১. মোঃ আরিফ খান

www.pathagar.com

মল্লিক সে তো গানের পাখি

স্মৃতি এ্যালবাম

মল্লিক সে তো গানের পাখি
মল্লিক সে তো গানের পাখি
স্মৃতি

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক

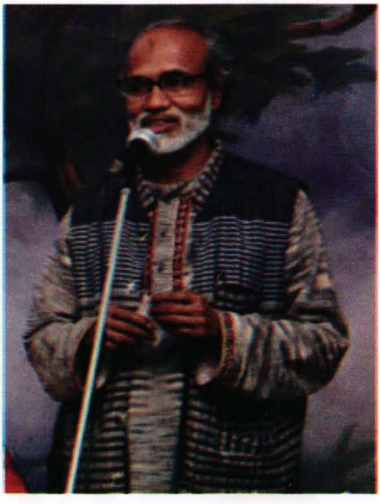

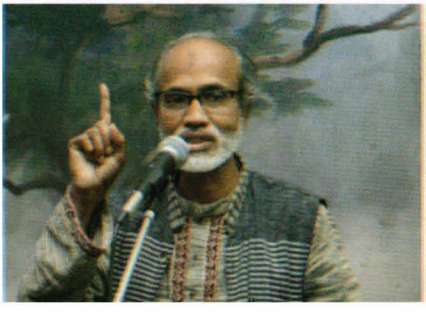

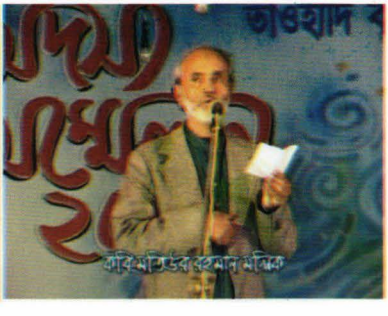

www.pathagar.com

www.pathagar.com

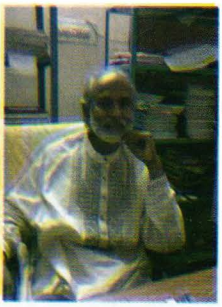
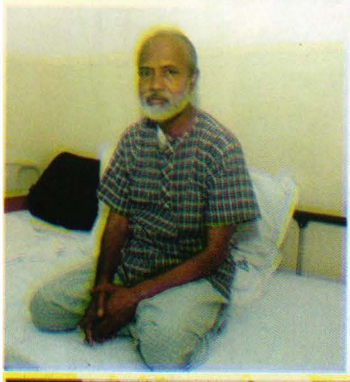
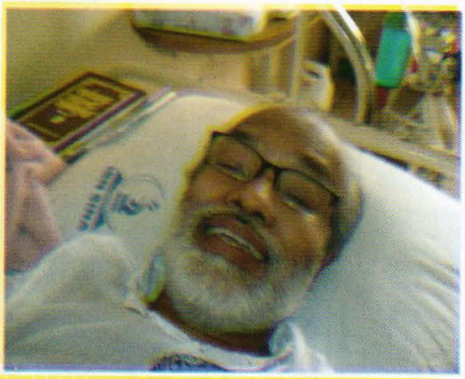

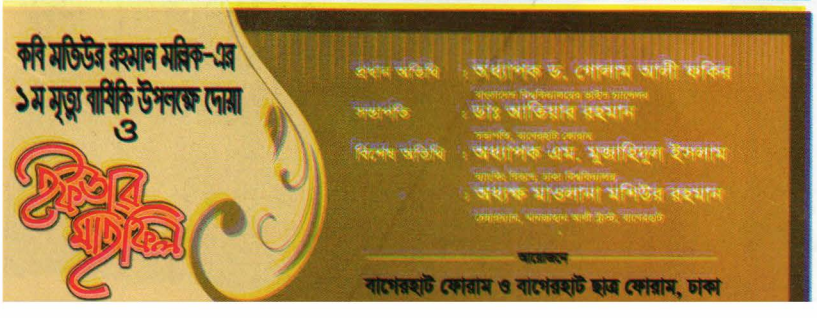

www.pathagar.com

মল্লিক সে তো গানের পাখি
মল্লিক সে তো গানের পাখি
কবি মতিউর রহমান মল্লিক
মল্লিক সে তো গানের পাখি
মল্লিক সে তো গানের পাখি

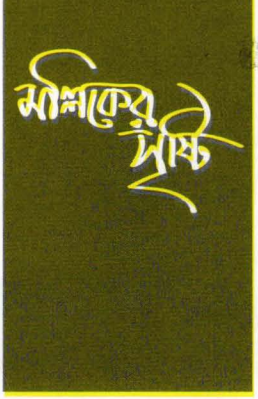

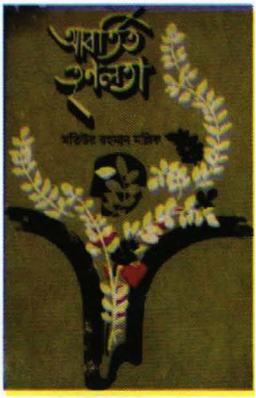

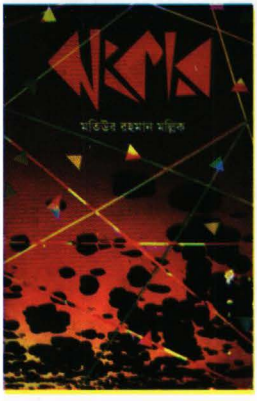

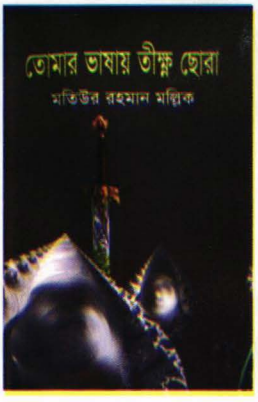

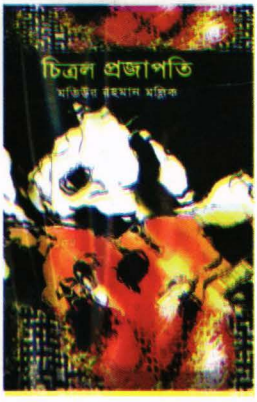

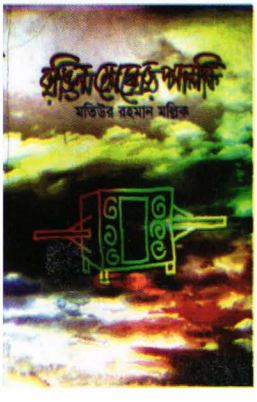

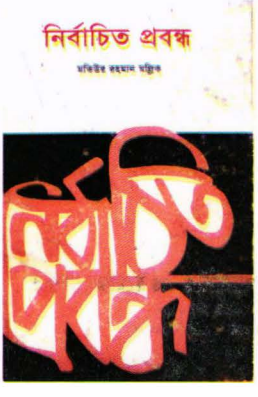

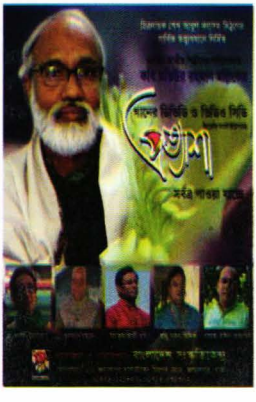

www.pathagar.com

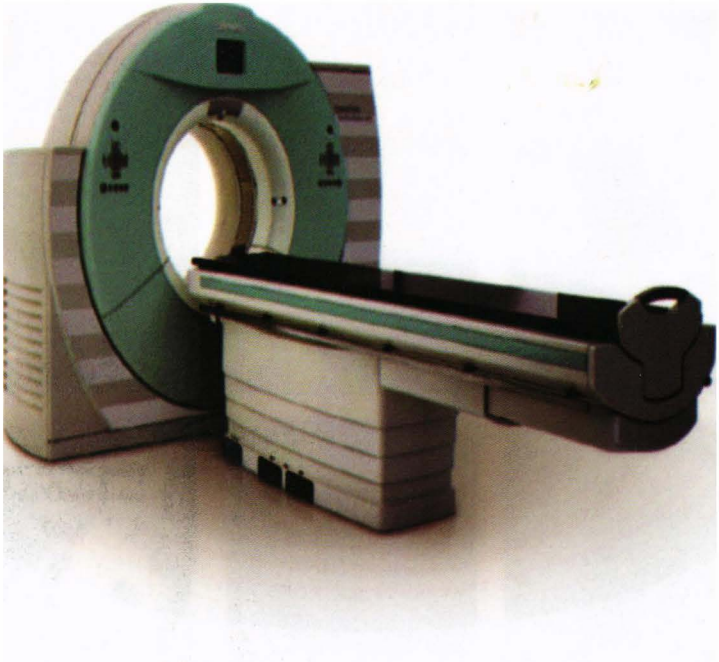

বিশ্বের সর্বাধুনিক জার্মান প্রযুক্তির 128 Slice সিটি স্ক্যান
বাংলাদেশে এই প্রথম - ইবনে সিনায়

Whole Body স্ক্যানিং | নিউরো সিটি এনজিও | কার্ডিয়াক সিটি এনজিওগ্রাম
সিটি ইন্টারভেনশন | ভাসকুলার এনজিওগ্রামসহ সব ধরনের সিটি স্ক্যানিং এখন
আরও নিখুঁত এবং সবচেয়ে কম এক্স-রে মাত্রায় অতি দ্রুত (মাত্র ৩.৩ সেকেন্ডে)।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ঢাকা

আকর্ষণীয় কম মূল্যে
সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে

ব্রেইনের সিটি স্ক্যান

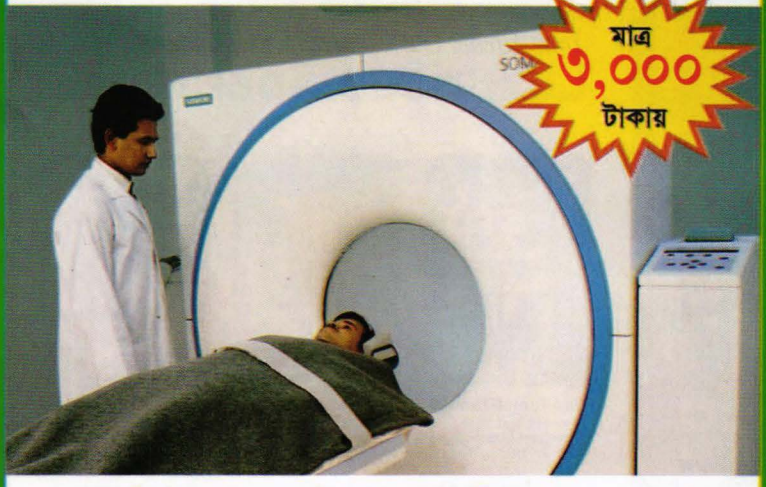

সর্বাধুনিক ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরীর সুবিধা নিয়ে
দু'টি স্বয়ং সম্পূর্ণ হাসপাতাল

সিটিস্ক্যানসহ সব ধরনের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা
২৫% কম।

ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল কাকরাইল
৩০ ভি আই পি রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৬০৩৩১-২, ৯৩৫৫৮০১-২

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল মতিঝিল
২৪/ বি আউটার সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৬৪২১-৩, ৮৩১৭০৯০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

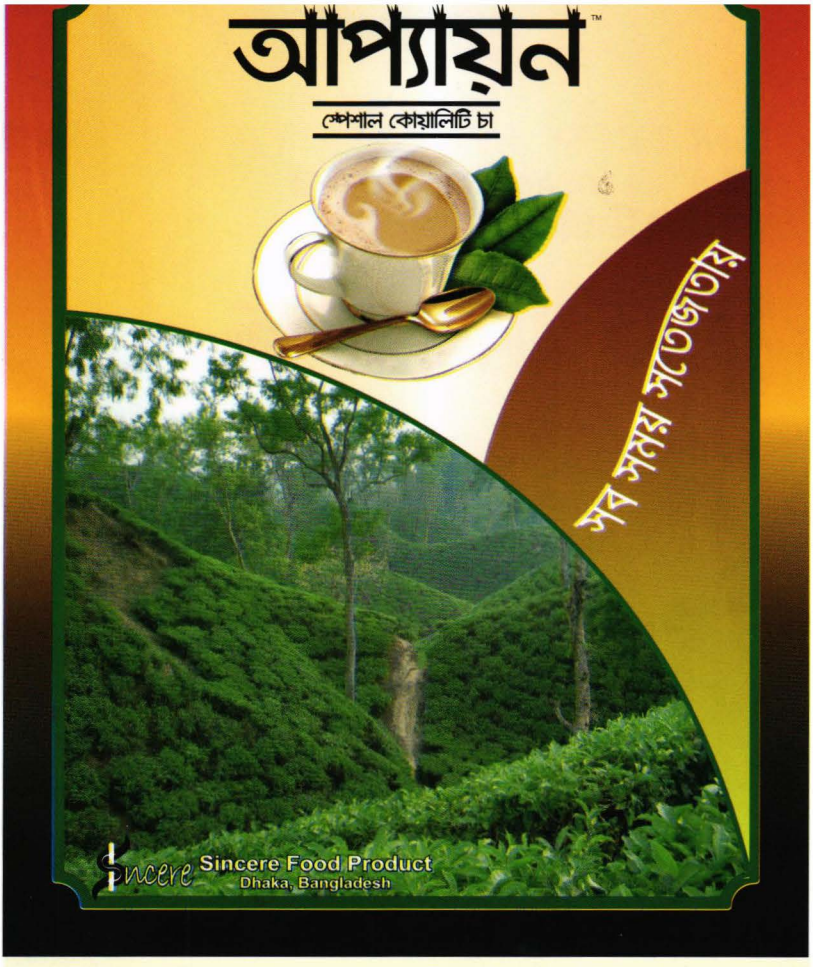

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Munir Printers

সর্ব প্রকার নিখুঁত প্রিন্টিং কাজের জন্য এক
অনন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ ঃ
২৬৩, হোসাইন কমপ্লেক্স, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২ ৭১৯১৬২৫
মোবাইল ঃ ০১৯২৩-৯৫৫০২৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে প্রকাশিত স্মরণিকা **'মল্লিক সে তো গানের পাখি'** প্রকাশের উদ্যোগকে

লিগ্যাল আইকন-এর পক্ষ থেকে

স্বাগত জানাই।

-এ্যাড. মোঃ শামছুজ্জামান

০১৭১১-৭৮২১৭৭

LEGAL ICON

Advocate, Barrister & Legal Consultants

Executive Panel of the Chamber

Md. Habibullah
Former District Judge & Law Secretary
Chief Counselor

Barrister Hassan F. Al Imran
Principal Counselor

Md. Shamsuzzaman
Executive Counselor

Judge Court Chamber:
Auntora Complex (1st Floor), Room # 9
25 Court House Street, Dhaka-1100.
Phone: 7160929

Corporate Chamber:
Al-Razi Complex, Suite # 801 (8th Floor), 166/167 Shaheed Syed Nazrul Islam Swarani
Purana Paltan, Dhaka-1000. Phone: 9511995, Fax: 9511994, E-mail: legaliconbd@gmail.com

www.pathagar.com

স্বনির্ভর দেশ গঠনের ঠিকানা

কবি মতিউর
রহমান মল্লিক স্বরনে
স্বরণীকা প্রকাশের
সফলতা কামনায়

সাউথ বেঙ্গল সিটি ◆ কেরানীগঞ্জ
জাহানাবাদ ভিলা ◆ হাসনাবাদ
জাহানাবাদ ভিউ ◆ বসুন্ধরা রিভারভিউ
জাহানাবাদ হ্যাভেন ◆ বসুন্ধরা রিভারভিউ
জাহানাবাদ প্যালেস ◆ বারিধারা
জাহানাবাদ গার্ডেন ◆ মোহাম্মদপুর
জাহানাবাদ প্যারাডাইস ◆ খুলনা

Jahanabad Group
Head Office : Baitul Khair (2nd Floor), Flat No. # 202, 48/A-B Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 02-7113361, E-mail : jahanabadbsl@yahoo.com, www.jahanabadgroup.com

01970-331133-37
01711-303324
01822-223595
01718-100640

www.pathagar.com

ভর্তি চলছে

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্‌রাসা

আবাসিক/ অনাবাসিক/ ডে-কেয়ার

এ্যারাবিক-ইংলিশ মিডিয়াম

হিফজুল কুরআনের পাশাপাশি
আরবী, ইংরেজী, বাংলা, অংক, ও কম্পিউটার
শিক্ষাদানসহ শ্রেণী ভিত্তিক প্রমোশন

বৈশিষ্ট্যাবলী:

- ক্যাডেট পদ্ধতিতে পরিচালিত
- ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার বাস্তব সমন্বয়
- প্লে-গ্রুপ থেকে স্পোকেন এ্যারাবিক ও ইংলিশ
- মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশে আবাসিক ব্যবস্থা
- প্রবাসী ভাইদের সন্তানদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহন
- দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- দৈনিক ৩ বার পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসম্মত নাশতা সহ মোট ৬ বার খাদ্য পরিবেশন।

১নং ভবন ঃ বাড়ী-৬, রোড-১৫, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২নং ভবন ঃ বাড়ী-২২, রোড-১৪, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
ফোন ঃ ৮৯২২৭০১, ০১৮১৯২৩০৪৬০, ০১৯৩৬৪০৬৫৭৮।

www.pathagar.com

এসএমই

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশের মাধ্যমে
অর্থনীতির ভিত হয় শক্তিশালী
গড়ে ওঠে উন্নত জাতি

এ লক্ষ্য সামনে রেখে
ইসলামী ব্যাংক চালু করেছে
এস.এম.ই বিনিয়োগ প্রকল্প

এসএমই খাত সমূহ

উৎপাদনশীল

খাদ্য, কৃষিজাত, চামড়া, বস্ত্র, হস্তশিল্প,
ইলেকট্রনিক্স এবং পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ট্রেডিং

আমদানি ও রপ্তানি খাতসহ সব ধরনের শরী'আহ
অনুমোদিত পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা

সেবা

টেলিকমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্ট, ইনফরমেশন
টেকনোলজী, ক্লিনিক, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট,
ওয়ার্কশপ ইত্যাদি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন শাখা ও এসএমই সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com